পৃথিবীর ঠিকানা

পৃথিবীর ঠিকানা

অমল দাশগুপ্ত

পূর্ণ প্রকাশন

৮এ, টেমার লেন ● কলিকাতা ৯

প্রকাশক :
রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :
জ্যৈষ্ঠ,১৩৬৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :
চারু খান

মুদ্রাকর :
বিশ্বনাথ ঘোষ
নিউ জয়গুরু প্রিন্টার্স
৩৩/ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সুহৃদ্বরেষু

লেখকের নিবেদন

বইটি নামে পুরনো। 'পৃথিবীর ঠিকানা'—এই নামে একটি বই দুটি সংস্করণে আগে প্রকাশিত হয়েছিল। সেই পুরনো নামে এখন যে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে সেটি. শেষের আগের অধ্যায়ের গোটা ছয়েক পৃষ্ঠা বাদে, আগাগোড়া নতুন করে লেখা। কারণ, আমাদের পৃথিবী যদিও সেই একই পুরনো পৃথিবী থেকে গিয়েছে, কিন্তু ইতি-মধ্যে ভূ-বিজ্ঞানে যা ঘটে গিয়েছে তাকে বলা হয় বিপ্লব—মহাদেশের সঞ্চরণ থেকে প্লেট টেক্‌টনিক্‌স্। বলা হচ্ছে, এই বিপ্লব-লব্ধ তত্ত্ব দিয়েই চারশো ষাট কোটি বছর বয়সের এই পৃথিবীতে যতো ব্যাপার ধারাবাহিক ঘটে আসছে তার যথাযথ ব্যাখ্যা প্রথম পরিষ্কারভাবে পাওয়া গেল।

এই বই, নতুন এই ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা। আর তাই প্রাসঙ্গিকভাবে অবশ্যই প্রথমে বলতে হয়েছে পৃথিবীর জন্মকথা, তার আকার, আকৃতি, বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ইত্যাদি এবং শেষে তার জীবমণ্ডলের কিছু বৃত্তান্ত। সব মিলিয়ে, পৃথিবীর সম্পূর্ণ একটি ঠিকানা।

সাধ্যমতো সরলভাবে এই ঠিকানার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি, যাতে সাধারণ পাঠকেরও বোধগম্য হয়। আশা করি, এই বই আমাদের বাসভূমি পৃথিবী সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা-লাভে সহায়ক হবে। মানুষের বিবর্তনের কথা এই বইয়ে বলা হয়নি, প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। এ-বিষয়ে আগ্রহী পাঠক 'মানুষের ঠিকানা' বইটি পড়ে দেখতে পারেন।

সূচীপত্র

মহাকাশ থেকে পৃথিবী, অ্যাপোলো-১৭ থেকে তোলা ছবি। ছবিতে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ মেঘে ঢাকা পড়েছে। কিন্তু উত্তরে দেখা যাচ্ছে আরব ও লোহিত সাগর, এডেন উপসাগর, আফ্রিকার শৃঙ্গ ও মাদাগাস্কার বা মালাগাসি। মহাকাশ থেকে তাকিয়ে দেখলে পৃথিবীকে কত ছোট মনে হয়। (পৃ: ২০)
(নিচে) চাঁদের দিগন্তে পৃথিবী, জোন্দ-৭ থেকে তোলা ছবি। এখানে পৃথিবী আরো ছোট, চাঁদের উপরিতল সে-তুলনায় অনেক বড়ো। কিন্তু পৃথিবীর এই ছোট ছবিতেও মধ্য এশিয়া, আরব উপদ্বীপ ও অস্ট্রেলিয়া চিনে নেওয়া যায়। (পৃঃ ২০)

চাঁদের উপরিতল। জন্মের পরে চাঁদের উপরিতলে প্রচণ্ড রকমের উল্কাপাত ও আগ্নেয়গিরির তৎপরতা চলেছিল। তার সমস্ত চিহ্ন পরের তিনশো সাড়ে তিনশো কোটি বছর ধরে বজায় আছে। (পৃঃ ৩৫)

(নিচে) অ্যান্ড্রোমিডা তারামণ্ডলের গ্যালাক্সি, পৃথিবী থেকে ২০ লক্ষ আলো বছর দূরে। দশহাজার কোটি তারা আছে এই গ্যালাক্সিতে। মহাবিশ্বে এমনি গ্যালাক্সি আছে কোটি-কোটি। পৃথিবী যে গ্যালাক্সিতে আছে তার নাম ছায়াপথ। দূর থেকে দেখলে এই ছায়াপথ গ্যালাক্সির চেহারা একই রকম। (পৃঃ ১২)
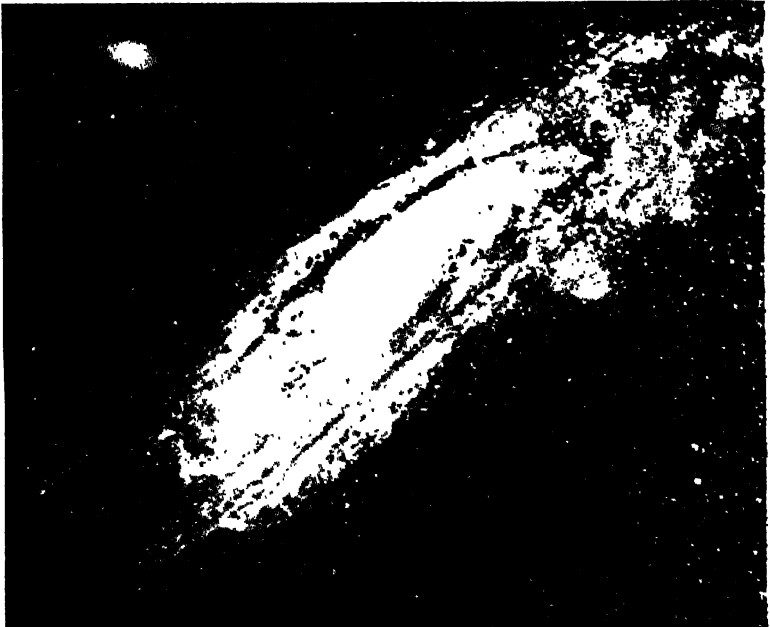
এভারেস্ট শিখর ও আরও কয়েকটি শৃঙ্গ, আকাশ থেকে তোলা ছবি। প্রায় ছয়কোটি বছর আগে ভারতের ভূখণ্ড এসে এশিয়ার দক্ষিণ উপকূলে ধাক্কা মারে। আর তারই ফলে হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি। (পৃঃ ১৬১) (নিচে) অলকানন্দার উৎস। ভগীরথ খড়ক ও শতপন্থ হিমবাহ থেকে নদীটি বেরিয়েছে। হিমবাহ চলার ফলে যে উপত্যকা সৃষ্টি হয়েছে তার আকার ইংরেজি U অক্ষরের মতো। (পৃঃ ১৭৪)

মধ্যজীবীয় যুগের অরণ্যচারী তিনটি সরীসৃপ। বাঁ-দিকে স্টেগোসরাস (শিরদাঁড়া বরাবর মজবুত বর্মসাজ), মধ্যে ব্রন্টোসরাস (ওজনে ৫০ টন, লম্বায় ৩০ মিটার), ডান-দিকে ডিপ্লোডোকাস। (পৃঃ ১৮৩)

মধ্যজীবীয় যুগের দুটি হিংস্র সরীসৃপ। বাঁ-দিকে ধারালো শিংযুক্ত ট্রাইসেরাটপ্‌স। ডান-দিকে মধ্যজীবীয় যুগের আতঙ্ক টাইরানোসরাস। (পৃঃ ১৮৪)

মধ্যজীবীয় যুগের জলাশ্রয়ী সরীসৃপ। বাঁ-দিকে রাজহাঁসের মতো লম্বা গলা-ওলা প্লেসিওসরাস ; ডান-দিকে জল থেকে লাফিয়ে-ওঠা অবস্থায় কিম্ভুত মাছের মতো ইকথিওসরাস। (পৃঃ ১৮৬)

ঠিকানার উদ্দেশে

আমরা মানুষরা কোথায় থাকি ? কোন্ ঠিকানায় ?

থাকি পৃথিবীতে। পৃথিবীর মানুষ—এটাই আমাদের সবচেয়ে বড়ো ঠিকানা।

পৃথিবীকে বলা হয় 'ভূ'। কথাটার অর্থ, 'যে স্থানে সকলে থাকে'। এখনো পর্যন্ত সকলের থাকার জায়গা এই একটিই -- পৃথিবী। তাই পৃথিবীই ভূ।

ত্রিশ লক্ষ বছর ধরে আমরা মানুষরা এই পৃথিবীতে আছি। বেঁচে থাকার জন্য পুরোপুরি নির্ভব করে আছি পৃথিবীর জল-হাওয়া-মাটির ওপরে। ত্রিশ লক্ষ বছর বললাম বটে, কিন্তু আমরা মানুষরা আমাদের বেঁচে থাকার ইতিহাস জানি বিগত মাত্র সাত হাজার বছরের, যখন থেকে মানুষ তার ইতিহাস লিখে রাখতে পেরেছে। তার আগেকার কালের কোনো লিখিত ইতিহাস নেই—সেই পুরো কালটাই 'প্রাগৈতিহাসিক' (যে-সব কালের বিবরণ ইতিহাসে লেখা আছে তার আগেকার কাল)। এই প্রাগৈতিহাসিক কাল সম্পর্কে আমরা যতোটুকু জানতে পেরেছি তা সবই শিলার গায়ে টিকে থাকা কিছু চিহ্ন ও নিদর্শন থেকে।

মানুষের ঠিকানা জানতে হলে এই ত্রিশ লক্ষ বছর ধরে খোঁজ নিতে হয়। তিরিশ লক্ষ বছর! এ যে কী বিপুল এক সময় তা যেন ভাবাই যায় না। বিজ্ঞানীরা কিন্তু হাল গুটিয়ে বসে থাকেন নি, জলে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে অরণ্যে-মরুভূমিতে ঘুরে ঘুরে লক্ষ-লক্ষ বছরব্যাপী কালের নিদর্শন খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

তাহলে শুধু মানুষ নিয়েই বা থাকা কেন? পৃথিবীতে মানুষ আসার আগেও তো কিছু-না-কিছু ছিল। সেটা কী? অনেক

কিছুর সঙ্গে জীব নিশ্চয়ই। পৃথিবীতে মানুষের আগের জীব কারা? কখন থেকে জীবনের শুরু? এসব প্রশ্নের জবাব দিতে হলে ঠিকানার হদিস নিতে হয়,—লক্ষ লক্ষ নয়, কোটি কোটি বছর ধরে। পৃথিবীতে চোখে দেখার মতো জীব প্রথম এসেছে ষাট কোটি বছর আগে। জীবনের শুরু দু-শো কোটি বছর আগে।

তারও আগে?

এই পৃথিবীরও তো একটা ঠিকানা আছে। সেই ঠিকানার খোঁজও নেওয়া দরকার. কবে থেকে শুরু এই পৃথিবীর? কেমন করে? শুরু হবার পরে কী-কী ঘটেছে? এমনি আরো কত প্রশ্ন। তবেই তো পৃথিবীর ঠিকানাটি স্পষ্ট হয়।

পৃথিবীর এই ঠিকানার খানিকটা খোঁজ নেবার জন্যই এই বই।

সময়ের বিপুলতা

পৃথিবীর ঠিকানার সন্ধান নিতে হলে বিপুল এক সময় পার হতে হয়। কোটি-কোটি কোটি-কোটি বছরের সময়। আমাদের নিজেদের জীবনে বা আশেপাশের জগতে এমন কিছু নেই যার সঙ্গে তুলনা করে সময়ের এই বিপুলতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া চলে। যদি বলি, সেই যখন বুদ্ধদেবের জন্ম হয়েছিল, মনে হতে পারে অনেক আগেকার কথা বলা হচ্ছে বুঝি! মোটেই নয়, মাত্র আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। যদি বলি, সেই যখন মিশরের পিরামিড তৈরি হয়েছিল, বা, মহেনজোদারো ও হরপ্পার শহর গড়ে উঠেছিল—তাই বা কতকাল আগের? মাত্র হাজার সাতেক বছর। যদি বলি, সেই যখন হিমালয়ের জন্ম হয়েছিল। এ-ঘটনাও অতি সম্প্রতিকালের—মাত্র পাঁচ কোটি বছর আগেকার। আর পৃথিবীর ঠিকানার জন্য আমাদের সন্ধান শুরু করতে হবে প্রায় পাঁচশো-কোটি বছর আগে থেকে। সময়ের এই বিপুলতা ধারণায় আনা শক্ত।

আবার, সময় যদি বিপুল হয় তাহলে খুব আস্তে আস্তে ঘটেও বিরাট ঘটনা ঘটে যেতে পারে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা স্পষ্ট হয়। ধরা যাক, একজন মানুষ এত ছোট যে আটবার পা ফেলে এক-সেন্টিমিটার দূরত্ব পার হয়। এই মানুষটি বছরে মাত্র একটিবার পা ফেলুক। অর্থাৎ, এক-বছরে এক-সেন্টিমিটারের আটভাগের একভাগ দূরত্ব পার হোক। এখন যদি বলি, এই মাত্রায় ও এই বেগে হেঁটে মানুষটি ভূমণ্ডলকে চক্কর দেবার জন্য বেরিয়েছে—তাহলে কথাটা বিশ্বাস করার মতো শোনায় কি? একবারেই না। কিন্তু সময় যদি পাওয়া যায় কয়েক-শো কোটি বছর, তাহলে? হিসেব করে দেখানো যায়, ৩২০০ কোটি বছর ধরে সমানে হেঁটে চললে এই মানুষটির পক্ষে ভূ-গোলককে সম্পূর্ণ একটি পাক দেওয়া সম্ভব। এ-থেকে বোঝা যায়, কত ছোটভাবে ঘটেও কত বড়ো ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

এমনি ছোটভাবে ঘটে চলেও কত বড়ো ঘটনা ঘটতে পারে তার আরো দৃষ্টান্ত ধরা যাক।

পৃথিবীর জন্ম ৪৬০ কোটি বছর আগে। চাঁদের জন্মও একই সময়ে। গোড়ার দিকে পৃথিবী ও চাঁদ অনেক কাছাকাছি ছিল, প্রায় গায়ে লেগে থাকা অবস্থায়। তখন পৃথিবী প্রতি দু-ঘণ্টায় একবার নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খেত। অর্থাৎ, পৃথিবীর দিন-রাত্রির মাপ ছিল ২ ঘণ্টা। সেই গোড়া থেকেই পৃথিবীর পাক খাওয়া একটু একটু করে আস্তে হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ একটু একটু করে দূরে সরে গিয়েছে। চাঁদ এখন আছে পৃথিবী থেকে ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার দূরে। প্রতি বছরে পৃথিবী থেকে চাঁদ প্রায় তিন সেন্টিমিটার দূরে সরে যাচ্ছে। নিজের অক্ষের চারদিকে পৃথিবীর একবার পাক খাওয়া এখন সম্পূর্ণ হয় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪·০৯৯ সেকেণ্ডে। পৃথিবীর পাক খাওয়া আস্তে হয়ে চলার জন্য এই সময় প্রতি একশো বছরে ০·০০১৬ সেকেণ্ড বাড়ছে, বা, প্রতি এক লক্ষ বছরে ১·৬ সেকেণ্ড। কত আস্তে আস্তে চাঁদের সরে-যাওয়া, কত আস্তে আস্তে পৃথিবীর

দিন-রাত্রি বড়ো-হওয়া। তবুও, এই হারে চলতে চলতেই, আজ থেকে প্রায় ৩২০ কোটি বছর পরে চাঁদ সরে যাবে পৃথিবীর ব্যাসার্ধের প্রায় ৭৫ গুণ দূরে, অর্থাৎ পৃথিবী থেকে প্রায় ৪,৮০,০০০ কিলোমিটার দূরে। তখন যতোটা সময়ে পৃথিবী তার অক্ষের চারদিকে একবার পাক খাবে ঠিক ততোটা সময়ে চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে একবার পরিক্রমা করবে। অর্থাৎ, পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হবে চাঁদ স্থির। এখানেও দেখা যাচ্ছে, ঘটনা ঘটছে খুবই আস্তে আস্তে। প্রতি বছরে চাঁদ তিন সেন্টিমিটার দূরে সরে যাচ্ছে। প্রতি এক লক্ষ বছরে পৃথিবীর পাক খাওয়া ১৬ সেকেণ্ডের মতো আস্তে হয়ে যাচ্ছে। খুবই সামান্য ঘটনা। কিন্তু কোটি কোটি বছরের সময় যদি হাতে থাকে তাহলে ছোট ঘটনা অনেক বড়ো ঘটনা হয়ে যায়।

আজকের পৃথিবীতে মহাদেশগুলোর দিকে তাকিয়ে আমরা হয়তো ভাবতে পারি, এমনটিই চিরকাল ছিল। কথাটা ঠিক নয়। কুড়ি-কোটি বছর আগেও, যখন ডাইনোসররা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াত, পৃথিবীর মহাদেশগুলো ছিল একসঙ্গে জোড়া অবস্থায় পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর কাছে। তারপরে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে, এবং ভাসতে ভাসতে, এখনকার অবস্থায় পৌঁছেছে। তার ফলে ঘটে গিয়েছে আরো অনেক কিছু কাণ্ড—যেমন, সমুদ্র তৈরি হওয়া, সমুদ্র লোপ পাওয়া, পর্বত ঠেলে ওঠা, ইত্যাদি। সবই ঘটেছে খুবই আস্তে আস্তে। আমাদের একটা জীবনে বা কয়েক পুরুষের জীবনে আমরা এতসব ভাঙাগড়ার কোনো লক্ষণই ধরতে পারি না। অথচ, ঘটনা ঘটে গিয়েছে, যা হবার হয়ে গিয়েছে, তাও নয়। এখনো ঘটে চলেছে। চোখে পড়ার মতো কিছু পেতে হলে সময় দেওয়া চাই—কোটি কোটি বছর। সময় যদি দেওয়া যায় তাহলে যে-মহাদেশের ওপরে এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি তা দু-ভাগ হয়ে যেতে পারে। সেখানে দেখা দিতে পারে সমুদ্র। বা, এখন যে-সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াতে আমরা এত ভালোবাসি তা ঠেলা খেয়ে এতই উঁচু হয়ে যাবে

যে চির-তুষারের রাজ্য হয়ে উঠবে। অবশ্য এজন্য অন্ততপক্ষে দশ কোটি বছর সময় দেওয়া চাই।

কিছুকাল আগেও আমরা পৃথিবীকেই বিশ্ব ভাবতাম এবং মানুষ সম্পর্কে ভাবতাম যে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ গোড়া থেকেই এই বিশ্বে আছে ও আধিপত্য করছে। এমন কথাও ভাবতাম যে মানুষের জন্যই এই বিশ্ব। এখন আমরা জানি, দশ হাজার কোটি তারা নিয়ে গঠিত ছায়াপথ নামক তারাজগতে সূর্য নামক একটি মাঝারি তারার গ্রহমণ্ডলে পৃথিবী হচ্ছে একটি মাঝারি গ্রহ মাত্র। মহাবিশ্বে যতোদূর পর্যন্ত অনুসন্ধান করা গিয়েছে তার মধ্যে এমনি তারাজগৎ আছে আরো কোটি-কোটি মহাবিশ্ব সম্পর্কে এ-সব খবরও আমরা অল্প কিছুদিন হল জানতে পেরেছি। এই বিপুল মহাবিশ্বে পৃথিবী কতটুকু? প্রায় কিছুই নয়। এমনকি সূর্যও একটা বিন্দুর মতো, তাও ছায়াপথকে যদি অনেক বড়ো মাত্রায় ভাবা যায়। আর মহা-বিশ্বের একটি ছবি যদি খুব বড়ো মাপে আঁকা যায় সেখানেও আমাদের এই ছায়াপথের আকার—যে-ছায়াপথের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আলো পৌছতে সময় লাগে এক লক্ষ বছর—বড়ো জোর টেনিসবলের মতো একটি ছোপ মাত্র। তার মধ্যে দশ হাজার কোটির একটি তারা সূর্যকে আলাদা করে দেখানো অসম্ভব। এমনিভাবে পৃথিবী সম্পর্কে যেমন আমাদের ধারণা বদলেছে, তেমনি ৪৬০ কোটি বছর বয়সের এই পৃথিবীতে মানুষের অবস্থা সম্পর্কেও। আমরা জেনেছি পৃথিবীতে মানুষ এসেছে বড়ো জোর ত্রিশ লক্ষ বছর আগে। তাও সেই গোড়ার দিকের মানুষের চেহারা এখনকার মানুষের মতো মোটেই নয়, তারা ছিল মানুষের মতো দেখতে বানর মাত্র, বা নর-বানর, বা এপ্, দু-পায়ে চলত, খাড়া হয়ে হাঁটত। এখনকার চেহারার মানুষের জন্য অপেক্ষা করতে হবে নেয়ানডার্টাল মানুষ পর্যন্ত আজ থেকে মাত্র পঁচাত্তর-হাজার বছর আগে। অতএব ৪৬০ কোটি বছর বয়সের পৃথিবীতে মানুষ এসেছে একেবারে এই

বিশ্বের কেন্দ্র এই পৃথিবীর আকার যে গোল তা প্রথম ভাবতে পেরেছিলেন গ্রীকরা—বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে তাই জানা যায়। তাঁদেরই একজন হচ্ছেন আনাক্সিমেনিস (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৫-৫২৮)। তিনি লক্ষ করেছিলেন, চন্দ্রগ্রহণের সময়ে চাঁদের চাকতির ওপরে পৃথিবীর ছায়া গোল হয়ে দেখা দেয়। পৃথিবীর ছায়া যদি গোল হয় তবে পৃথিবীও গোল।

পৃথিবী যদি গোল হয় তাহলে গোলকটির বেড় বা পরিধির একটা মাপ নেবার ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কি-ভাবে তা নেওয়া যেতে পারে? পায়ে পায়ে মাপ নিতে নিতে গোটা পৃথিবীকে একটা চক্কর দিয়ে আসা তো আর সম্ভব নয়।

আজ থেকে ২,২০০ বছর আগে এক অসাধারণ উপায়ে পৃথিবীর পরিধির মাপ নেবার কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার (মিশর) গ্রন্থাগারিক ইরাস্টোস্থেনিস (খ্রীষ্টপূর্ব ২৭৪-১৯৪)। তিনি
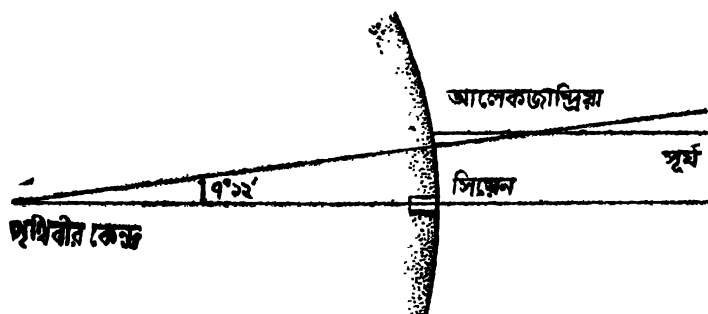
বছরের বিশেষ একটি দিনে সূর্যের কিরণ সিয়েন-এ পড়ে খাড়াভাবে, কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ায় তেরচাভাবে। এই ব্যাপারটির সাহায্য নিয়ে আজ থেকে ২,২০০ বছর আগে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারিক ইরাস্টোস্থেনিস পৃথিবীর পরিধির সঠিক হিসাব করেছিলেন।

শুনেছিলেন, বছরের বিশেষ একটি দিনে (২২শে জুন) সিয়েন-এ (একালের আসোয়ান বাঁধের কাছে) ঠিক দুপুরবেলা সূর্যের আলোয় কোনো ছায়া পড়ে না। সে-সময়ে গভীর পাতকুয়োর তলায় পর্যন্ত

রোদ্দুর পৌঁছে যায়। অথচ ঐ-দিন ঐ-সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় সূর্যের আলো পড়ে খানিকটা তেরচাভাবে। কতখানি তেরচাভাবে? ইরাস্টোস্থেনিস মাপ নিয়ে দেখলেন, ৭ ডিগ্রী ১২ মিনিট। তার মানে, যদি আলেকজান্দ্রিয়ায় পড়া সূর্যের আলো আর সিয়েনে পড়া সূর্যের আলো ভূ-গোলকের কেন্দ্রে গিয়ে মিলিত হত তাহলে এই কোণটিই উৎপন্ন হত— ৭ ডিগ্রী ১২ মিনিট। অর্থাৎ, এই কোণটুকুতে ধরা পড়েছে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সিয়েন পর্যন্ত পৃথিবীর পরিধির অংশ। পুরো পরিধিকে ধরতে হলে কেন্দ্রের বিন্দুর চারদিকে পুরোপুরি ঘুরতে হয় কৌণিক মাপে ৩৬০ ডিগ্রী। ৭ ডিগ্রী ১২ মিনিটকে ৫০ দিয়ে গুণ করলে ৩৬০ ডিগ্রী পাওয়া যায়। তার মানে, আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সিয়েন পর্যন্ত পরিধির যে অংশ রয়েছে তাকে ৫০ দিয়ে গুণ করলে পৃথিবীর পুরো পরিধি বেরিয়ে আসে। প্রাচীন পুথিপত্র থেকে জানা গেল যে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে সিয়েনের দূরত্ব ৫,০০০ স্টাডিয়া বা ৮০০ কিলোমিটার। তাহলে পৃথিবীর পরিধির মাপ দাঁড়ায় ৮০০ × ৫০ = ৪০,০০০ কিলোমিটার। এই মাপ মোটামুটি সঠিক। তারপরে বহু বিজ্ঞানী বহুবার পৃথিবীর পরিধির মাপ নিয়েছেন। সম্প্রতিকালে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহের পরীক্ষাগার থেকেও নতুন করে পৃথিবীর পরিধির মাপ নেওয়া হয়েছে। সমস্ত ফলাফল এরাস্টোস্থেনিসের পক্ষে গিয়েছে। ২,২০০ বছর আগে ইরাস্টোস্থেনিস মোটামুটি নির্ভুলভাবেই পৃথিবীর পরিধির মাপ নিতে পেরেছিলেন।

গ্রীক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করতেন, পৃথিবী হচ্ছে বিশ্বের কেন্দ্র এবং চন্দ্র সূর্য ও গ্রহসমূহ নিখুঁত বৃত্তাকার কক্ষে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এই ভূ-কেন্দ্রিক ব্যবস্থাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী টলেমি (খ্রীষ্টাব্দ ১২০-১৮০) তাঁর 'অ্যালমাজেস্ট' গ্রন্থে বিশদভাবে দাঁড় করিয়েছিলেন। সেখানে পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্র এবং পৃথিবীর চারদিকে পৃথক পৃথক কক্ষে ঘুরছে সূর্য, চন্দ্র, বিভিন্ন গ্রহ এবং

নক্ষত্রদের গোলক। কক্ষগুলো যদিও বৃত্তের মতো, কিন্তু কিছুটা জটিল। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় টলেমীয় ব্যবস্থা। দেড় হাজার বছর ধরে এই টলেমীয় ব্যবস্থা স্বীকৃত ছিল।

১৫৪৩ সালে প্রকাশিত হল কোপারনিকাসের গ্রন্থ 'গাগনিক গোলকদের আবর্তন বিষয়ে'। এই গ্রন্থে বিশ্বের গড়নকে দেখানো হল সূর্যকেন্দ্রিক হিসেবে। অর্থাৎ, সূর্য এই বিশ্বের কেন্দ্র। গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকে ঘুরছে—সবচেয়ে কাছ থেকে বুধ, তারপরে আরো বেশি বেশি দূর থেকে পরের পর শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি। তারও পরে স্থির নক্ষত্রদের গোলক, যেটি বিশ্বের সীমানা। স্থির নক্ষত্রদের গোলক ও সূর্য অনড়। চন্দ্র ঘুরছে পৃথিবীর চারদিকে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খাচ্ছে।

কোপারনিকাসের তত্ত্ব থেকেও গাগনিক গোলকদের সমস্ত গতিবিধি ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। সেটা এই কারণে যে কোপার-নিকাসও ধরে নিয়েছিলেন যে জ্যোতিষ্কের গতিপথ অবশ্যই হওয়া উচিত বৃত্তাকার, কেননা বৃত্তের মধ্যে রয়েছে নিটোল সম্পূর্ণতা। দু-হাজার বছর ধরে প্রচলিত এই ধারণা থেকে প্রথম বেরিয়ে আসতে পারলেন যোহান কেপ্‌লার (১৫৭১-১৬৩০)। তিনি দেখালেন গ্রহদের গতি বৃত্তের পথ ধরে নয়, উপবৃত্তের পথ ধরে। সূর্য রয়েছে উপবৃত্তের একটি ফোকাসে। তিনটি সূত্রের সাহায্যে কেপ্‌লার গ্রহদের গতি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

কোপারনিকাস ও কেপলারের পরেও কিন্তু ভূ-কেন্দ্রিক বিশ্বে বিশ্বাস ভেঙে পড়েনি। টলেমিই শিরোধার্য ছিল। কোপার-নিকাসের গ্রন্থ প্রকাশিত হবার আশি-বছর পরেও সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বে বিশ্বাসীর সংখ্যা এমনকি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মহলেও সামান্যই ছিল।

কোপারনিকাসের সূর্য-কেন্দ্রিক বিশ্বকে যিনি প্রতিষ্ঠা দিলেন

তিনি হচ্ছেন গ্যালিলিও। যে যন্ত্রের সাহায্যে তিনি এই চমকপ্রদ কাজটি সম্পন্ন করলেন তার নাম দূরবীন।

পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, একথা বলার জন্য গ্যালিলিওর জেল হয়েছিল। তবুও গ্যালিলিও নিশ্চিতভাবে জানতেন যে পৃথিবীই ঘুরছে।

বিশ শতকের শুরুতে এ-নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে পৃথিবী ও সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। কিন্তু তখনো ধারণা ছিল যে সৌরমণ্ডল রয়েছে বিশ্বের কেন্দ্রে।

তারপরে, এই শতকের সিকিভাগ পার হবার আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় মাউণ্ট উইলসন-এ তৈরি হয়েছিল বিশাল এক দূরবীন। তার আয়নার ব্যাস-ই ছিল আড়াই মিটার! এই দূরবীন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে জানা গেল, এই পৃথিবী রয়েছে অতি বিপুল এক তারাজগতের (Galaxy) মধ্যে, যাকে বলা হয় ছায়াপথ (Milky Way)। দশ হাজার কোটি তারা আছে এই ছায়াপথে, সূর্য তার মধ্যে একটি। ছায়াপথের আকার অনেকটা পিরীচের মতো, সূর্য তার সৌরমণ্ডল সমেত রয়েছে এই পিরীচের একটা প্রান্তের দিকে। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের তারার দূরত্ব হচ্ছে ৪.৩ আলো-বছর*। পৃথিবী থেকে ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরের সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌছতে সময় লাগে ৮ মিনিট। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্য ৮ আলো-মিনিট দূরে।

* আলো-বছর দূরত্বের মাপ। জ্যোতিষিক ক্ষেত্রে দূরত্বের মাপ এতই বিশাল যে তাকে সুবিধাজনকভাবে প্রকাশ করার জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দূরত্বের মাপ হিসেবে আলো-বছর ব্যবহার করেন। আলো একবছরে যে দূরত্ব পার হয় তারই নাম আলো-বছর। কতখানি দূরত্ব পার হয় আলো এক বছরে? প্রতি সেকেণ্ডে পার হয় ৩,০০,০০০ কিলোমিটার। প্রতি মিনিটে ৩,০০,০০০ কি.মি × ৬০ বা ১,৮০,০০,০০০ কি.মি.। প্রতি ঘণ্টায় ১,৮০,০০,০০০ কি.মি. × ৬০ বা ১০৮,০০,০০,০০০ কি.মি.। দিনে ১০৮,০০,০০,০০০ কি.মি. × ২৪ বা ২৫৯২,০০,০০,০০০ কি.মি.। বছরে ২৫৯২,০০,০০,০০০ কি.মি. × ৩৬৫ বা ৯৪৬০৮০,০০,০০,০০০ কি.মি.।

তারপরে বিশ্ব সম্পর্কে আরো অনেক খবর জানা গেল আমেরিকার মাউণ্ট উইলসনের কাছে আরো একটি দূরবীন তৈরি হবার পরে। দূরবীনটির ব্যাস ৫ মিটার। এই দূরবীন দিয়ে ৬০০ কোটি আলো-বছর দূরত্ব পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হল। তখন জানা গেল, আমরা যে তারাজগতে আছি, যার নাম ছায়াপথ, সেটি একমাত্র নয়। তারাজগৎ রয়েছে আরো অনেক, অনেক, অনেক। যতোদূর পর্যন্ত হদিস পাওয়া গিয়েছে তারই মধ্যে সংখ্যায় কোটি কোটি। প্রত্যেকটি তারাজগতে দশ হাজার কোটির মতো তারা আর বাইরে থেকে তার চেহারা অনেকটা পিরীচের মতো। বা, বলা যেতে পারে, চাকার মতো। অতি অতি অতি বিশাল এক চাকা--যে চাকার ব্যাস এক লক্ষ আলো-বছর, যে চাকার বেধ পঁচিশ হাজার আলো-বছর। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের যে তারাজগৎ তাকে বলা হয় অ্যাণ্ড্রোমিডার তারাজগৎ। সেটি রয়েছে পৃথিবী থেকে কুড়ি লক্ষ আলো-বছর দূরে।

১৯৩০-এর দশকের শেষদিকে আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার কার্ল ইয়ানস্কি তৈরি করলেন ৯.৩ মিটার ব্যাসের একটি রেডিও প্রতিফলক। তিনি জানালেন যে মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে রেডিও-সংকেত পৌঁছে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে ইংলণ্ডের চেশায়ারে জোডরেল ব্যাংক-এ তৈরি হল বিশাল এক রেডিও-দূরবীন। দেখতে প্রকাণ্ড একটা বাটির মতো, যে-বাটির ব্যাস ৭৫ মিটার। বাটিটাকে যে-কোনো দিকে ঘুরিয়ে ধরা চলে। তারপরে সারা পৃথিবী জুড়ে, এবং আমাদের দেশ ভারতেও, তৈরি হয়েছে বিশাল বিশাল রেডিও-দূরবীন। এই সমস্ত রেডিও-দূরবীনের সাহায্যে অনুসন্ধান চালিয়ে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, চোখে দেখার দূরবীনের পাল্লার বাইরেও থেকে গিয়েছে আরো অনেক অনেক তারাজগৎ, যেগুলো থেকে রেডিও-সংকেত পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়।

রেডিও-দূরবীনের অনুসন্ধান থেকে আরো জানা গেল, নিজের অক্ষের চারদিকে একবার পাক খেতে বুধগ্রহের সময় লাগে ৫৯ দিন।

আগে ধারণা ছিল সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে বুধের যে-সময় লাগে—৮৮ দিন—সেই একই সময় লাগে নিজের অক্ষের চারদিকে একবার পাক খেতে—৮৮ দিন। এই রেডিও-দূরবীনের সাহায্যে আরো জানা গেল শুক্রগ্রহ নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খায় অন্য সব গ্রহের মতো পশ্চিম থেকে পুবে নয়, পুব থেকে পশ্চিমে।

আমাদের সৌরমণ্ডলে গ্রহ আছে ন'টি। তার আছে লাখ-খানেক গ্রহাণু, কিছু ধূমকেতু ও উল্কাপিণ্ড। গ্রহগুলো সবাই নিজেদের অক্ষের চারদিকে পাক খায়। অধিকাংশ গ্রহের আছে নিজস্ব উপগ্রহ—পৃথিবীর যেমন চাঁদ।

সৌরমণ্ডলের বিভিন্ন গ্রহ সম্পর্কে কিছু তথ্য একটি সারণির আকারে তুলে দেওয়া হল (পরের পৃষ্ঠায়)।

গ্রহ	সূর্য থেকে দূরত্ব (লক্ষ কিলোমিটারে)	ব্যাস (কিলোমিটারে)	ভর (পৃথিবী = ১)	ঘনত্ব (জল = ১)	অক্ষের চারদিকে পাক খাওয়ার সময়	সূর্যের চারদিকে ঘোরার সময় (বছরে)	উপগ্রহের সংখ্যা
বুধ	৫৭৯	৪,৮৮০	০·০৬	৫ ৫	৫৮·৭ দিন	০·২৪১	
শুক্র	১,০৮২	১২,৩০০	০·৮	৫ ২৫	-২৪৩ দিন *	০·৬১৫	
পৃথিবী	১,৪৯৭	১২,৭৫৭	১·০	৫ ৫১৭	২৩ ঘ ৫৬ মি ৪ সে	১·০০০	১
মঙ্গল	২,২৭৯	৬,৭৯০	০ ১	৩·৯৪	২৪ঘ ৩৭মি ২২ ৬সে	১·৮৮১	২
বৃহস্পতি	৭,৭৮৩	১,৪২,৮০০	৩১৭ ৯	১.৩৩	৯ঘ ৫০মি ৩০ সে	১১·৮৬২	১৩
শনি	১৪,২৭০	১,১৯,৩০০	৯৫·২	০·৭১	১০ঘ ১৪ মি	২৯·৪৫৭	১০
ইউরেনাস	২৮,৬৯৬	৪৭,১০০	১৪ ৬	১·৭১	১০ঘ ৪৯ মি	৮৪ ০১৫	৫
নেপচুন	৪৪,৯৬৭	৪৫,৪০০	১৭ ২	১·৭৭	১৫ঘ ৪৮ মি	১৬৪·৭৮৩	২
প্লুটো	৫৯,১০০	৫,৯১০	০·০৮	৪·৫	৬·৩৯ দিন	২৪৮·৪২০	০

* শুক্রগ্রহ নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খায় অন্যান্য গ্রহ যেদিকে পাক খায় তার বিপরীত দিকে—অর্থাৎ পুব থেকে পশ্চিমে। উত্তরমেরু থেকে তাকিয়ে দেখলে অন্যান্য গ্রহের পাক খাওয়া ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে তার বিপরীত দিকে, শুক্রগ্রহের পাক খাওয়া ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে সেদিকে।

সৌরমণ্ডল কি-ভাবে হল?

সৌরমণ্ডলের উদ্ভব হল কি করে? পৃথিবী এল কোথা থেকে? এবারে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার। গত দুশো বছরে এ-প্রশ্নের জবাব অনেক বিজ্ঞানী অনেকভাবে দিয়েছেন। কয়েকটির উল্লেখ করা চলে।

দুশো বছরেরও আগে কোঁৎ দ্য বুফোঁ (১৭০৭-৮৮) নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত গ্রহ তৈরি হওয়ার ব্যাপারটি এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন: সূর্যের সঙ্গে বৃহৎ একটি জ্যোতিষ্কের সঙ্ঘর্ষ হয়েছিল। তার ফলে সূর্য থেকে বড়ো বড়ো বস্তুর খণ্ড খসে পড়েছিল। এই খণ্ডগুলোই পরে গ্রহ হয়ে উঠেছে।

১৭৫৫ সালে জার্মান দার্শনিক ইমান্যুয়েল কাণ্ট সৌরমণ্ডল তৈরি হওয়ার ব্যাপারটিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর মতে বিশাল এক গ্যাসীয় নীহারিকা থেকে সৌরমণ্ডলের উদ্ভব। ১৭৯৬ সালে এই কথাটিকে আরো ভালোভাবে ব্যাখ্যা করলেন ফরাসী গণিতবিদ পিয়ের লাপলাস। তিনি বললেন, নীহারিকাটি মহাকাশে আবর্তিত হচ্ছিল। ক্রমে নীহারিকাটি ঠাণ্ডা হয় ও ছোট হতে থাকে। যতোই ছোট হয় ততোই তার আবর্তন দ্রুত হয়। শেষকালে এতই দ্রুত আবর্তিত হতে থাকে যে গ্যাসের বলয় নীহারিকার গা থেকে খসে খসে বেরিয়ে যেতে থাকে। এমনিভাবে দশটি বলয় সেই নীহারিকা থেকে ছিটকে বেরিয়েছিল। তার মধ্যে নয়টি বলয় ঠাণ্ডা হয়ে জমতে জমতে হয়ে উঠেছে গ্রহ। বাকি একটি বলয় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে হয়ে উঠেছে লাখখানেক গ্রহাণু। আর কেন্দ্রস্থলে নীহারিকার যে অংশ থেকে গিয়েছিল তাই হয়ে উঠেছে সূর্য।

১৯০০ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই অধ্যাপক—জ্যোতি-

বিজ্ঞানী ফরেস্ট আর মুলটন ও ভূবিজ্ঞানী টমাস সি চেম্বারলিন ব্যাপারটাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করলেন। তাঁদের মতে, সূর্য ছিল একটি তারা—গ্রহহীন। বহুকাল আগে সূর্যের প্রায় গা ঘেঁষে একটি তারা চলে গিয়েছিল। তারই ফলে প্রচণ্ড টান পড়েছিল সূর্যের বস্তুপুঞ্জের ওপরে। আর তখন সূর্যের গা থেকে বড়ো বড়ো টুকরো ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। টুকরোগুলো গোড়ায় ছিল খুবই ছোট, সূর্যের চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে আরও বস্তু নিজেদের গায়ে টেনে নেয়। ক্রমেই আরো বড়ো হয় এবং শেষপর্যন্ত এখনকার চেহারা নিয়ে এক একটি গ্রহ হয়ে ওঠে।

১৯১১ সালে ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী জেমস জীনস ও জ্যোতি-বিজ্ঞানী হ্যারল্ড জেফ্রেস গ্রহ তৈরি হওয়া নিয়ে প্রায় একই ধরনের কথা বললেন। গ্রহহীন সূর্যের খুব কাছ দিয়ে একটি তারা চলে গিয়েছিল। সেই টানে সূর্য থেকে খানিকটা বস্তু বেরিয়ে এসে একটা চুরুটের মতো আকার ধারণ করে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে শুরু করেছিল। সেই চুরুট ক্রমে ঠাণ্ডা হয় ও জমাট বাঁধতে থাকে। তারই ফলে সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলোর জন্ম।

সৌরমণ্ডল কিভাবে তৈরি হল তাই নিয়ে এই হচ্ছে গোড়ার দিককার কিছু ভাবনাচিন্তা। পরে এগুলো সবই বাতিল হয়েছে।

আজকের দিনের বিজ্ঞানীরা কী বলেন? তাঁদের মতে, সৌর-মণ্ডলের জন্ম হয়েছে ধুলো ও গ্যাসের মেঘ থেকে। তারা আবিষ্কার করেছেন আমাদের এই তারাজগতে মহাশূন্যে অনেকগুলো বিশাল বিশাল ধুলো ও গ্যাসের মেঘ রয়েছে। এগুলোকে বলা হয় নীহারিকা। এই নীহারিকাগুলো জমাট বাঁধতে বাঁধতেই তারার জন্ম হয়।

নীহারিকা সম্পর্কে এসব খবর জানার পরেই ১৯৪৪ সালে জার্মান জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী কার্ল এফ ফন ভাইৎসাকার দাঁড় করালেন ধুলোর মেঘতত্ত্ব। এই তত্ত্বকে পরে আরো বিশদ করে তোলেন

আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী গেরার্ড পি কুইপার। তত্ত্বে বলা হয়েছে, ধুলো ও গ্যাসের বিশাল এক মেঘ মহাশূন্যে আবর্তিত হচ্ছিল। এই নীহারিকার মধ্যভাগ জমাট বেঁধে বৃহৎ একটি পিণ্ড তৈরি হয়। সেটি আদি সূর্য। ধুলোর মেঘের বাকি অংশ চ্যাপ্টা হয়ে পাতলা একটি চাকতির চেহারা নেয়। সেই চাকতি নতুন তৈরি সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে। তার মধ্যে তৈরি হয় ছোট ছোট ঘূর্ণি। মহাকর্ষের টানে সেই ঘূর্ণিগুলোর চারদিকে বস্তু জড়ো হতে থাকে। এগুলোই আদি-গ্রহ। চাকতির মধ্যে নয়টি আদি-গ্রহ তৈরি হয়েছিল। পরে তা থেকে পুরোপুরি গ্রহ।

ব্যাপারটা কখন ঘটেছিল? কতখানি সময় নিয়ে? পৃথিবীতে সবচেয়ে প্রাচীন যে শিলা পাওয়া গিয়েছে তার বয়স ৩৬০ কোটি বছর। বিজ্ঞানীরা তার সঙ্গে আরো ১০০ কোটি বছর যোগ করেন নীহারিকার বস্তু থেকে পৃথিবীর চেহারা তৈরি হবার জন্য।

ধুলো ও গ্যাসের মেঘ থেকে তারা ও গ্রহ তৈরি হওয়ার এই তত্ত্বটিকেই বিজ্ঞানীরা মোটামুটি মেনে নিয়েছেন। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ করার বিষয়, পৃথিবী তৈরি হবার পরে প্রথমে ছিল নিরেট ও ঠাণ্ডা অবস্থায়। তারপরে মহাকর্ষের ক্রিয়া ও তেজস্ক্রিয়তার ফলে পৃথিবীর ভিতরের উত্তাপ বাড়তে থাকে ও পৃথিবীর তরল অবস্থায় পৌছয়। পরে আবার জমাট বাঁধতে থাকে। পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড যদি আরো অনেক বড়ো হত তাহলে ভিতরকার চাপ ও উত্তাপ এতই বেশি হয়ে যেত যে পারমাণবিক একীভবনের ক্রিয়া শুরু হয়ে যেত। পৃথিবী তাহলে হয়ে উঠত একটি তারা। বৃহস্পতির বস্তুপিণ্ড আরো একটু বেশি হলে এই ব্যাপারটি ঘটে যেতে পারত—বৃহস্পতি হয়ে উঠত একটি তারা। সামান্যের জন্য হতে পারেনি। বৃহস্পতি তাই পরাভূত তারা—স্টার দ্যাট ফেইল্ড্।

ধুলো ও গ্যাসের মেঘ থেকে তারা ও গ্রহ হওয়ার এই তত্ত্ব দিয়েই গ্রহ-তারার ব্যাপারগুলোকে সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায়।

তবে এটাই শেষ কথা নয়। হতে পারে না। মহাবিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান বাড়লে এই তত্ত্বের জায়গাতেও নতুন তত্ত্ব হাজির হবে। মানুষের চিরকালের প্রশ্ন—এই পৃথিবী কোথায়, কখন, কি ভাবে তৈরি হল? এই প্রশ্ন থেকেই যাবে মনে হয়।

গ্রহ হিসেবে পৃথিবী

পৃথিবীর শুরু কি-ভাবে তা আমরা এখনো নিশ্চিতভাবে জানি না। কিন্তু পৃথিবীর চেহারা আকার ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিকভাবেই জানতে পেরেছি। গত দু-হাজার বছর ধরে মানুষ এই নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছে।

বাজারে যে ভূ-গোলক কিনতে পাওয়া যায় তাতে পৃথিবীকে দেখানো হয় পুরোপুরি একটি গোলক হিসেবে। আসলে কিন্তু তা নয়। পৃথিবীর চেহারা ওপরে-নিচে চাপা একটি গোলকের মতো। ওপরে-নিচে চাপা বলেই এই গোলকের পেটের দিকটা খানিকটা ফুলো।

পৃথিবীর এই রকম চেহারা কি করে হল? কেন হল না চৌকো বাকসের মতো, বা নলের মতো, বা মোচার মতো? এই কারণে যে পৃথিবীর আছে মহাকর্ষ, বা পৃথিবীর বেলায় যা বলা হয়, অভিকর্ষ। এই অভিকর্ষ থাকার জন্য পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে একটা টান থাকে। সবদিকে সমানভাবে টান থাকার জন্য পৃথিবীর উপরিতলের প্রত্যেকটি অংশ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে সমান দূরে থেকে যায়। তাই পৃথিবী নিটোল গোলকের চেহারা নিতে পারে। পৃথিবীর উপরিতল অবশ্যই খানিকটা অসমতল, তার কোথাও পর্বত, কোথাও সমুদ্র। কিন্তু এইটুকু অসমতল হওয়াটা এমন কিছু নয়।

গোলকের ওপর-নিচ চাপা আর পেটের দিক ফুলো কেন? কারণ, পৃথিবী তার অক্ষের চারদিকে ঘুরছে আর তার ফলে তৈরি হচ্ছে কেন্দ্রাতিগ শক্তি। জলকাদার ওপর দিয়ে যখন মোটর চলে, লক্ষ করলে দেখা যাবে মোটরের চাকা থেকে জলকাদা ছিটকে
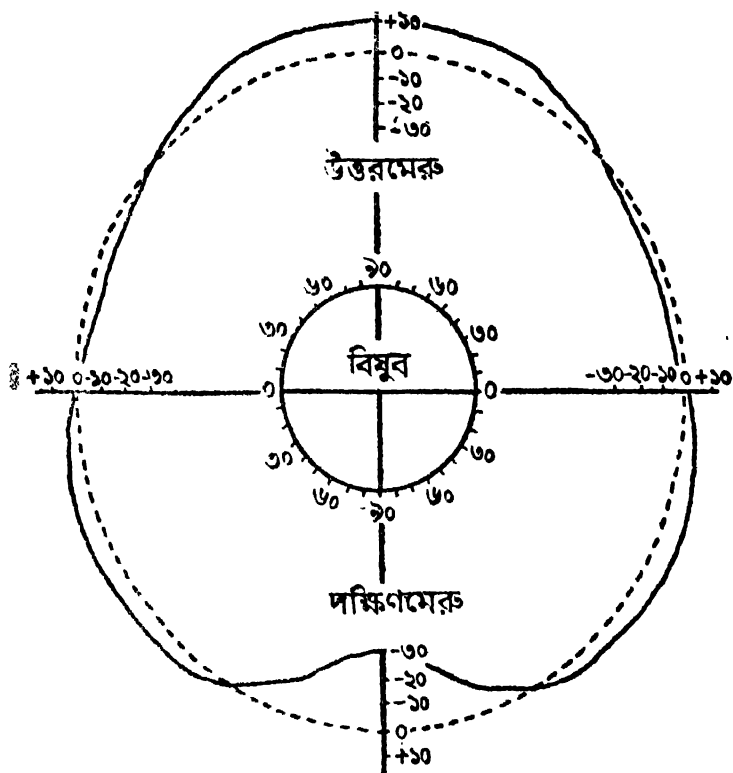
পৃথিবীর আকার। ১৯৫৭ সালে মহাকাশ গবেষণার যুগ শুরু হবার আগে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তা দেখানো হয়েছে ভাঙা লাইনে। ১৯৫৭ সালের পরে স্পুৎনিক ও অন্যান্য উপগ্রহের সাহায্যে হিসেব করে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে যে ধারণা করা হয়েছে তা আস্ত লাইনে। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উত্তর মেরুর দূরত্ব পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দক্ষিণ মেরুর দূরত্বের চেয়ে ৪০ মিটার বেশি। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য এই মাপ অনেক বড়ো করে দেখানো হয়েছে।

বেরিয়ে আসছে। এমনটি ঘটে ঘূরন্ত চাকায় তৈরি হওয়া কেন্দ্রাতিগ শক্তির জন্য। তেমনি পৃথিবীর পেটের কাছেও প্রবল একটি কেন্দ্রাতিগ শক্তি তৈরি হয়। তাতেই পেটের দিক কেন্দ্র থেকে খানিকটা দূরে আসতে পারে বা ফুলে ওঠে।

কিছুকাল হল পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ প্রচুর সংখ্যায় আকাশে তোলা হচ্ছে। সেগুলো পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এই সমস্ত উপগ্রহের মাপজোখ থেকে জানা গিয়েছে আমাদের এই পৃথিবীর চেহারায় আরো একটি খুঁত আছে। পৃথিবীর পেটের দিকের এই যে ফুলো সেটা ঠিক পেট-বরাবর নয়, খানিকটা নিচের দিকে, বা দক্ষিণ মেরুর দিকে। তার মানে, আমরা বলতে পারি, পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের চেয়ে একটু বেশি মোটা। অনেক বিজ্ঞানী তাই পৃথিবীর চেহারাকে তুলনা করেছেন ন্যাসপাতির সঙ্গে।

আকার

মহাকাশ থেকে পৃথিবীর ছবি দেখে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, আমরা যতোটা ভাবি পৃথিবী মোটেই ততোটা বড়ো নয়। সূর্যের তুলনায় বা অন্য কোনো তারার তুলনায় পৃথিবী তো একেবারেই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু এমনকি সৌরমণ্ডলের অধিকাংশ গ্রহের তুলনায়ও অতি ছোট। আবার আলাদাভাবে দেখলে একেবারে যে নগণ্য তাও নয়। পৃথিবীর পরিধি প্রায় ৪০,০০০ কিলোমিটার। তবে পৃথিবীর চেহারার জন্য তার ব্যাস জায়গা বিশেষে ভিন্ন হয়ে থাকে। উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত পৃথিবীর ব্যাস ১২,৬৪০ কিলো-মিটার। বিষুবের কোনো বিন্দু থেকে পৃথিবীর ব্যাসের মাপ আরো ৪৩ কিলোমিটার বেশি, অর্থাৎ ১২,৬৮৩ কিলোমিটার। ভিন্ন হওয়ার কারণ, বিষুব এলাকায় পৃথিবীর উপরিতলের সামান্য ফুলো।

এমন যে পৃথিবী তার ওজন কত ? মানুষের পক্ষে জানতে চাওয়া খুবই স্বাভাবিক। সঠিকভাবে প্রথম জানতে পেরেছিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হেনরি ক্যাভেন্‌ডিশ, ১৭৯৭ সালে। তাঁর পদ্ধতি ছিল অতি সরল। একটি তুলাদণ্ডের সাহায্যে তিনি মাপ নিয়েছিলেন একটি বড়ো সীসের গোলক ও ছোট সীসের গোলকের মধ্যে আকর্ষণের শক্তির। তারপরে হিসেব করেছিলন এই শক্তি পৃথিবীর অভিকর্ষের চেয়ে কতটা কম। তারপরে হিসেব করেছিলেন পৃথিবীর ঘনত্ব সীসের ঘনত্বের চেয়ে কতটা কম। তা থেকে হিসেব করেছিলেন পৃথিবীর ওজন। তা হচ্ছে ছয় কোটি কোটি কোটি টন, অর্থাৎ ৬-এর পরে একুশটি শূন্য বসালে যা পাওয়া যায় ততো টন। সংখ্যায় যদি লিখতে হয় ; ৬,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ টন।

গতিশীল গ্রহ

মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখে মহাকাশচারীদের মনে হয়েছে পৃথিবী যেন মহাকাশে ঝুলে আছে। অর্থাৎ পৃথিবী যেন অনড় একটি বস্তু। কথাটা মোটেই ঠিক নয়। আসলে এই পৃথিবী যেমন তার অক্ষের চারদিকে পাক খাচ্ছে, যেমন তার কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, তেমনি প্রচণ্ড এক বেগে মহাকাশে ধাবিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই তিনটি গতি ছাড়াও পৃথিবীর আছে একধরনের কাঁপুনি। লাট্টু যখন একটু কাৎ হয়ে পাক খায় তখন যেমন লাট্টুর শলাকার মাথাটি ছোট একটি বৃত্তে ঘুরতে থাকে, তেমনি ছোট একটি বৃত্তে ঘুরছে পৃথিবীর অক্ষদণ্ডটি।

পৃথিবীর অক্ষদণ্ড কল্পনা করে নিতে হবে। পৃথিবীর দুই মেরু-বিন্দু যেন একটি দণ্ড দ্বারা যুক্ত হচ্ছে। এইটিই পৃথিবীর অক্ষদণ্ড। এই অক্ষদণ্ডের চারদিকে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পুবে পাক খাচ্ছে, চব্বিশ ঘণ্টায় একবার। এই পাক খাওয়ার জন্যই পৃথিবীতে

দিন রাত্রি ঘটে থাকে। পৃথিবীর যে-অংশ সূর্যের দিকে সেদিকে দিন, যে-অংশ সূর্যের বিপরীত দিকে সেদিকে রাত্রি। অন্ধকার ঘরে ভূ-গোলকের ওপরে যদি টর্চের আলো ফেলা যায় আর ভূ-গোলকটিকে আস্তে আস্তে ঘোরানো যায় তাহলেও একই ব্যাপার চোখে পড়ে। টর্চের আলোয় ভূ-গোলকের যেদিক আলোকিত সেদিকে দিন, অন্ধকার অন্য দিকে রাত্রি।

পৃথিবীর এই পাক খাওয়ার বেগ কত? একজন মানুষ যদি পৃথিবীর বিষুবরেখার কোনো বিন্দুতে দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে বিন্দুটির সঙ্গে সঙ্গে মানুষটিও চলতে থাকে। তার চলার বেগ ঘণ্টায় ১৬৬০ কিলোমিটার। কিন্তু মানুষটি যদি ঠিক মেরুবিন্দুতে দাঁড়ায় তাহলে তার কোনো চলা নেই, দাঁড়িয়ে থেকেই চব্বিশ ঘণ্টায় পুরো একটি পাক খায়। তবে কোনো অবস্থাতেই মানুষটি কিন্তু বুঝতে পারে না যে সে চলছে বা পাক খাচ্ছে। কেননা তার আশেপাশের সবকিছু একই সঙ্গে চলছে বা পাক খাচ্ছে। কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করার সুযোগ না থাকলে আমরা গতি বুঝতে পারি না।

কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ কিলোমিটার বেগে, বা ঘণ্টায় প্রায় ৯৬,০০০ কিলোমিটার বেগে। এই প্রচণ্ড গতি সত্ত্বেও সূর্যের চারদিকে একবার ঘোরা শেষ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫$\frac{১}{৪}$ দিন। কক্ষপথে একবার ঘোরা শেষ করতে পৃথিবীকে পার হতে হয় ১০৯,৪৩,০৮,৫৬৮ কিলোমিটার, অর্থাৎ প্রায় ১০৯$\frac{১}{২}$ কোটি কিলোমিটার।

সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর কক্ষের আকার বৃত্তের মতো নয়, উপবৃত্তের মতো। সূর্য থাকে এই উপবৃত্তের একটি ফোকসে। তাই সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সারা বছরে সমান নয়। কখনো বাড়ে, কখনো কমে। গড় দূরত্ব ধরে নেওয়া হয় ১৫ কোটি কিলোমিটার। জুলাই মাসে পৃথিবী থাকে সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে, জানুআরি মাসে সবচেয়ে কাছে।

এবারে সেই কাঁপুনির কথা। কাঁপুনি বা ছোট একটি বৃত্তে পৃথিবীর অক্ষদণ্ডের ঘুরে চলা। এমনটি যে হয়ে থাকে তার কারণ পৃথিবীর অক্ষদণ্ডটি ঠিক সিধে খাড়া নয়, ২৩½ ডিগ্রী হেলানো। হেলে থাকার দরুন পৃথিবীর ওপরে সূর্য ও চন্দ্রের টানে হেরফের ঘটে এবং পৃথিবীর অক্ষদণ্ডটি ছোট একটি বৃত্তে ঘুরে চলে। জ্যোতিষিক ভাষায় এই চলাটির নাম অয়নচলন। তবে এই অয়নচলনের মাত্রা অতি সামান্য। বৃত্তে একবার ঘোরা শেষ করতে সময় লাগে ২৬,০০০ বছর।

এতগুলো গতির পরেও আরো একটি গতি আছে পৃথিবীর। ছায়াপথ তারাজগতের একটি তারা আমাদের সূর্য, সেই সূর্য গতিশীল। সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ও সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহও গতিশীল। পৃথিবীর এই গতির বেগ সেকেণ্ডে প্রায় ২০ কিলোমিটার। ধাবিত হচ্ছে অভিজিৎ তারার দিকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী কোনোক্রমেই স্থির বা অনড় নয়। এই মুহূর্তে যখন আমি আমার টেবিলের সামনে স্থির হয়ে বসে আছি তখনো কিন্তু ঘণ্টায় প্রায় ষোল হাজার কিলোমিটার বেগে পাক খাচ্ছি, সেকেণ্ডে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার বেগে কক্ষপথে ঘুরছি, সেকেণ্ডে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার বেগে অভিজিৎ তারার দিকে ধাবিত হচ্ছি। এতগুলো বেগ আমার মধ্যে।

পৃথিবী কেমন

আইরিশ ধর্মযাজক জেম্‌স আশার (১৫৮১-১৬৫৬) আজ থেকে ৩৩০ বছর আগে একটি বই লিখেছিলেন—'অ্যানাল্‌স অফ ওল্ড অ্যাণ্ড নিউ টেস্টামেন্টস' (পুরনো ও নতুন টেস্টামেণ্টের বছরওয়ারী বিবরণী)। তাতে একটি হিসেব দেখিয়ে বলা হয়েছিল যে পৃথিবীর

জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ অব্দে। পরে কেমব্রিজের ডঃ জন লাইটফুট (১৬০২-৭৫) এই হিসেবটিকে আরো সঠিক করে তোলেন। তিনি দেখান, পৃথিবীর জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ অব্দে ২৩শে অক্টোবর সকাল ন'টার সময়ে। বাইবেল-সম্মত এই হিসেব সকলে মেনে নিয়েছিল। একই ভাবে হিসেব করে ঠিক করা হয়েছিল, বাইবেলে যে প্লাবনের কথা আছে তার সময় খ্রীষ্টপূর্ব ২৩৪৮ অব্দে। এই প্লাবনের জন্যই পর্বত থেকেও সামুদ্রিক জীবের ফসিল পাওয়া যাচ্ছিল। যা ছিল সমুদ্রের নিচে, প্লাবনের জলের সঙ্গে তাই উঠে এসেছে পর্বতের ওপরে।

আজকের দিনে এই ব্যাখ্যা অচল। এখন সবাই মেনে নিয়েছে যে সমুদ্রের নিচে পলি জমে তৈরি হওয়া শিলায় যে ফসিল পাওয়া যায় তার বয়স অনেক অনেক বেশি। বিজ্ঞানীরা এখন তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপ থেকে শিলার বয়স ঠিক করতে পেরেছেন। তা থেকে পৃথিবীর বয়স মোটামুটি সঠিকভাবেই অনুমান করা চলে। পৃথিবীর বয়স ৪৬০ কোটি বছর—তার কম হতেই পারে না।

একসময়ে ধারণা ছিল পৃথিবীর ভূ-ভাগের এখন যে আকার দেখছি, সৃষ্টির গোড়া থেকেই তাই ছিল। সেখানে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। এখন এই ধারণাও বাতিল। এখন সবাই মানে, বিপুল এক ক্ষয়ের ক্রিয়া অবিরাম ঘটে চলেছে এবং ভূ-ভাগ সবসময়ে পরিবর্তিত হচ্ছে। ক্ষয় হচ্ছে শিলার—বৃষ্টির জলে ; গভীর উপত্যকার—নদী ও হিমবাহের প্রবাহে ; তটভূমির—সমুদ্রের ঢেউয়ে। পর্বতের ক্ষয় ছড়িয়ে পড়ে সমতলে ও ব-দ্বীপ তৈরি হয়, কিংবা নদীর জলের সঙ্গে গিয়ে পড়ে সমুদ্রে। তারপরে সমুদ্রের নিচে পলি হয়ে জমে এবং সেই অবস্থায় থাকতে থাকতে একসময়ে শিলা হয়ে ওঠে। আবার একসময়ে সেই শিলা হয়তো ঠেলে উঠে পর্বতের চুড়ো হয়ে দাঁড়ায়।

এই পরিবর্তন অবিরাম হয়ে চলেছে। একজন মানুষের জীবনে

হয়তো চোখে পড়ার মতো কিছু ঘটে না। কিন্তু কোটি-কোটি বছর ধরে চললে এমনকি এভারেস্টের মতো উঁচু পর্বতও সমতল হয়ে যেতে পারে। আমরা তাই এখন স্বীকার করি, পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস জানতে হলে এই ক্ষয়-হয়ে-চলা ও জমতে-থাকার ক্রিয়াটিকে মূল বিষয় হিসেবে ধরতে হবে। এই ভাবনা তিনশো বছর আগেকার মানুষের ভাবনার চেয়ে একেবারেই আলাদা। এমন একটা বিপ্লব কারা ঘটাল ?

গ্রীক বিজ্ঞানীরা ভূ-ভাগের আকার নিয়ে কিছু কথা বলেছিলেন, কিন্তু তার কোনো ছাপ পড়েনি। আজ থেকে হাজার বছর আগে আরবদেশের একজন দার্শনিক ও চিকিৎসক এ-কালের বিজ্ঞানীর মতোই বলেছিলেন, জলের প্রবাহ ভূ-ভাগের বড়োরকমের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। সে-কথায় কেউ কান দেয়নি। মধ্যযুগের ইউরোপে পণ্ডিতদের কাছে বাইবেলের কথাই অকাট্য ছিল। বাইবেলে সৃষ্টি সম্পর্কে যেমনটি বলা হয়েছে—যে, ঈশ্বর সোম থেকে শনি এই ছ'দিনে তাবৎ বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন আলো হোক অমনি আলো হয়েছিল, ইত্যাদি—তাই সবাই মেনে নিয়েছিল। ষোল শতকের আগে এ-থেকে উল্টোরকমের কোনো কথা কারও মুখে শোনা যায়নি।

ষোল ও সতেরো শতকে অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করত, সৃষ্টির গোড়া থেকেই ভূ-ভাগের চেহারা এই একই রকম। তবে, মাঝে মাঝে অলৌকিক কারণে মহাপ্রলয় ঘটতে পারে এবং তার দরুন ভূ-ভাগের চেহারায় কিছু পরিবর্তন ঘটা সম্ভব। এই ধারণাকে বলা হত মহাপ্রলয়বাদ। যারা বিশ্বাস করত পৃথিবীর বয়স কয়েক হাজার বছর মাত্র তাদের সঙ্গে এই মতবাদের কোনো বিরোধ ছিল না। কেননা, যদি ধরেও নেওয়া যায় যে নদীর স্রোতে জমির ক্ষয় হচ্ছে তাহলেও এই ক্ষয় এমন মাত্রার নয় যে কয়েক হাজার বছরের মধ্যে গভীর উপত্যকা তৈরি হতে পারে।

কিন্তু এমন গবেষকও ছিলেন যিনি জানতে চান ও নিজের চোখে দেখতে পারেন। এমনি একজন হচ্ছেন ইতালির বিখ্যাত শিল্পী ও বিজ্ঞানী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯)। তাঁর ধারণা হয়েছিল, যে-শিলা থেকে সামুদ্রিক জীবের ফসিল পাওয়া যাচ্ছে সেটি বাইবেলের প্লাবনের সময় উঠে এসেছিল —তা হতেই পারে না। বরং এমনটি হওয়াই সম্ভব যে সামুদ্রিক জীবের ফসিল সহ শিলা যেখানে পাওয়া যাচ্ছে সেখানে এককালে ছিল সমুদ্র, আর ফসিল হচ্ছে এই সমুদ্রের জীবের নিদর্শন। তাঁর মনে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না যে নদীর জলস্রোত যে ক্ষয় ঘটায় তার দরুন গভীর উপত্যকা তৈরি হতে পারে, নদীর জলস্রোতে এক-জায়গায় জিনিস সরে এসে অন্য-জায়গায় জমা হতে পারে।

পরে আরও অনেকে এমনি ধরনের কথা বলেছিলেন। কিন্তু ধর্মীয় তত্ত্বজ্ঞানীদের সঙ্গে তাদের বিরোধ বেধে যেত। এমনি একজন পণ্ডিত হচ্ছেন ফরাসী দেশের কোঁৎ দ্য বুফোঁ। আঠারো শতকে তিনি ছিলেন সেই প্রথম দলের একজন যাঁরা বলেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাস যতোটা ধরা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সময়ের। বাইবেল অনুসারে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে ছ'টি দিনে। কোঁৎ দ্য বুফোঁ বললেন, এই ছ'টি দিনকে ধরতে হবে ছ'টি যুগ হিসেবে।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভূতত্ত্বের গবেষণা অনেকখানি ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেকে অনেকভাবে গবেষণা করছিলেন, কিন্তু মতামতের দিক থেকে ভাগ হয়ে গিয়েছিলেন দুটি প্রধান চিন্তাধারায়। একটি ধারার নেতৃত্বে ছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী আব্রাহাম গোট্‌লোব ভের্নার (১৭৫০-১৮১৭) ও অপর ধারার নেতৃত্বে স্কটদেশীয় বিজ্ঞানী জেমস হাটন (১৭২৬-৯৭)। ভের্নার মনে করতেন, অতীতে সময়ে সময়ে ভূ-পৃষ্ঠ পুরোপুরি সমুদ্রে ডুবে যেত এবং সেই সমুদ্রের জল থেকে থিতিয়ে পড়া পলল জমে গিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত শিলাস্তর তৈরি হয়েছে। তিনি একথা স্বীকার করতেন যে

পাথরের মধ্যে দিয়ে কেটে কেটে নদীর উপত্যকা হয়ে থাকে। কিন্তু সেই উপত্যকা তৈরি করেছিল নদী নয়, সমুদ্র। ভের্নারের মতবাদ যারা মানত তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল নেপ্‌চুনিস্ট।

একই সময়ে জেমস হাটন পৃথিবীর উপরিতল সম্পর্কে একটি নতুন তত্ত্ব গড়ে তুলছিলেন। তিনি ছিলেন ইউরোপের এমন এক আদি বিজ্ঞানী যিনি বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীর বয়স অনেক অনেক বেশি এবং পৃথিবীর উপরিতল অনবরত বদলাচ্ছে। এই বদল ঘটাচ্ছে অলৌকিক নয়, প্রাকৃতিক শক্তি। তিনি পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন রোদে-জলে-বাতাসে শিলা ভেঙে পড়ে, বৃষ্টির জল জমি ধুয়ে নিয়ে যায়, ছুটন্ত জল গভীর উপত্যকা কেটে চলে। তার মানে দাঁড়ায়, পৃথিবীর ইতিহাস অনেক অনেক কালের মাত্র কয়েক হাজার বছরের হতেই পারে না। তিনি সঠিকভাবেই ধরতে পেরেছিলেন, পাললিক শিলা তৈরি হয় মহাদেশের কাছাকাছি এলাকার সমুদ্রের নিচে। মহাদেশের ওপরে ভাঙন ও ক্ষয়ের বিপুল প্রক্রিয়া অবিরাম হয়েই চলেছে। তারই উপকরণ নদীর স্রোতে ও অন্য নানাভাবে এসে পড়ে সমুদ্রে, সেখানে থিতিয়ে পড়ে এবং কালক্রমে শিলা হয়ে ওঠে। তারই মধ্যে থেকে যায় যে সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ তার হুবহু একটি ছাপ শিলার মধ্যে ফুটে ওঠে। অতএব, ফসিল বা জীবাশ্ম হচ্ছে অবিরাম এক পরিবর্তনের সাক্ষ্য। তিনি আরো বলেছিলেন, ভূত্বকের নিচে যে উত্তাপ রয়েছে সেই উত্তাপই থিতিয়ে পড়া পলিকে পাললিক শিলা করে তোলে এবং সেই উত্তাপেই পাললিক শিলার স্তর সমুদ্রের ওপরে উঠে আসে। তার এই ব্যাখ্যায় অবশ্য ভুল ছিল, কিন্তু তখনকার দিনের পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যার সামান্য জ্ঞান নিয়ে এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক। হাটনের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব এই যে ক্ষয়-হওয়া ও জমা-হওয়ার মধ্যে সম্পর্কটা তিনি তুলে ধরেছিলেন এবং অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে বর্তমানের প্রকৃতির মধ্যেই অতীতের প্রকৃতিকে

ধরা যায়। তাঁর ভাষায়, বর্তমানই হচ্ছে অতীতের চাবিকাঠি (Present is the key to the past)। এটি তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি। তাই তিনি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে পেরেছিলেন, 'এই জগৎ-ব্যাপারের কোথায় যে শুরু তার কোনো চিহ্ন আমরা পাই না, কোথায় যে শেষ তার কোনো সম্ভাবনা দেখি না' (We find no vestige of a beginning—no prospect of an end)।

নানা ধরনের শিলার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাও হাটন ধরতে পেরেছিলেন। আগ্নেয়গিরির লাভা জমাট বেঁধে যা হয়, আর মাটির নিচে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে থেকে গলিত শিলা জমাট বেঁধে যা হয়-- দুয়ের মধ্যে ভিন্নতার কথা তিনি বলেছিলেন। দ্বিতীয় প্রকারের শিলাই যে বিশেষ বিশেষ পাথরের চেহারা নিয়ে থাকে, তাও তাঁর অজানা ছিল না। শিলার জন্ম সম্পর্কে ভের্নার যা বলেছিলেন তা থেকে হাটনের কথা ছিল একেবারেই আলাদা। তখন হাটনের অনুগামীদের নাম হয়ে গেল আগ্নেয়গিরিবাদী বা প্লুটোনিস্ট (Volcanist or Plutonist)।

হাটনের কথায় খুব যে একটা সাড়া জেগেছিল তা নয়। কিন্তু মহাপ্রলয়বাদীরা ও নেপচুনিস্টরা ছেড়ে দেননি। তাঁরা সমানে আক্রমণ চালাতে লাগলেন। হাটনও জবাব দিলেন। ১৭৯৫ সালে নতুন সংস্করণে প্রকাশিত হল দুই-খণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'পৃথিবীর তত্ত্ব' ('Theory of the Earth')।

হাটনের মৃত্যুর পরে তাঁর লড়াই চালিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁর দুই বন্ধু। স্যার জেমস হল পরীক্ষা করে দেখালেন শিলার ওপরে প্রচণ্ড উত্তাপের ক্রিয়া কী হতে পারে। তবে তিনি কিন্তু ক্ষয় সম্পর্কে হাটনের মতামত মানতেন না। অন্য বন্ধু জন প্লেফেয়ার (১৭৪৮ — ১৮১৯) ছিলেন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ, হাটনের সমালোচকদের প্রতিটি কথার তিনি জবাব দিলেন। হাটনের মৃত্যুর পাঁচবছর পরে প্রকাশিত হল প্লেফেয়ারের গ্রন্থ 'হাটনীয় তত্ত্বের দৃষ্টান্ত'

('Illustration of Huttonian Theory')। লেখার ক্ষমতা প্লেফেয়ারের ছিল অসাধারণ, বইটি সাড়া জাগাল।

হাটনের সমর্থনে প্লেফেয়ার তাঁর এই বইয়ে অনেক নতুন তথ্যও উপস্থিত করলেন। উল্লেখযোগ্য একটি তথ্য 'ইরাটিক' (erratic) বা আগামুক সম্পর্কে। আগামুক হচ্ছে সুবিশাল এক পাথরখণ্ড যা বেমানানভাবে অনুচিত জায়গায় এসে গিয়েছে। প্লেফেয়ার বললেন, এই আগামুক পাথর নিয়ে এসেছে হিমবাহ। বরফ গলে যাবার পরে হিমবাহ আর থাকেনি, পড়ে আছে বয়ে আনা পাথর।

হাটন ও প্লেফেয়ার যে তত্ত্বটি প্রচার করেছিলেন তার মূলকথা এই যে আজকের দিনে প্রকৃতিজগতে যে-সমস্ত প্রক্রিয়া আমরা দেখতে পাই সেগুলো ইতিহাসে বরাবরই সমানভাবে ও একটানা কাজ করে এসেছে। প্রাকৃতিক ধারার মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। এই তত্ত্বের নাম দেওয়া হল প্রাকৃতিক নিত্যতাবাদ (Uniformatarianism)। তত্ত্বটি যে কতখানি খাঁটি তা বোঝা গিয়েছিল আরো প্রায় একশো বছর পরে :

প্লেফেয়ারের বই-এর প্রকাশ-কাল ১৮০২। তারপরে প্রায় তিরিশ বছর ধরে প্রচণ্ড বিতর্ক চলেছিল নিত্যতাবাদী ও মহাপ্রলয়-বাদীদের মধ্যে। মহাপ্রলয়বাদীদের মধ্যে অবশ্যই ছিল গির্জার পাদরিরা ও গোঁড়া খ্রীষ্টানরা। তাঁদের অটল বিশ্বাস ছিল বাইবেলের প্লাবনে। নদীর ক্ষয়ে উপত্যকা তৈরি হতে পারে, হাটনের এই কথায় ফরাসী প্রকৃতিবিজ্ঞানী ব্যারন কুভিএ পর্যন্ত সমর্থন জানাতে পারেন নি, যদিও মতবাদের দিক থেকে তিনি নেপচুনিস্ট ছিলেন না। তাঁরা বলতেন, নদীর উপত্যকা তৈরি হয়েছে প্লাবনের জন্য, বা, ভূত্বকে কোনো একটা বিপর্যয় ঘটার জন্য। একই কারণে আগামুক পাথর অস্থানে এসে গিয়েছে।

প্লাবনে বিশ্বাসী এই তাত্ত্বিকদের নাম দেওয়া হল প্লাবনবাদী (Diluvialist)। কিছুকাল তাঁরাই দলে ভারী ছিলেন।

তারপরে, ১৮৩০ থেকে ১৮৩৩ সালের মধ্যে তিনখণ্ডে প্রকাশিত হল স্যার চার্লস লায়লের (Sir Charles Lyell) যুগান্তকারী গ্রন্থ — 'ভূতত্ত্বের নীতি' ('Principles of Geology')।

চার্লস লায়ল (১৭৯৭-১৮৭৫) ছিলেন নিত্যতাবাদের বড়ো প্রবক্তা। গোড়ায় ছিলেন প্লাবনবাদীদের দলে, কিন্তু প্লেফেয়ারের বই পড়ে মত বদলান। ১৮২০-র দশকে ব্রিটেনে ও ফ্রান্সে প্রচুর ভূতাত্ত্বিক গবেষণা করেছিলেন। তাঁর বইয়ে প্রচুর নতুন তথ্য ছিল। বইটি সাড়া জাগায়।

প্লাবনবাদীদের মতামতকে তিনি একেবারে শেষ করে দিয়েছিলেন। তবে গোড়া ধর্মবিশ্বাসীদের একেবারে চটিয়ে দিতে চাননি। স্বীকার করেছিলেন বাইবেলের সেই প্লাবন হয়েছে বটে কিন্তু খুবই ছোট এলাকায়—সারা পৃথিবী জুড়ে নয়। যাঁরা বিশ্বাস করতেন প্লাবনের জন্যই ভূ-দৃশ্যে এতসব বৈচিত্র্য ঘটেছে তাঁদের ওপরে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছিলেন। অন্যদিকে নিজেও কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন না যে একমাত্র নদীর ক্ষয়ের দরুনই এত বড়ো বড়ো উপত্যকা তৈরি হয়েছে।

তারপরে প্লাবনবাদ আর বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। প্লাবনবাদীদের বেশির ভাগই ভুল স্বীকার করলেন। কিন্তু মহাপ্রলয়বাদ শেষ হয়নি। কেননা অনেকের পক্ষেই মানা শক্ত ছিল যে শুধুমাত্র নদীর ক্ষয়ে উপত্যকা তৈরি হতে পারে। নিত্যতাবাদের বড়ো প্রবক্তা চার্লস লায়ল পর্যন্ত এই না-মানার দলে ছিলেন

১৮২০-র দশকে পৃথিবীর ভূ-আকার গড়ে ওঠার নতুন ব্যাখ্যা শোনা গেল। ফ্রান্স, নরওয়ে ও সুইজারল্যাণ্ডের একদল বিজ্ঞানী ইউরোপীয় মহাদেশে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে ঘোষণা করলেন, অতীতের কোনো এক সময়ে ইউরোপীয় মহাদেশের বেশির ভাগ অংশ আল্পস পর্বতের হিমবাহে ঢাকা পড়েছিল। সুইজারল্যাণ্ডের এক অধ্যাপক, লুই আগাসিজ (১৮০৭-৭৩), এ-বিষয়ে গবেষণা করে

১৮৪০ সালে গবেষণার ফল প্রকাশ করেছিলেন। তিনি নিশ্চিতভাবে জানান যে একসময়ে ইউরোপের আবহাওয়া ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম এবং সে-সময়ে ইউরোপের অনেকখানি অংশ হিমবাহ ও বরফের আস্তরের নিচে চাপা পড়েছিল। তাঁর এই মত অনেকেই মেনে নেয় এবং কিছুকালের মধ্যেই সাধারণভাবে গ্রাহ্য হয়ে যায়।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ভূ-আকার নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলতে থাকে। ১৮৭৫ সালের মধ্যেই দেখা যায় - নদীর ক্ষয়, হিমবাহ নেমে আসা, জমি গড়ে ওঠা, ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি মতের মিল হয়েছে।

১৮৭৫ সালের পরে ভূ-আকার নিয়ে বড়ো রকমের গবেষণা চালান আমেরিকান বিজ্ঞানীরা। প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখ করা দরকার তিনি হচ্ছেন জন ওয়েস্লি পাওয়েল (১৮৩৪-১৯০২)। গবেষণার জন্য তিনি প্রচুর ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, এমনকি কোলোরাডো নদীর বিখ্যাত গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন নৌকোয় পার হয়েছিলেন। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়ে তাঁর একটি হাত খোয়া যায়, কিন্তু তার-পরেও ভূ-তাত্ত্বিক অভিযান বন্ধ করেন নি। জমির ক্ষয় নিয়ে তিনি অনেক গবেষণা ও অনুসন্ধান করেছিলেন। মনে করতেন, জমির ক্ষয় যদি চলতেই থাকে তাহলে একটা সময় আসে যখন জমি সমান হতে হতে প্রায় সমভূমি হয়ে ওঠে। তাঁর এই মতকে গ্রহণ করে পরবর্তী কালের সুবিখ্যাত বিজ্ঞানী ডবলু এম ডেভিস ক্ষয়ের শেষ সীমানায় আসা এই জমির নাম দিয়েছেন সমপ্রায় ভূমি (peneplain)।

গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন পাওয়েল। লক্ষ করেছিলেন, পর-পর সাজানো শিলাস্তরের মধ্যে অননুক্রম (ছেদ) এসে যাচ্ছে। এই ছেদগুলো, তাঁর মতে, ক্ষয়ের শেষ সীমানায় পৌঁছবার পরে সমপ্রায়ভূমির চিহ্ন।

পাওয়েলের সহকারী ছিলেন গ্রোভ কার্ল গিলবার্ট (১৮৪৩-১৯১৮)।

তিনি প্রচুর ভূ-বিবরণ লিখেছিলেন এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সন্ধান দিয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই হিসেব পাওয়া গিয়েছিল—নদীর জলের পরিমাণ, খাড়াই ও স্রোতের বেগ কতখানি হলে বয়ে নিয়ে যাওয়া উপকরণের পরিমাণ কতখানি হতে পারে।

এমনি আরো সব বিজ্ঞানীর গবেষণার পরে যিনি এলেন তাঁর নাম উইলিয়ম মরিস ডেভিস (১৮৫১-১৯৩৪)। তাঁকে বলা হয় 'মহান ব্যাখ্যাকারী ও বিশ্লেষণকারী' (great definer and analyst)। ভূ-বিষয়ে এতাবৎকাল যা কিছু জানা ছিল সমস্ত মিলিয়ে তিনি একটি সাধারণ তত্ত্ব দাঁড় করালেন। এই তত্ত্বের সবচেয়ে বিখ্যাত অংশ 'ক্ষয়ের চক্র' (cycle of erosion)। ব্যাপারটা এই : একখণ্ড জমি উঁচু হয়ে উঠল। প্রথমে শুরু হয় তার তারুণ্যের পর্ব। তখন সেখানে খরস্রোতা নদী গভীর উপত্যকা কেটে বয়ে চলেছে। তারপরে প্রবীণতার পর্ব। তখনো নদীর তেজ আছে, বয়ে চলেছে গভীর উপত্যকার মধ্যে দিয়ে। শেষে বার্ধক্যের পর্ব। তখন জমি প্রায় সমতল, নদী তিরতিরে। পরবর্তী কালের ভূ-সংস্থানবিদরা অবশ্য বলেছেন, এই বার্ধক্যের অবস্থায় পৌঁছবার আগেই জমি আবার ঠেলা খেয়ে উঁচুতে ওঠে এবং আবার শুরু হয় তার তারুণ্যের পর্ব। তাহলেও তাঁর সাধারণ তত্ত্ব বাতিল হচ্ছে না। ডবলু এম ডেভিসের সাধারণ তত্ত্বের ওপরেই আধুনিক ভূ-সংস্থানবিদ্যার অনেকখানি দাঁড়িয়ে আছে।

পৃথিবীর উপগ্রহ

সৌরমণ্ডলের ন'টি গ্রহের মধ্যে সাতটিরই উপগ্রহ আছে। নেই দুটির—বুধের ও শুক্রের। সবচেয়ে বেশি উপগ্রহ বৃহস্পতির—তেরটি। সবচেয়ে কম পৃথিবীর—একটি। চন্দ্র বা চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। তবে উপগ্রহ হিসেবে চাঁদের মহিমা আছে। চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে মাত্র বিরাশি ভাগ ছোট। সৌরমণ্ডলের অন্য সব উপগ্রহ তাদের গ্রহের চেয়ে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ ভাগ ছোট। তাই কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন, চাঁদ ও পৃথিবীকে যুগল-গ্রহ হিসেবে দেখা উচিত।

চাঁদ তৈরি হল কি ভাবে?

এ প্রশ্নের জবাব এখনো পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে দেওয়া চলে না। তবে এ-সম্পর্কে চারটি তত্ত্ব আছে। প্রথম যে তত্ত্বটি প্রচলিত ছিল তাতে বলা হয়েছে, চাঁদ একসময়ে পৃথিবীরই অংশ ছিল এবং যে-কোনো কারণে হোক পৃথিবী থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। তত্ত্বটি উপস্থিত করেছিলেন বিবর্তনবাদের প্রবক্তা চার্লস ডারউইনের পুত্র জর্জ ডারউইন (১৮৪৫-১৯১২)। তিনি হিসেব করে দেখিয়েছিলেন, একসময়ে চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় ছিল এবং তখন এই দুটি বস্তুপিণ্ড প্রায় চার ঘণ্টায় একবার আবর্তিত হত। পরে এই তত্ত্বটিকেই একটু অন্যভাবে বলা হয়। একেবারে গোড়ার দিকে পৃথিবীর আবর্তনকাল ছিল ২'৬ ঘণ্টা। তারপরে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের লোহা সেই বস্তুপিণ্ডের কেন্দ্রীয় এলাকায় জড়ো হয়। পৃথিবীর আবর্তনের বেগ যায় আরো বেড়ে এবং তার ফলে পৃথিবীর চেহারা হয়ে ওঠে পেয়ারার মতো। এমনি চলতে চলতে পেয়ারার বোঁটার দিকের অংশটি ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে চাঁদ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় এই

তত্ত্বের প্রবক্তারা বলেন, তাঁদের তত্ত্বের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ এই যে চাঁদের ঘনত্ব (জলের ঘনত্ব ১ ধরলে) ৩·৩—পৃথিবীর বাইরের দিককার স্তরের ঘনত্বের সমান (পৃথিবীর মোট ঘনত্ব ৫·৫)। তাছাড়া, মোটামুটি সবাই মানেন যে চাঁদে লোহার অংশ খুবই কম এবং চাঁদের কেন্দ্রীয় অংশে ধাতু নেই। এই দুটি ঘটনাও দ্বিতীয় তত্ত্বের পক্ষে যাচ্ছে।

অনেকে মনে করেন চাঁদ তৈরি হয়েছে পৃথিবীর কক্ষে ছড়িয়ে থাকা বস্তুকণা একসঙ্গে জড়ো হয়ে। জড়ো হতে হতে প্রথমে ছিল ছোট, তারপরে ক্রমেই বড়ো থেকে বড়ো। অন্য অনেকের ধারণা, চাঁদ গড়ে উঠেছিল সৌরমণ্ডলের পৃথক একটি গ্রহ হিসেবে। তারপরে কোনো এক সময়ে গ্রহটি পৃথিবীর অভিকর্ষে বাঁধা পড়ে গিয়েছে ও পৃথিবীর উপগ্রহ হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বৃহস্পতি ও বৃহস্পতির মতো অতিকায় গ্রহগুলোর গোটাকতক উপগ্রহও এমনিভাবে তৈরি হয়েছে। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে যে লাখখানেক গ্রহাণু থেকে গিয়েছে তাদেরই কতকগুলো টুকরো অন্য গ্রহের টানে বাঁধা পড়ে গিয়ে নিশ্চয়ই উপগ্রহ হতে পারে।

একসময়ে ধারণা ছিল, চাঁদের উপরিতলকে হাতেকলমে পরীক্ষা করার সুযোগ পাওয়া গেলে পৃথিবীর উদ্ভবের সঙ্গে তুলনা করে চাঁদের উদ্ভব সম্পর্কে ধারণা করা যাবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। অ্যাপোলো অভিযানে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা ছ'-ছ'বার পৃথিবীর মানুষকে চাঁদের মাটিতে নামিয়েছেন। চাঁদের উপরিতল থেকে প্রচুর শিলা পৃথিবীতে নিয়ে আসা হয়েছে। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা চাঁদের মাটিতে মানুষ নামাননি বটে, কিন্তু স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র নামিয়ে একই কাজ করেছেন—অর্থাৎ, চাঁদের শিলা নিয়ে এসেছেন পৃথিবীতে। এই সমস্ত শিলার কিছু তৈরি হয়েছে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভা জমাট বেঁধে। রাসায়নিক পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, শিলাগুলো জমাট বেঁধেছিল ৩৭০ কোটি বছর আগে।

চাঁদের মাটিও ভেঙে-পড়া শিলা, তার বয়স ৪৫০ কোটি বছর। অর্থাৎ, পৃথিবীর বয়স ও চাঁদের বয়স প্রায় সমান। কথাটা এইভাবেও বলা চলে—যে সময়ে পৃথিবীর জন্ম, সেই একই সময়ে চাঁদেরও জন্ম। শুধু পৃথিবী কেন, সৌরমণ্ডলের অন্য সব গ্রহ পৃথিবীরই বয়সী (অন্য গ্রহের নমুনা হিসেবে যেসব উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে এসে পড়েছে সেগুলো পরীক্ষা করে এই ধারণা হয়েছে)—অতএব, চাঁদ ও সৌরমণ্ডলকে সমবয়সী বলা চলে।

চাঁদের উপরিতল পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীদের আরো ধারণা হয়েছে, চাঁদের জন্মের পরে চাঁদের উপরিতলে প্রচণ্ডরকমের উল্কাপাত ও আগ্নেয়গিরির তৎপরতা চলছিল। তার সমস্ত চিহ্ন পরের তিনশো সাড়ে-তিনশো কোটি বছর ধরে বজায় আছে। চাঁদে ক্ষয় হওয়ার বা আবহিক বিকার ঘটার কোনো প্রক্রিয়া চলতে পারে না, কেননা চাঁদে জল-হাওয়া নেই। তাই চাঁদের উপরিতলে আমরা পাই সেই আদিম অবস্থার অবিকৃত একটি ছবি। পৃথিবীর অবস্থাও একসময়ে এমনি ছিল, ধরে নেওয়া চলে। কিন্তু তারপরে কয়েক-শো কোটি বছর ধরে পৃথিবী বদলেছে। তৈরি হয়েছে পৃথিবীর শিলা ও মাটি, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্র, এবং পৃথিবীর অতুলনীয় জীবমণ্ডল। পৃথিবী এখনো বদলাচ্ছে। আজকের দিনের পৃথিবীর চেহারাটিও কয়েক কোটি বছরের মধ্যে একেবারে অন্যরকম হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। যেমন, এখন যেখানে হিমালয় পর্বতমালা, মাত্র ছ'-কোটি বছর আগেও সেখানে ছিল বিশাল সমুদ্র। এমনি কত যে বদল ঘটেছে, ঘটতে চলেছে, তার কিছু খবর পরে আমরা নেব। কিন্তু আসল কথাটি এই যে পৃথিবীর উপরিতলের কোনো ছবি স্থায়ী নয়। কিন্তু আজ থেকে তিনশো-কোটি বছর আগে পৃথিবীর উপরিতলটি কেমন ছিল তার একটি অবিকল ছবি চাঁদের উপরিতলে পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা তাই মনে করেন, চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করে পৃথিবীর অতীত সম্পর্কে নিখুঁতভাবে জানা যাবে।

পৃথিবী থেকে চাঁদ এখন রয়েছে ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার দূরে। পৃথিবীর যে চৌহদ্দির মধ্যে আমাদের মাপজোক ও চলাফেরা সেখানে এই দূরত্বকে যথেষ্ট বেশি মনে হতে পারে, কিন্তু গ্রহতারার জগতে এই দূরত্ব অতি সামান্য। যেমন, পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ শুক্র, তারও দূরত্ব পৃথিবী থেকে ৪১৪ লক্ষ কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ১৪৯৬ লক্ষ কিলোমিটার বা ৮·৩ আলো-মিনিট। পৃথিবী থেকে সবচেয়ে কাছের তারা আল্‌ফা-প্রক্‌সিমার দূরত্ব ৪·৩ আলো-বছর। পৃথিবী থেকে শুকতারার দূরত্ব ৪০০ আলো-বছর। পৃথিবী থেকে অ্যাণ্ড্রোমিডা তারাজগতের দূরত্ব ২০ লক্ষ আলো-বছর। পৃথিবী থেকে চাঁদে আলো পৌঁছতে সময় লাগে মাত্র সোয়া-সেকেণ্ড। গ্রহতারার জগতে চাঁদ ও পৃথিবীকে বলা চলে প্রায় লাগালাগি দুই বস্তু।

প্রায় লাগালাগি নয়, গায়ে গায়ে লেগে থাকা পৃথিবী ও চাঁদ সম্পর্কে এমনি একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করেছিলেন বিজ্ঞানী জর্জ ডারউইন একটা অঙ্কের হিসেব থেকে। তিনি দেখিয়েছিলেন, ৫ কোটি ৭০ লক্ষ বছর আগে চাঁদ ছিল পৃথিবীর একেবারে পাশটিতে। তার মানে, প্রায় ছ-কোটি বছর ধরে মহাকাশে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী একটু একটু দূরে সরে গিয়েছে। একই সময়ে পৃথিবীর পাক খাওয়ার বেগও একটু একটু করে কমেছে। অধ্যাপক ডারউইন এই সমস্ত বিষয় ও আরো বহু বিষয় ব্যাখ্যা করে একটি বই লিখে গিয়েছেন। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত বইটির নাম 'সৌরমণ্ডলে জোয়ারভাঁটা ও সংশ্লিষ্ট ব্যাপার' (The Tides and Kindred Phenomena in the Solar System)।

জোয়ারভাঁটা এমন এক প্রাকৃতিক ব্যাপার যা অতি জটিল। এই ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িত শুধু চাঁদ নয়, শুধু সূর্য নয়, এমনকি পৃথিবীও। পৃথিবীর বহু দেশের বিজ্ঞানীরা জোয়ারভাটার সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করছেন। কেমব্রিজে জোয়ারভাঁটা

নিয়ে কাজ করেছেন স্যার হ্যারল্ড জেফ্রেস এবং তাঁর বিশ্ববিখ্যাত বই 'দি আর্থ' উৎসর্গ করেছেন 'আধুনিক সৃষ্টিরহস্যতত্ত্ব ও ভূ-পদার্থ-বিদ্যার জনক স্যার জর্জ ডারউইন-কে।'

জর্জ ডারউইনের হিসেব অনুযায়ী, গায়ে গায়ে লেগে থাকা পৃথিবী ও চাঁদের পাক খাওয়ার সময় ছিল চারঘণ্টা। এখনকার অনুসন্ধান থেকে ধারণা করতে হয়, চাঁদ যখন পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি ছিল তখন পৃথিবীর পাক খাওয়ার সময় ছিল পাঁচঘণ্টা। অর্থাৎ, প্রতি পাঁচঘণ্টায় একবার করে পৃথিবীর দিনরাত্রি হয়ে চলত।

এখন পৃথিবীর দিনরাত্রি হয় চব্বিশঘণ্টায়। এখন চাঁদ পৃথিবী থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। কেমন করে ঘটল এই ব্যাপারটি?

চাঁদের ওপরে যেমন পৃথিবীর টান আছে, তেমনি পৃথিবীর ওপরেও আছে চাঁদের টান। বিশ্বের প্রত্যেক দুই বস্তু পরস্পরকে টানে, নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্র* থেকে একথা আমরা জানি। অন্যদিকে পৃথিবীর ওপরে সূর্যের টান তো আছেই। একদিকে চাঁদের টান, অন্যদিকে সূর্যের টান, এই দুই টানে পৃথিবীর সমুদ্রে জোয়ার ওঠে। এই জোয়ার হয়ে থাকে দিনে দু-বার করে—দিন বলতে ২৪ ঘণ্টা ৫১ মিনিট। ৫১ মিনিট বেশি সময় লাগার কারণ এই: ভূপৃষ্ঠের কোনো একটি বিন্দু পুরো একটি পাক খেয়ে আগের

---

* নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্রটি এই: 'বিশ্বের যে কোনো দুইটি কণা উহাদের সংযোগী রেখায় পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ উভয়ের ভরের সমানুপাতিক এবং উভয়ের দূরত্বের বর্গের বিষমানুপাতিক।'

সংকেতে লেখা যায়, আকর্ষক বল

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

m_1 ও m_2 হচ্ছে দুই কণার ভর, r দুই কণার মধ্যেকার দূরত্ব, G-কে বলা হয় 'মহাকর্ষীয় নিত্যসংখ্যা'।

জায়গায় ফিরে আসে ঠিক ২৪ ঘণ্টা পরে। কিন্তু চাঁদ তো একজায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। পৃথিবী যেদিকে পাক খায় সেই একই দিকে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে ও নিজের চারদিকে পাক খায়—প্রতি ২৯'৫ দিনে একবার করে। সেই চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে চাঁদ খানিকটা সরে গিয়েছে। পৃথিবীর যে বিন্দুটি চাঁদের মুখোমুখি ছিল, চব্বিশঘণ্টায় পুরো এক পাক দেবার পরে আবার যখন একই জায়গায় ফিরে আসে, তখন কিন্তু চাঁদ সেখানে নেই। চাঁদকে ধরতে আরো ৫১ মিনিট সময় লাগছে। এই কারণে প্রতি ২৪ ঘণ্টা ৫১ মিনিটে পৃথিবীর সমুদ্রে দু-বার করে জোয়ার ওঠে। এ-থেকে আরো বোঝা যায় পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় কেন চাঁদ ওঠার সময় প্রতিদিন ৫১ মিনিট করে পিছিয়ে যেতে থাকে। আসলে জোয়ার হচ্ছে সমুদ্রের দুটি বিশাল ঢেউ, একটির চূড়ো থাকে চাঁদ যেখানে ঠিক মাথার ওপরে সেই বিন্দুতে বা সুবিন্দুতে, (zenith), অপরটির চূড়ো থাকে ঠিক তার বিপরীত দিকে বা কুবিন্দুতে (nadira)। তাদের তল থাকে যেখানে চাঁদ রয়েছে দিগন্তরেখায়। পৃথিবী যেমন তার অক্ষের চারদিকে পাক খেয়ে চলে তেমনি এই দুটি ঢেউয়ের চুড়ো বা দুটি জোয়ার পৃথিবীকে ঘিরে পাক খেয়ে চলে। তার মানে, পৃথিবীর পাক-খাওয়া পশ্চিম থেকে পুবে, জোয়ারের স্রোত পুব থেকে পশ্চিমে। পৃথিবীর যে-কোনো বিন্দুতে প্রতি ২৪ ঘণ্টা ৫১ মিনিটে দুটি করে জোয়ার পাওয়া যায়।

জোয়ারের উচ্চতা নানা রকমের হয়ে থাকে। খোলা সমুদ্রে পঞ্চাশ-ষাট সেন্টিমিটারের বেশি নয়, কিন্তু উপসাগরে বারো মিটারেরও বেশি। এ-ব্যাপারটা অনেকখানি নির্ভর করে চাঁদ তার কক্ষের ঠিক কোন্ জায়গায় রয়েছে তার ওপরে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে চাঁদ থাকে সূর্য ও পৃথিবীর সঙ্গে একই লাইনে। ফলে এই দুই দিনে জোয়ার হয় তেজী, যাকে বলা হয় তেজ কটাল (spring tides)। সপ্তমী তিথিতে (শুক্ল ও কৃষ্ণ দুই পক্ষেই) চাঁদ থাকে সূর্য ও পৃথিবীর

লাইনের সমকোণে। ফলে সূর্যের টান ও চাঁদের টান পরস্পরের বিরোধী হয়ে যায়। এই দুই দিনে জোয়ার হয় কমজোরী. যাকে বলা হয় মরা কটাল (neap tides)।
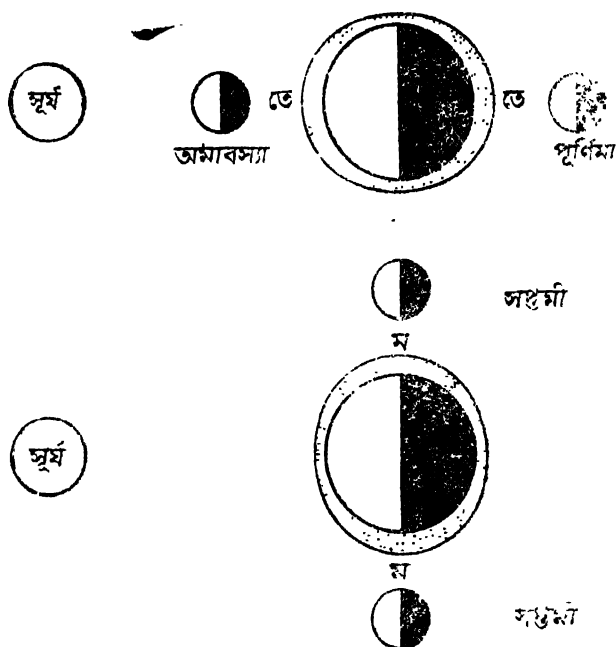
(ওপরে) তেজ কটাল। অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিন চাঁদ থাকে সূর্য ও পৃথিবীর সঙ্গে একই লাইনে। এই দুই দিনে জোয়ার হয় তেজী (তে)।
(নিচে) মরা কটাল। কৃষ্ণসপ্তমী ও শুক্লসপ্তমী তিথিতে চাঁদ থাকে সূর্য ও পৃথিবীর লাইনের সমকোণে। এই দুই দিনে জোয়ার হয় কমজোরী (ম)।

তাহলে দেখা গেল, জোয়ারের দুটি স্রোত সারা পৃথিবীকে পুব থেকে পশ্চিমে পাক দিয়ে চলেছে। কিন্তু পৃথিবীর উপরিতলের সবটাই তো আর সমুদ্র নয় যে জোয়ারের স্রোত অব্যাহত বয়ে চলবে। মহাদেশ আছে, সমুদ্রতলের অসমতা আছে, যাতে জোয়ারের স্রোত বাধা পায়। এই বাধা-পাওয়া জোয়ারের স্রোত কাজ করে ব্রেকের মতো। ব্রেক কষলে যেমন চাকার পাক খাওয়ার বেগ কমে, তেমনি এক্ষেত্রেও কমে পৃথিবীর পাক খাওয়ার বেগ।

তাই দেখা যাচ্ছে, পুরো একটি পাক শেষ করতে পৃথিবী এক সময়ে সময় নিত মাত্র পাঁচঘণ্টা, এখন নিচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা।

আর পৃথিবীর পাক খাওয়ার বেগ যদি কমে, চাঁদ তাহলে দূরে সরে যায়—এটা বলবিদ্যার নিয়ম। এমনিভাবে চাঁদ ক্রমশ দূরে সরে গিয়েছে—কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরত্ব থেকে প্রায় চারলক্ষ কিলোমিটারের দূরত্বে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রতি ১,২০,০০০ বছরে পৃথিবীর দিন এক-সেকেণ্ড হিসেবে বেড়ে যাচ্ছে। প্রতি বছরে চাঁদ তিন-সেন্টিমিটার হিসেবে দূরে সরে যাচ্ছে। সরতে সরতে এমন সময় আসবে যখন যতোটা সময় নিয়ে চাঁদ তার কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরবে, ঠিক ততোটা সময় নিয়েই পৃথিবী তার অক্ষের চারদিকে একবার পাক দেবে। অর্থাৎ চাঁদের মাস হয়ে উঠবে পৃথিবীর দিনের সমান। তখন চাঁদ হয়ে উঠবে পৃথিবীর এক বিশেষ এলাকার আকাশে স্থির জ্যোতিষ্ক।

পৃথিবীর পাক-খাওয়ার বেগ কমে যায় জোয়ারের জন্য তো বটেই, তাছাড়াও কারণ থাকতে পারে। যেমন, অন্য একটি কারণ হতে পারে বায়ুমণ্ডলের নড়াচড়া। গ্রীষ্মকালে সূর্য বায়ুমণ্ডলকে আরো বেশি উত্তপ্ত করে তোলে, শীতকালে আরো কম। ফলে বায়ুমণ্ডল কখনো হয় সম্প্রসারিত, কখনো সংকুচিত। এই ব্যাপারটাতেই থাকে বায়ুমণ্ডলের ব্রেক, যা পৃথিবীর পাক-খাওয়ার বেগকে কখনো-বা কমিয়ে দিতে পারে।

এমনি আরেকটি কারণ হতে পারে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র। ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে সূর্যে ঝলক উঠেছিল। আর তারপরেই বদলে গিয়েছিল পৃথিবীর পাক-খাওয়ার বেগ। এমনি ব্যাপার ঘটেছিল ১৯৫৬ সালের ফেব্রুআরি মাসেও। তার মানে, বলতে পারা যায়, সৌর কণিকার প্রবাহ পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে ধাবিত হলে সেই চৌম্বক ক্ষেত্র পৃথিবীর পাক-খাওয়ার বেগ কমিয়ে দিতে পারে।

এখনো পর্যন্ত, পৃথিবীর পাক-খাওয়ার বেগ কমছে, এটা নিশ্চিত ব্যাপার, কিন্তু তার কারণগুলো সম্পর্কে কিছুই নিশ্চিত নয়। নিশ্চিত-ভাবে বলার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই।

পৃথিবীর পাক-খাওয়ার বেগ যে কমেই চলেছে তার কিছু লক্ষণ ধরা যেতে পারে।

পৃথিবী একটি গোলক। এই গোলকটি এক সময়ে অনেক বেশি জোরে পাক খেত। ফলে গোলকের পেটের দিক ফুলে উঠেছে, মাথার দিক বা মেরুর দিক দেবে গিয়েছে। তারপরে পাক-খাওয়ার বেগ কমে চলেছে—তখন কী হতে পারে? ফুলে-ওঠা পেট চুপসোতে থাকবে, দেবে-যাওয়া মেরু বাড়তে থাকবে। সারা পৃথিবী জুড়ে তাই ঘটছে। আইসল্যাণ্ড, সুইডেন, কানাডা ইত্যাদি উত্তরের দেশগুলো উঁচু হয়ে উঠছে। কিন্তু আফ্রিকার বিষুবরেখায় ভূপৃষ্ঠ নেমে যাচ্ছে। আমেরিকার আমাজন নদীর প্রবাহ বিষুবরেখা বরাবর। এখানে ভূ-পৃষ্ঠ দেবে যাবার ফলে আমাজন হয়ে উঠেছে পৃথিবীর সবচেয়ে বিরাট নদী। তবে, এই যে কথাগুলো বলা হল, তাও এখনো পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলা চলে না। অনেক কিছু এখনো জানতে বাকি।

পৃথিবীর নানা বিষয়

চুম্বকত্ব

একটু আগে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের কথা বলেছি। তার মানে, এই পৃথিবী যেন একটি চুম্বক, সাধারণ চুম্বকলোহার মতো এই পৃথিবীরূপী চুম্বকেরও আছে দুটি মেরু—উত্তর ও দক্ষিণ। আর সাধারণ চুম্বক-লোহার বেলায় দুই মেরুর মধ্যে যেমন রয়েছে বলরেখা, পৃথিবীরূপী চুম্বকের বেলাতেও তাই। এই সমস্ত বলরেখার মধ্যেই পৃথিবীর

চৌম্বক ক্ষেত্র পাওয়া যায়। পৃথিবী যে একটা চুম্বক, এ-খবর নতুন কিছু নয়। হাজার কয়েক বছর আগেও মানুষের জানা ছিল যে কোনো কোনো লোহাপাথর (অয়স্কান্ত) সবসময়ে পৃথিবীর উপরিতলের একটি নির্দিষ্ট দিকে ফিরে থাকে।

আমরা জানি, পৃথিবীর দুটি ভৌগোলিক মেরু আছে—উত্তর ও দক্ষিণ। চৌম্বক মেরুদুটিও ভৌগোলিক মেরুদুটির কাছাকাছি। তবে ভৌগোলিক মেরুকে যেমন নির্দিষ্ট বিন্দুতে পাওয়া যায়, তার কোনো নড়চড় নেই, চৌম্বক মেরুর বেলায় তা নয়। চৌম্বক মেরু ঘুরেফিরে বেড়ায়, পাঁচশো বছরের হিসেব ধরলে মনে হতে পারে, চৌম্বক মেরু
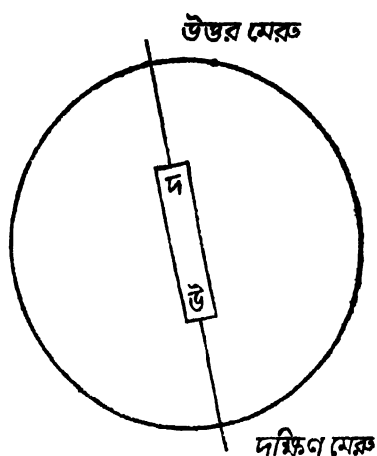
পৃথিবীর দণ্ড চুম্বক। যদি কল্পনা করা যায় যে পৃথিবীর ভিতরে এমনি একটি দণ্ড-চুম্বক রয়েছে তাহলে পৃথিবীর চুম্বকত্বের ব্যাপারগুলো একই রকম ঘটে থাকে।

ছোট ছোট বৃত্তে ঘুরছে। আরও বেশি সময়ের হিসেবে চৌম্বক মেরুর ঘোরাফেরা খুবই এলোমেলো মনে হয়। এমনকি এই মুহূর্তেও যদি চৌম্বক মেরুর সন্ধান করতে হয় তাহলে তার সঠিক হদিস পাবার জন্য বরফের রাজ্যে বেশ কিছুটা ছোটাছুটির প্রয়োজন হতে পারে।

আমরা জানি, কম্পাসের কাঁটা আসলে একটি চুম্বক। এই কাঁটা সবসময়েই পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর-দক্ষিণ বরাবর হয়ে থাকে।

কিন্তু একটি দণ্ড-চুম্বক যদি কম্পাসের কাঁটার সামনে আনা যায় তাহলে দেখা যাবে, দণ্ড-চুম্বকের দক্ষিণ মেরু কম্পাসের উত্তর মেরুকে আকর্ষণ করছে। এটা চুম্বকের সাধারণ ধর্ম। দুই বিপরীত চৌম্বক মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। দুই অনুরূপ চৌম্বক মেরু পরস্পরকে দূরে সরিয়ে দেয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবীরূপী চুম্বকের দক্ষিণমেরু রয়েছে পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তরমেরুর কাছে। নইলে কম্পাসের উত্তরমেরু পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তরমেরুর দিকে নির্দিষ্ট হত না।

যদি কল্পনা করা যায় পৃথিবীর ভিতরে একটি দণ্ড-চুম্বক রয়েছে তাহলেও ব্যাপারগুলো সব একই রকম ঘটত। এই দণ্ড-চুম্বকের দক্ষিণমেরু পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তরমেরুর দিকে, দণ্ড-চুম্বকের উত্তর-

পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর সাধারণ অবস্থা ও বিপরীত অবস্থা। পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর মেরু ও ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরু একই জায়গায় থেকে যাচ্ছে কিন্তু বদলে যাচ্ছে চৌম্বক মেরু।
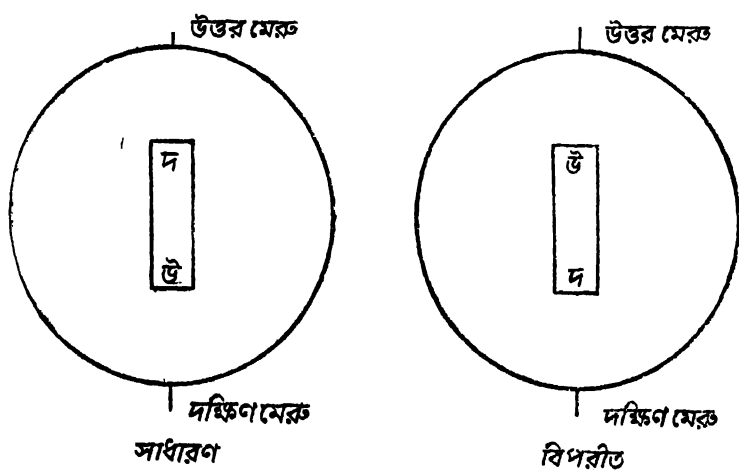
মেরু পৃথিবীর ভৌগোলিক দক্ষিণমেরুর দিকে। এটাই সাধারণ অবস্থা। কিন্তু কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে পৃথিবীর দুই চৌম্বক মেরু পাল্‌টে গিয়েছে—অর্থাৎ, উত্তর হয়ে গিয়েছে দক্ষিণ, দক্ষিণ হয়ে

গিয়েছে উত্তর। এই বিপরীত অবস্থা অবশ্য বজায় থাকে না, আবার সাধারণ অবস্থা ফিরে আসে।

একটি দণ্ড-চুম্বকের ওপরে কাগজ পেতে, সেই কাগজের ওপরে লোহার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে, কাগজের ওপরে আস্তে আস্তে টোকা মারলে দেখা যাবে, লোহার গুঁড়োগুলো বিশেষ একটি চেহারায় বিন্যস্ত হয়েছে। এমনটি যে হল তা চুম্বকটি থাকার ফলে। চুম্বকের

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র।

প্রভাব যতোদূর পর্যন্ত এমনিভাবে ছড়িয়ে পড়ছে সবটা নিয়ে বলা হয় চৌম্বক ক্ষেত্র। পৃথিবীর চুম্বকের এমনি চৌম্বক ক্ষেত্র রয়েছে। সেটি বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে বাইরের মহাকাশে বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো।

পৃথিবীর এই চুম্বকত্বের কারণ কী? বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, পৃথিবীর কেন্দ্রে আছে গলিত লোহা। পৃথিবীর পাক-খাওয়ার দরুণ তার মধ্যে এমন কিছু আন্দোলন ঘটে যার ফলে বৈদ্যুতিক প্রবাহ তৈরি হয়। আর তারই ফলে চুম্বকত্ব। ব্যাপার যা দাঁড়ায়, নলের আকারে পেঁচানো তারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের প্রবাহ চালালে যেমন সেই নলটি হয়ে ওঠে দণ্ড-চুম্বকের মতো, পৃথিবীর বেলাতেও তাই ঘটে। অর্থাৎ. পৃথিবীর ভিতরে যেন একটা দণ্ড-চুম্বক এসে গিয়েছে।

পৃথিবীর ভিতরেই যদি একটি দণ্ড-চুম্বক থেকে যায় তাহলে আরো ব্যাপার ঘটতে পারে। চুম্বকের প্রভাবে অ-চুম্বক লোহা চুম্বক হয়ে ওঠে। এমনিভাবে, পৃথিবীর খনিজে ও শিলায় যে লোহা আছে তাও হয়ে উঠতে পারে চুম্বক এবং বিশেষভাবে বিন্যস্ত হয়ে যায়। খনিজের ও শিলার এই লোহার চুম্বকত্ব খুবই দুর্বল, কিন্তু তার হদিস পাওয়া অসম্ভব নয়। তা থেকে জানা যায় খনিজটি বা শিলাটি যখন তৈরি হচ্ছিল সেই সময়ে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের অবস্থা। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে যে বদল ঘটেছে তা জানা গিয়েছে খনিজের বা শিলার চুম্বকত্ব থেকে। কেমনভাবে বদলেছে তার অনুশীলনকে বলা হয় পুরাচুম্বকত্ব (paleomagnetism)। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র যে প্রায়ই বদলে গিয়েছে—এ-খবর নিশ্চিতভাবে জানিয়েছে পুরাচুম্বকত্ব। অন্যদিকে, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র যে মাঝে মাঝে বিপরীত অবস্থায় চলে গিয়েছে তা থেকে পৃথিবী সম্পর্কে অন্য খবরও কিছু পাওয়া গিয়েছে—যেমন মহাদেশের সঞ্চরণ, সমুদ্রতলের সম্প্রসারণ, ইত্যাদি। এসব আলোচনায় আমরা পরে আসব।

চৌম্বক ব্যতিক্রম

যতোই অদলবদল ঘটুক, পৃথিবীর চৌম্বক মেরু যে দুটি এটা ধরে নেওয়া চলে। কিন্তু একদল সোভিয়েত গবেষকের অনুসন্ধান থেকে এমন ধারণা হওয়ার কারণ ঘটল যে পৃথিবীর যেন একটি তৃতীয় চৌম্বক মেরু থেকে গিয়েছে। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। তাঁরা অনুসন্ধান চালাচ্ছিলেন উত্তরমেরুর মহাসাগরের পুবদিকে। সেখানে তাঁরা দেখলেন, কম্পাসের কাঁটা কিছুতেই পৃথিবীর পুরনো চৌম্বক মেরুর দিকে সরছে না, নতুন আরেকটি দিকে ফিরে থাকছে। তাহলে কি পৃথিবীর আরো একটি মেরু আছে?

পরে ভালো করে অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করা গেল যে মেরুসাগরের নিচে রয়েছে বিশাল এক পর্বত। নাম দেওয়া হল

লোমোনোসভ শিখর। এই শিখরেরই চৌম্বক শিলা কম্পাসের কাঁটাকে আকর্ষণ করে বেচাল করে দেয়।

কম্পাসের কাঁটাকে বেচাল করে দেয় এমনি এলাকা আরো আছে। এগুলোকে বলা হয় চৌম্বক ব্যতিক্রম (magnetic anomaly)।

ভ্যান অ্যালেন বলয়

সূর্য থেকে যে শক্তি নিঃসৃত হচ্ছে তার কিছু অংশ পৃথিবীর কাছে এসে পৌছয়। তারও কিছু অংশ বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীর উপরিতলে পৌঁছে যায়। এই অংশকে আমরা বলি রৌদ্র। সূর্যে যখন আলোড়ন ওঠে তখন বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকা (প্রোটোন ও ইলেকট্রন) সূর্য থেকে নিক্ষিপ্ত হয়। এরই নাম 'সৌর বায়ু' (solar wind)। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে এই সৌর বায়ু আটক পড়ে। তার ফলে পৃথিবীকে ঘিরে একটি তীব্র বিকিরণের এলাকা তৈরি হয়ে যায়।

পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহের মারফৎ পাওয়া তথ্য থেকে ১৯৫৮ সালে প্রথম জানা যায়, পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে তীব্র বিকিরণের এলাকা। আমেরিকান উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-১ প্রথম এই খবরটি জানায়। অনুসন্ধানী দলের নেতা ছিলেন জেমস ভ্যান অ্যালেন —তাঁরই নামে এই এলাকার নামকরণ হয় ভ্যান অ্যালেন বলয় (Van Allen Belt)।

তার মানে, বলা যেতে পারে, পৃথিবী রয়েছে একটা ঘেরাটোপের মধ্যে। সৌর বায়ুর কণিকাগুলো পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে আটক হয়ে এই ঘেরাটোপ তৈরি। পৃথিবী যদি একটা চুম্বক হয় তাহলে তার বলরেখাগুলো মেরু থেকে মেরু পর্যন্ত বৃত্তচাপের মতো আকার নিয়ে থাকে। ফলে পৃথিবীর বিষুবরেখার ওপরে এই বলরেখার উচ্চতা হয় সবচেয়ে বেশি। বলরেখা বরাবর ছড়ানো পৃথিবীর

ঘেরাটোপটিও সবচেয়ে উঁচু ও সবচেয়ে বিস্তৃত পৃথিবীর বিষুবরেখার ওপরে। আর মেরুর দিকে এই ঘেরাটোপ সরু হয়ে বায়ুমণ্ডলে নেমে এসেছে। মোটামুটি বলা হয়, বিষুবরেখার ওপরে ঘেরাটোপটির শুরু কয়েক-শো কিলোমিটার উঁচু থেকে, আর মহাকাশে তার বিস্তার ৬০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত। গোড়ার দিকে ধারণা হয়েছিল দুটি পৃথক বলয় রয়েছে এবং দুটির মধ্যে খানিকটা ফাঁক রয়েছে। কিন্তু এখন ধারণা করা হয় বলয় আছে একটিই এবং তার অবস্থান ও তার মধ্যে কণিকাদের ভিড় সময়ের সঙ্গে বদলায়।

ব্যাপারটা তো এই যে তড়িতাবিষ্ট কণিকাগুলো পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে আটক পড়েছে। এই অবস্থায় কণিকাগুলো চৌম্বক বলরেখা বরাবর মেরু থেকে মেরু পর্যন্ত ছুটোছুটি করে থাকে।

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র থাকার দরুন সৌর বায়ুর কণিকাগুলো পৃথিবীর ওপরে আছড়ে পড়ার আগেই বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে আটক পড়ে। আবার এই বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে—প্রায় ১৬০ কিলোমিটার ওপরে—আছে আয়নিত * কণিকা যা বিদ্যুৎ-পরিবাহী। বায়ুমণ্ডলের এই স্তর থেকেই রেডিও-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। অন্যদিকে সূর্য থেকে যে বিকিরণ এসে পৌঁছয় তার সঙ্গে এইসব আয়নিত কণিকার নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটে।

---

* পরমাণুর মধ্যে আছে কেন্দ্রীয় এলাকায় একটি পজিটিভ তড়িতাবিষ্ট নিউক্লিয়াস আর তাকে ঘিরে আছে (সূর্যকে ঘিরে থাকা গ্রহের মতো, অর্থাৎ কক্ষপথে আবর্তনশীল) এক বা একাধিক নেগেটিভ তড়িতাবিষ্ট ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াসের মধ্যে আছে পজিটিভ তড়িতাবিষ্ট প্রোটোন ও বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রন। প্রোটোনের চার্জ ও ইলেকট্রনের চার্জ সমান মাত্রার। সাধারণ অবস্থায় পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের সংখ্যা ও প্রোটোনের সংখ্যা সমান। অতএব সাধারণ অবস্থায় পরমাণুটি হয়ে থাকে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। এখন, এমন অবস্থা যদি কখনো ঘটে যে পরমাণুর মধ্যে সাধারণ অবস্থায় যতো সংখ্যক ইলেকট্রন থাকা উচিত তার চেয়ে কম সংখ্যায় আছে তাহলে পরমাণুটি হয়ে ওঠে পজিটিভ তড়িতাবিষ্ট। যদি যতো সংখ্যক ইলেকট্রন থাকা উচিত তার

উত্তর ও দক্ষিণ, উভয় মেরুদেশের আকাশে কখনো কখনো লাল বা সবুজ বা নীল আলোর উজ্জ্বল শিখা ফুটে ওঠে। এটা বিশেষ করে লক্ষ করা যায় সৌর তৎপরতা চলার সময়ে। ১৯৫৭-৫৮ সালে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বর্ষে মেরুজ্যোতি নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, মেরুজ্যোতি ঘটে থাকে পৃথিবীর উপরিতল থেকে ১০০-১৫০ কিলোমিটার ওপরে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর স্তরে। নিওন সাইন-বোর্ডের লাল আলো যে-কারণে জ্বলে—অতি পাতলা গ্যাসের মধ্যে পরমাণুর উত্তেজনার ফলে—প্রায় সেই একই কারণে মেরুজ্যোতির আলো জ্বলে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, বায়ুমণ্ডলের উচ্চতর স্তরে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণুর উত্তেজনা ঘটে সূর্য থেকে আসা তড়িতাবিষ্ট হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ হওয়ার ফলে। তড়িতাবিষ্ট এই কণিকাগুলো সম্ভবত ভ্যান অ্যালেন বলয় থেকে উপচে বেরিয়ে এসেছে। এমনটি ঘটতে পারে যদি সূর্য থেকে নিঃসরণ অতি জোরালো হয় এবং তার ফলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে বিকৃতি আসে। তড়িতাবিষ্ট কণিকার পথে তখন আর জোরালো চৌম্বক ক্ষেত্রের বাধা থাকে

চেয়ে বেশি সংখ্যায় থাকে তাহলে পরমাণুটি হয়ে ওঠে নেগেটিভ তড়িতাবিষ্ট। এই উভয় অবস্থাই পরমাণুর আয়নিত অবস্থা। যেমন, হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে আছে একটি প্রোটোন ও একটি ইলেকট্রন। ইলেকট্রনটি যদি না থাকে তাহলে থাকে শুধু প্রোটোন। এই প্রোটোনকে বলা হয় হাইড্রোজেন আয়ন। আল্‌ফা-কণিকাকে (দুটি প্রোটোন ও দুটি নিউট্রন নিয়ে গঠিত হিলিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস) বলা হয় হিলিয়াম আয়ন। গ্যাসের মধ্যে আয়ন তৈরি হতে পারে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের দ্বারা কিংবা এক্স-রশ্মি বা গামা-রশ্মি বা অতি-বেগুনী বিকিরণের প্রবাহের দ্বারা। দ্রবণের মধ্যে আয়ন তৈরি হয়ে থাকে দ্রবীভূত পদার্থের আয়নভবনের ফলে। বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরেও আয়ন তৈরি হওয়ার অবস্থা রয়েছে এবং আয়নিত কণিকা পাওয়া যায়।

না এবং সেটি বায়ুমণ্ডলের মধ্যে নেমে আসতে পারে। আর তখনই মেরুজ্যোতি প্রকাশ পায়। একটি তুলনা দিয়ে বললে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়। বিকিরণ-বলয় যেন একটি গ্যাস-ভর্তি থলে। প্রচণ্ড তোড়ে এই থলে ভর্তি করে তুলছে সৌর বায়ু। কখনো কখনো ভর্তি হয়ে উপচে পড়ে। তখনই তৈরি হয়ে যায় মেরুজ্যোতি।

মহাজাগতিক রশ্মি

বাইরের মহাকাশ থেকে পৃথিবীর ওপরে এসে পড়ছে অতি জোরালো বিকিরণ, যার প্রায় সবটাই তড়িতাবিষ্ট কণিকা—তারই নাম মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic ray)।

মহাজাগতিক রশ্মি প্রথম আবিষ্কৃত হয় একশো বছরেরও আগে। বিজ্ঞানীরা সে-সময়ে ধরতে পেরেছিলেন যে বাতাস সামান্য মাত্রায় বিদ্যুৎ-পরিবাহী। তখন ধরে নেওয়া হল যে বাতাস অংশত আয়নিত। পরবর্তী কালে বাতাসে বেলুন উঠিয়ে টের পাওয়া গেল, যতো ওপরে ওঠা যায় বিকিরণের মাত্রা ততো বাড়ে। তার মানে, বিকিরণের কারণ রয়েছে পৃথিবীর বাইরে। তখন নাম দেওয়া হল মহাজাগতিক রশ্মি।

একালের গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, মহাজাগতিক রশ্মির ধ্যে আছে প্রোটোন (হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস), আল্‌ফা-কণিকা হিলিয়াম নিউক্লিয়াস) ও তৎসহ কিছু ভারী মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস। সবই নিউক্লিয়াস, কক্ষ-পরিক্রমারত ইলেকট্রনগুলো চলে গিয়েছে।

এই প্রাথমিক কণিকাগুলো যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওপরে াছড়ে পড়ে তখন তাদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ বাধে বাতাসের অক্‌সিজেন, াইট্রোজেন, কার্বন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে। ফলে রমাণুগুলো চূর্ণ হয়ে যায় এবং নানাপ্রকারের পারমাণবিক ক্রিয়া । তৈরি হয় প্রচুর সংখ্যক ইলেকট্রন ও সঞ্জাত (secondary)

মহাজাগতিক বিকিরণ। এই সঞ্জাত বিকিরণই ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌঁছয়।

মহাজাগতিক রশ্মির উৎস অনেক। এই ছায়াপথে গোড়া থেকেই কিছু বিকিরণ থেকে গিয়েছে, সেটা একটা উৎস। এই ছায়াপথে কোনো কোনো তারার বিস্ফোরণ ঘটে, তখন তাকে বলে সুপারনোভা, সেটাও উৎস। এই ছায়াপথে আছে পালসেটিং রেডিও সোর্স বা পালসার, যা থেকে দমকে দমকে রেডিও-বিকিরণ ঘটে—সেটাও উৎস। এই ছায়াপথে আছে কোয়াসি-স্টেলার রেডিও সোর্স বা কোয়াসার, যা থেকে অতি বিরাট শক্তি নিঃসৃত হচ্ছে—সেটাও উৎস। সবশেষে আছে সূর্য—সেটাও উৎস, বিশেষ করে সূর্যে যখন ঝলক ওঠে সেই সময়ে, সূর্যে যখন কলঙ্ক দেখা দেয় সেই সময়ে।

পৃথিবীর বাইরের দিকের এলাকা

পৃথিবীর বাইরের দিককে কয়েকটি এলাকায় ভাগ করা চলে। পদার্থের অবস্থা বিচার করে যদি ভাগ করতে হয় তাহলে তিনটি অংশ তো এসেই পড়ে—কঠিন, জলীয়, গ্যাসীয়। পৃথিবীর কঠিন অংশকে বলা হয় শিলামণ্ডল (lithosphere)। জলীয় অংশকে বলা হয় বারিমণ্ডল (hydrosphere)। আর গ্যাসীয় অংশকে বলা হয় বায়ুমণ্ডল (atmosphere)। আবার এই তিনটি মণ্ডল আছে বলেই আরো একটি মণ্ডলের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে—তাকে বলা হয় জীবমণ্ডল (biosphere)। আক্ষরিক অর্থেই এটি হচ্ছে প্রাণের মণ্ডল, এটি গড়ে তুলেছে পৃথিবীর তাবৎ জীবন্ত উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং এটি রয়েছে—শিলামণ্ডল, বারিমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল—এই তিনটি মণ্ডল জুড়ে।

পৃথিবীর গঠনে ও পৃথিবীর ওপরে ক্রিয়াশীল নানা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় এই মণ্ডলগুলোর বড়ো রকমের ভূমিকা আছে।

এমনিতে আমাদের মনে হতে পারে, পৃথিবীতে কোনো পরিবর্তন নেই। পৃথিবীকে আমরা মনে করি অনড় ও অটল, কঠিনও বটে। পৃথিবী আমাদের কাছে দৃঢ়তা ও স্থিরতার প্রতীক, চিরকালীন ও চিরন্তন। আসলে কিন্তু পৃথিবী কোনোটাই নয়। আমরা চোখের সামনেই দেখি, পৃথিবীতে প্রায়ই ঘটে চলেছে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ধস নামা। তার ফলে পৃথিবীর চেহারায় কতই না অদলবদল ঘটে চলেছে। তাছাড়া, পৃথিবীর এই মহাদেশগুলো পর্যন্ত একজায়গায় স্থির থাকেনি—চোখে না দেখলেও এই ঘটনার প্রমাণ আছে। এই পৃথিবী বড়োই অস্থির। আবার, এইসব বড়ো মাপের নড়াচড়ার পাশেই ঘটে চলেছে ছোট মাপের কিন্তু অমোঘ কিছু পরিবর্তন—যেমন, সমুদ্রের তলদেশে একটু একটু করে পলি জমা, পর্বতগুলো একটু একটু করে ক্ষয়ে যাওয়া, নিষ্ফলা পাথর একটু একটু করে ভেঙে উর্বর জমি হয়ে ওঠা। অন্যদিক থেকে দেখলে মনে হতে পারে, পৃথিবীতে যে এতসব কাণ্ডকারখানা চলে তাতে এই পৃথিবী মানুষের বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।

শিলামণ্ডল

আমরা দাঁড়িয়ে আছি মাটির ওপরে। এই মাটিতে আমরা খাদ্য ফলাই। এই মাটি থেকে সংগ্রহ করি নানা খনিজ। আমরা যে বেঁচে আছি, আমাদের শরীর গড়ে তুলছি, তা এই মাটির দৌলতে। তাই মনে হতে পারে, মাটি আমাদের খুবই চেনা। কথাটা কিন্তু ঠিক নয়। আমরা অনেকেই জানি না যে-সব শিলা ও খনিজকে আমরা মাটি বলি সেগুলো কী।

পৃথিবীর কঠিন উপরিতলের ওপরের অংশকে আমরা বলি মাটি। এই মাটি সব জায়গায় একরকম নয়। মরুভূমিতে মাটি বলতে পাই আলগা বালি, পর্বতের চুড়োয় গ্র্যানিট পাথর, কুমেরুতে হিমবাহের বরফ। এই যে মাটির চেহারায় চোখে পড়ার মতো তফাত এসে

যাচ্ছে—সেটা কেন? যে-কোনো এলাকা সম্পর্কে বলা চলে, কতকগুলো উপকরণে সেখানকার উপরিতল তৈরি। কোত্থেকে আসে এই উপকরণগুলো? আসে সেখানে যে-সব শিলা বাইরে বেরিয়ে পড়েছে তা থেকে। কোত্থেকে আসে এই শিলাগুলো? আসে সেখানে যে-সব ভূতত্ত্বীয় প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে তা থেকে।

তাই যদি হয় তাহলে এমন হওয়াই স্বাভাবিক যে সবজায়গার শিলা একরকম নয়, পাশাপাশি জায়গার শিলার মধ্যেও ভিন্নতা ঘটে যেতে পারে। কথাটা ঠিক। তাহলে ভূতত্ত্বীয় প্রক্রিয়াই বা একরকম হতে যাবে কেন। তাও হয় না। তাহলে আমরা বলতে পারি, কোনো একটি জায়গায় যে ভূতত্ত্বীয় প্রক্রিয়া ঘটে, তার দরুন স্থানীয় শিলায় যে অদলবদল হয়—তারই মোট ফল সেখানকার মাটির বিশেষ চেহারা। যেমন. মরুভূমিতে বালি, পর্বতচুড়োয় পাথর, মেরুদেশে বরফ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মাটি সম্পর্কে জানতে হলে সবচেয়ে জরুরী জানার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় শিলা। পৃথিবীর উপরিতলের কঠিন অংশ এই শিলায় তৈরি। তাই পৃথিবীর এই কঠিন অংশকে বলা হয় শিলামণ্ডল (lithosphere)। আগে বলা হত ভূত্বক (earth's crust), যখন ধারণা ছিল পৃথিবীর ভিতরটা রয়েছে গলিত অবস্থায়, শুধু বাইরের দিকের আস্তরণটি বা ত্বকটি কঠিন। গরম দুধে সর পড়ার মতো গলিত উত্তপ্ত ভূ-গোলকের ওপরের দিকে এই ত্বক।

তাহলে আমরা বলতে পারি, পৃথিবীর উপরিভাগের কঠিন অংশ তৈরি হয় শিলায়।

কিন্তু শিলা তৈরি হয় কিসে?

শিলা তৈরি হয় খনিজে।

খনি থেকে যা পাওয়া যায় তাই খনিজ (mineral)। যেমন, আকর-পিণ্ড, যা থেকে ধাতু বার করা হয়। মাটি থেকে বেরিয়ে আসা জলও অনেক জায়গায় "খনিজ" জল নামে পরিচিত। যেমন,

বক্রেশ্বরের জল। এই খনিজ জল নাকি স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। পশ্চিমবাংলার সরকার বক্রেশ্বরের জল বোতলে ভরে বিক্রি করে থাকেন। আবার কিছু কিছু খনিজ পাওয়া যায় ওষুধ হিসেবে। রোজ যাঁরা ভিটামিন বড়ি খান তাঁরা চিকিৎসকের পরামর্শে সেইসঙ্গে কিছু "খনিজও" খেয়ে থাকেন।

ভূ-বিজ্ঞানী যে খনিজের কথা বলেন তা আরও মূলগত জিনিস। এমন এক জিনিস যা থেকে শিলা তৈরি হয়। ভূ-বিজ্ঞানী অবশ্যই আকর-পিণ্ডকেও খনিজ বলে স্বীকার করে থাকেন।

খনিজ আছে বহু প্রকারের, তাদের চরিত্র ও গুণাবলীও আলাদা আলাদা। এই সমস্ত কিছুকে সাজিয়ে গুছিয়ে মস্ত এক সারণির আকারে উপস্থিত করা যেতে পারে। কিন্তু এই বইয়ে তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু একটুখানি আলোচনা করে নিই কেন এই খনিজগুলো চরিত্রে ও গুণাবলীতে আলাদা হয়ে থাকে।

বস্তু গঠিত হয় ক্ষুদ্রতম যে কণিকা দিয়ে তার নাম পরমাণু। এইসব কণিকার প্রত্যেকটির আছে নিজস্ব রাসায়নিক গড়ন ও ভৌতিক গুণাবলী। ব্যাপারটাকে বোঝাবার জন্যে প্রত্যেক প্রকারের পরমাণুকে বিভিন্ন প্রজাতির জীবের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। প্রত্যেক প্রজাতির জীবের যেমন আছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ—যা দিয়ে বাঘ থেকে সিংহকে বা সিংহ থেকে কুকুরকে আলাদা করে চেনা যায়—তেমনি প্রত্যেক প্রকারের পরমাণুরও আছে বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ। এই লক্ষণের বিচারেই এক-একপ্রকারের পরমাণুর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে এক-একটি মৌলিক পদার্থের। যেমন, তামা তৈরি হয় তামার পরমাণু দিয়ে। সীসে তৈরি হয় সীসের পরমাণু দিয়ে।

আমাদের এই গ্রহ তৈরি হয়েছে এমনি কতকগুলো মৌলিক পদার্থ দিয়ে। এই পৃথিবীতে যেখানে যতো কঠিন পদার্থ আছে, যেখানে যতো তরল পদার্থ, যেখানে যতো গ্যাসীয় পদার্থ, যেখানে যতো উদ্ভিদ. যেখানে যতো প্রাণী—সবকিছুর মধ্যে পাওয়া যায়

নব্বইটি স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থের সুনির্দিষ্ট জোট। পৃথিবীতে এই নব্বইটি স্বাভাবিক মৌলিক পদার্থ ছাড়াও আছে আরও প্রায় পনেরোটি মানুষের তৈরি মৌলিক পদার্থ।

মৌলিক পদার্থের সংখ্যা এতগুলো হওয়া সত্ত্বেও ভূত্বকে কিন্তু সবগুলোকে সমানভাবে পাওয়া যায় না। এটা বিশেষভাবে জানার বিষয়। ভূত্বকের চারভাগের তিনভাগ (সঠিকভাবে বলতে হলে ৭৪.৩ শতাংশ) গড়ে উঠেছে দুটি মাত্র মৌলিক পদার্থ দিয়ে— অক্‌সিজেন ও সিলিকন। নিচে একটি হিসেব দেওয়া হল। এ থেকে দেখা যাবে, এই দুটি মৌলিক পদার্থ ও সেইসঙ্গে আরো ছ'টিকে ধরলে ভূত্বকের প্রায় ৯৮.৬ শতাংশের হিসেব পাওয়া যাচ্ছে।

ভূত্বকের রাসায়নিক গঠন

মৌলিক পদার্থ	শতাংশ ওজনে	শতাংশ আয়তনে
অক্‌সিজেন	৪৬.৬০	৯৩.৮
সিলিকন	২৭.৭২	০.৯
অ্যালুমিনিয়াম	৮.১৩	০.৫
লোহা	৫.০০	০.৪
ক্যালসিয়াম	৩.৬৩	১.০
সোডিয়াম	২.৮৩	১.৩
পটাসিয়াম	২.৫৯	১.৮
ম্যাগ্‌নেসিয়াম	২.০৯	০.৩
অন্যান্য	১.৪১	—
মোট	১০০.০০	১০০.০

ওপরের হিসেবে সবচেয়ে অবাক করে অক্‌সিজেন। নামটি আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। বেঁচে থাকার জন্য আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে অক্‌সিজেন গ্যাস টেনে নিই, রোগীর শ্বাসকষ্ট হতে থাকলে

সিলিণ্ডারে ভরা অক্সিজেন নলের সাহায্যে তার নাকের সামনে ধরি। অথচ বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন যে খুব বেশি পরিমাণে আছে তা কিন্তু নয়। আয়তনের দিক থেকে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন আছে ৭৮ শতাংশ আর অক্সিজেন মাত্র ২১ শতাংশ, বাদবাকি অন্যান্য গ্যাস। অথচ দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর কঠিন অংশে এই অক্সিজেন রয়েছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে। আয়তনের দিক থেকে ভূত্বকের ৯৩·৮ শতাংশই অক্সিজেন।

তাহলে আমরা যদি বলি ভূত্বকের কাঠামোটি হচ্ছে অক্সিজেন পরমাণুর—ঠিকই বলা হয়। কাঠামোর প্রায় সবখানি জুড়েই রয়েছে অক্সিজেন, মাঝেমধ্যে ফাঁকেফোকরে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের কিছু কিছু পরমাণু বসিয়ে দেওয়া হয়েছে মাত্র।

ওপরে যে আটটি মৌলিক পদার্থের হিসেব দেওয়া হয়েছে সেগুলো বাদ দিলে অন্য সমস্ত মৌলিক পদার্থের পরিমাণ ওজনের দিক থেকে ভূত্বকের মাত্র ১·৪১ শতাংশ। অর্থাৎ, প্রায় না-থাকার মতো। তামা, সীসে ইত্যাদি মৌলিক পদার্থকে আমরা খুব একটা বিরল বলে মনে করি না, কেননা চোখের সামনে যথেষ্টই দেখি। শুনলে অবাক হতে হবে, ভূত্বকে সীসের পরিমাণ মাত্র ০·০০১৫ শতাংশ, তামার পরিমাণ মাত্র ০·০০৪৫ শতাংশ। আর সোনা অবশ্যই বিরল, তার পরিমাণ ০·০০০০০৭ শতাংশ।

মৌলিক পদার্থগুলোর মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ নিশ্চয়ই ঘটতে পারে। তখন তৈরি হয় যৌগ পদার্থ। মৌলিক পদার্থগুলো অবশ্য একা একাও থাকতে পারে। যেমন, বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন, এই দুটি মৌলিক পদার্থকে পাওয়া যাচ্ছে আলাদা আলাদা মৌলিক পদার্থ হিসেবেই—রাসায়নিক সংযুক্ত অবস্থায় নয়। রাসায়নিক সংযোগ যদি ঘটত তাহলে পাওয়া যেত একটি যৌগ পদার্থ—যেমন, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, এটি একটি দুর্গন্ধযুক্ত গাঢ় বাদামী গ্যাস। খনিজ হচ্ছে একটি যৌগ পদার্থ, কয়েকটি মৌলিক

পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটার ফলে তৈরি। যেমন, আমরা যাকে নুন বলি, নুন বা লবণ, রান্নায় দিই ও পাতে খাই, সেটি একটি খনিজ। সোডিয়াম ও ক্লোরিন—এই দুটি মৌলিক পদার্থের সমান ভাগে রাসায়নিক সংযুক্তি হয়ে এই খনিজটি তৈরি। এটিকে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা বলেন সোডিয়াম ক্লোরাইড, খনিজ বিজ্ঞানীরা বলেন হেলাইট (halite), আমরা বলি নুন বা লবণ।

এমন খনিজও থাকতে পারে যা একটিমাত্র মৌলিক পদার্থে তৈরি। যেমন, হীরক। যেমন, গন্ধক। যেমন, সোনা। প্রকৃতি-জগতে এই খনিজগুলোকে মৌলিক অবস্থাতেই পাওয়া যায়। তাই বলে সমস্ত মৌলিক পদার্থ ও সমস্ত যৌগ পদার্থকেই কি খনিজ বলা চলে? কখনোই নয়। খনিজ হতে হলে কতকগুলো শর্ত পূরণ হওয়া চাই। যেমন, খনিজ থাকে প্রকৃতিজগতে স্বাভাবিক অবস্থায়—খনিজ কখনো কৃত্রিম উপায়ে মানুষের হাতে তৈরি হয় না। যে-কারণে প্লাস্টিক কখনো খনিজ নয়। তাছাড়া, খনিজের আছে নির্দিষ্ট একটি রাসায়নিক গড়ন, আলাদা আলাদা করে ধরা যায় এমনি কতকগুলো ভৌতিক বৈশিষ্ট্য। খনিজ হবে অজৈব, অর্থাৎ জীবন্ত কোনো কিছুর অংশ হয়ে থাকতে পারে না, এবং থাকেনি।

খনিজ হতে হলে এত কড়াক্কড়ি, তবুও কিন্তু খনিজের সংখ্যা কম নয়। এখনো পর্যন্ত দু-হাজারেরও বেশি খনিজ পাওয়া গিয়েছে। প্রত্যেকটির আছে আলাদা নাম, আলাদা বিবরণ। এমনকি ভৌতিক বৈশিষ্ট্যেও তারা আলাদা—চোখের দেখায়, হাতের ছোঁয়ায়, নাকের গন্ধে, জিভের স্বাদে আলাদা করে চেনা যায় তাদের। যেমন, হীরক চোখের দেখায় ঝকঝকে, হাতের ছোঁয়ায় কঠিন। হেলাইট জিভের স্বাদে নোনতা। এমনি আর কি। তবে খনিজকে চেনার এগুলোই মোক্ষম উপায় নয়। আরো তলিয়ে দেখতে হয়।

দেখা দরকার খনিজের দানা-বাঁধার ধরন, বা, বিজ্ঞানের ভাষায়, তার কেলাসের (crystal) আকার, তার কাঠিন্য, তার আপেক্ষিক

গুরুত্ব (specific gravity) *। কেলাসের আকার চোখে দেখা যায়, তার কাঠিন্য নখ দিয়ে আঁচড়িয়ে টের পাওয়া যায়, তার আপেক্ষিক গুরুত্ব ওজন নিয়ে নির্ধারণ করা যায়। এসবই ঠিক, কিন্তু তবুও এগুলো সবই বাইরের ব্যাপার। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই বাইরের ব্যাপারগুলো যে এমনটি হতে পেরেছে তার মূলে রয়েছে খনিজের ভিতরকার গড়ন। তার মানে, দেখা দরকার, কোন্ কোন্ পরমাণু্ রয়েছে খনিজের ভিতরে, কী অনুপাতে, কেমন বিন্যাসে।

তাহলে আসল ব্যাপার হচ্ছে খনিজের রাসায়নিক গড়ন। সেটা জানতে হলে জানা চাই কী কী পরমাণু্ দিয়ে খনিজটি গঠিত। দেখা গিয়েছে, খনিজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় অক্‌সিজেন ও সিলিকন। যেহেতু এই খনিজই শিলা গঠন করে, তাই ভূত্বকের বেশির ভাগ শিলাতেই রয়েছে অক্‌সিজেন ও সিলিকন সমন্বিত শিলা। এদের বলা হয় সিলিকেট। প্রায় তেরটি সিলিকেটে ভূত্বকের বেশির ভাগ গঠিত।

আমরা বলেছি, খনিজ দিয়ে শিলা তৈরি হয়। কাজেই শিলার মধ্যে খনিজ থাকবেই থাকবে। এমন শিলাও আছে যাতে খনিজ মাত্র একটি—যেমন, লবণ শিলা। তবে বেশির ভাগ শিলাতেই খনিজের সংখ্যা একাধিক। যেমন, গ্র্যানিট। এই শিলাটিতে বেশি মাত্রায় আছে দুটি খনিজ, অল্প মাত্রায় আরো দুটি বা তারও বেশি।

* আপেক্ষিক গুরুত্ব বা আপেক্ষিক ঘনত্ব হচ্ছে, সোজা ভাষায়, জলের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে ঘনত্বের কম বেশি হওয়ার একটা মাপ। সংজ্ঞাটি এই : বিবেচনাধীন তাপমাত্রায় কোনো একটি পদার্থের ঘনত্ব আর সর্বাধিক ঘনত্বের তাপমাত্রায় (৪° সেন্টিগ্রেড) জলের ঘনত্ব—এই দুয়ের অনুপাতকে বলা হয় সেই পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব। যেমন, জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১, গ্র্যানিট পাথরের ২·৬, সীসের ১১·৩, সোনার ১৯·৩, ইত্যাদি।

খনিজ ছাড়া শিলা হয় না, খনিজের সংখ্যা কম-বেশি অবশ্যই হতে পারে।

শিলা মানেই আঁটো করে ধরে রাখা এক বা একাধিক খনিজ। তাই শিলার চেহারা ও তার ভৌতিক গুণাবলী কেমন হবে তা নির্ভর করে শিলার ভিতরকার খনিজের প্রকার, আকার ও পরিমাণের ওপরে, শিলার মধ্যে কেমনভাবে খনিজগুলো ধরা আছে তার ওপরে। শিলার পরিচয় পেতে হলে শিলার এই খনিজগত গঠন অবশ্যই জানা দরকার।

ভূত্বকে এখনো পর্যন্ত খনিজের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে দু-হাজারেরও বেশি। খনিজ থেকেই শিলার পরিচয়। তবুও কিন্তু খনিজের ভিত্তিতে শিলার প্রকারভেদ বা শ্রেণীবিভাগ করা হয় না। শিলার শ্রেণীবিভাগ অন্য এক উপায়ে—কি-ভাবে শিলা গঠিত হচ্ছে তার ভিত্তিতে। এইভাবে দেখলে সমস্ত শিলা তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়: আগ্নেয় (igneous), পাললিক (sedimentary), রূপান্তরিত (metamorphic)। নামের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে কোন্ ভাগের শিলার গঠন কিভাবে।

আগ্নেয় কথাটা এসেছে অগ্নি থেকে। আগ্নেয় শিলা বা আগুনে তৈরি শিলা হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো শিলা। পৃথিবীর ওপরে সবচেয়ে আগে যে শিলা তৈরি হয়েছিল তা এই শ্রেণীর। শিলা তৈরি হতে হলে তার জন্য উপকরণ চাই—অর্থাৎ, খনিজ চাই। গলিত অবস্থায় নানা খনিজের একটি মিশ্রণ উঠে এসেছিল পৃথিবীর গভীর থেকে, আগ্নেয়গিরির গহ্বর দিয়ে। তার নাম ম্যাগ্‌মা (magma)। এই ম্যাগ্‌মাই শীতল হয়ে কঠিনতা লাভ করে হয়ে উঠেছে আগ্নেয় শিলা। ম্যাগ্‌মা তৈরি হয় মাটির নিচে পাতালে এবং সেখানে একটি প্রকোষ্ঠে মজুদ হতে থাকে। এই প্রকোষ্ঠের নাম ম্যাগ্‌মা প্রকোষ্ঠ (magma chamber)।

ম্যাগ্‌মার কিছু অংশ পৃথিবীর উপরিতলে উঠে আসে আগ্নেয়-

গিরির গহ্বর দিয়ে এবং লাভাস্রোত হয়ে বেরিয়ে পড়ে। লাভা শীতল হয়ে কঠিনতা লাভ করলে পাওয়া যায় আগ্নেয় শিলা। লক্ষ করার বিষয়, এই আগ্নেয় শিলা শীতলতা ও কঠিনতা লাভ করছে পৃথিবীর উপরিভাগেই। এদের বলা হয় নিঃসারী (extrusive) শিলা।

অন্যদিকে, আগ্নেয় শিলার শীতলতা ও কঠিনতা লাভ করার ব্যাপারটা ঘটে যেতে পারে ম্যাগ্‌মার পাতালে থাকার সময়েই। যেমন, খানিকটা ম্যাগ্‌মা ঢুকে যেতে পারে পৃথিবীর গভীরে থাকা কোনো শিলার মধ্যে। সেখানেই শীতলতা ও কঠিনতা লাভ করে সেই ম্যাগ্‌মা হয়ে ওঠে আগ্নেয় শিলা। এমনি আগ্নেয় শিলার নাম উদ্‌বেধী (intrusive) বা পাতালিক (plutonic) শিলা।

উদ্‌বেধী শিলা বিশেষভাবে দেখা যায় যেখানে ক্ষয় ঘটে থাকে খুব বেশি রকমের। ওপরের এলাকায় ক্ষয় চলতে চলতে শেষকালে ভিতরকার উদ্‌বেধী শিলা পর্যন্ত বাইরে বেরিয়ে পড়ে। ভারতের দাক্ষিণাত্য প্রধানত উদ্‌বেধী আগ্নেয় শিলায় গঠিত। অন্যদিকে হিমালয়ের অনেক উঁচুতেও উদ্‌বেধী আগ্নেয় শিলা পাওয়া যায়।

সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে যে আগ্নেয় শিলা তার নাম গ্র্যানিট (granite)। সাধারণত ধারণা করা হয় গ্র্যানিট উদ্‌বেধী শিলা। কিন্তু কোনো কোনো ভূ-বিজ্ঞানীর অন্য মত। তাঁরা বলেন, গ্র্যানিট আকারে এত বিশাল যে উদ্‌বেধী শিলা তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়ায় গ্র্যানিট তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। তাঁরা মনে করেন গ্র্যানিট তৈরি হয়েছে গ্র্যানিটায়নের (granitization) প্রক্রিয়ায়। অন্যরা বিশ্বাসই করেন না যে গ্র্যানিটায়ন নামে একটি প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব আদৌ আছে। যাই হোক, সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে যে আগ্নেয় শিলা সেটি কি-ভাবে তৈরি হল নিশ্চিতভাবে বলা চলে না।

পাললিক শিলা তৈরি হয় পলল (sediment) থেকে। পলল কি ? এক কথায়, পলল হচ্ছে চূর্ণ শিলা। কথাটা একটু ব্যাখ্যা

করা যাক। পৃথিবীর উপরিতলে যতো শিলা রয়েছে সবই যে চিরকাল এমনি অখণ্ড হয়ে থাকবে, তা কিন্তু নয়। জলে বাতাসে ও অন্য নানা প্রাকৃতিক কারণে বিচূর্ণীভবনের (weathering) একটি ক্রিয়া এই শিলার ওপরে হয়ে চলেছে (বিষয়টি নিয়ে পরে আমরা আলোচনা করব)। তার ফলে শিলাটি ভাঙতে শুরু করে, ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়, ধুলোর শামিল হয়ে ওঠে। এই ধুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় জলের স্রোত, উড়িয়ে নিয়ে যায় বাতাস। এই ধুলো থেকেই আমরা পাই মাটি, বালি, কাঁকর। এই ধুলোই নদীর স্রোতের সঙ্গে এসে পড়ে সমুদ্রে এবং থিতিয়ে পড়ে স্তরে স্তরে পলি হয়ে জমতে থাকে। এই হচ্ছে পলল। চাপের মধ্যে থাকতে থাকতে কালক্রমে এই পলল হয়ে ওঠে পাললিক শিলা। স্তরে স্তরে তৈরি হওয়া এই শিলাকে স্তরীভূত (stratified) শিলাও বলা হয়।

আমাদের চারদিকে সাধারণত যে-সব শিলা আমরা দেখি তাদের অনেকগুলোই পাললিক—বেলেপাথর, চুনাপাথর ইত্যাদি। অন্য একধরনের পাললিক শিলায় পাওয়া যায় প্রাচীন উদ্ভিদ ও জীবের অবশেষ--কয়লা, ফসিল সমন্বিত চুনাপাথর ইত্যাদি। পাললিক শিলা তৈরি হতে পারে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেও –যেমন, সমুদ্রের জলে দ্রবণ থেকে থিতিয়ে পড়ে তৈরি হয়েছে লবণ শিলা, জিপসাম (ক্যালসিয়াম সালফেট, যা থেকে প্যারিস পলস্তারা তৈরি হয়)।

আগ্নেয় শিলা তৈরি হতে পারে যেমন ভূত্বকের ভিতরে, তেমনি পৃথিবীর উপরিতলে। কিন্তু পাললিক শিলা তৈরি হয়ে থাকে পৃথিবীর উপরিতলে কিংবা তার খুবই কাছাকাছি। পৃথিবীর উপরিতল থেকে ভূত্বকের ষোল কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত যদি ধরা যায়, সেখানে পাললিক শিলা রয়েছে মাত্র ৫ শতাংশে। কিন্তু যদি শুধু পৃথিবীর উপরিতলের শিলা ধরা যায়, সেখানে পাললিক শিলাই ৭৫ শতাংশ।

পাললিক শিলা অনেকগুলো মূল্যবান খনিজ সম্পদের উৎস—লবণ, গন্ধক ইত্যাদি। পাললিক শিলা চূর্ণ হয়ে উর্বর জমি হয়ে ওঠে। পাললিক শিলা থেকে পৃথিবীর ইতিহাস পাওয়া যেতে পারে, কেননা এই পাললিক শিলার মধ্যেই সাধারণত ফসিল থাকে।

পরিবর্তিত শিলা

"পরিবর্তিত শিলা"—নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, গঠনগত কিছু পরিবর্তন ঘটার ফলে এই শিলা পাওয়া গিয়েছে। আসলে আগে যা ছিল আগ্নেয় শিলা বা পাললিক শিলা তাই পরিবর্তিত হয়ে সম্পূর্ণ নতুন ও ভিন্ন শিলা হয়ে উঠেছে।

পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এমনও হতে পারে যে পাললিক চুনাপাথর হয়ে ওঠে পরিবর্তিত শিলা মার্বেল, কিংবা পাললিক বেলেপাথর হয়ে ওঠে স্ফটিক।

পরিবর্তনের ক্রিয়া ঘটে থাকে মাটির নিচে যেখানে শিলা থাকে প্রচণ্ড চাপ ও উত্তাপের মধ্যে। পরিবর্তনের ক্রিয়া ঘটতে পারে যদি ভূত্বকের আলোড়নের দরুন শিলা পিষ্ট হয়, বেঁকে যায় বা ভেঙে পড়ে। অনেক সময়ে কাছাকাছি মজুদ হওয়া ম্যাগ্‌মা থেকে খনিজ-সমন্বিত তরলপদার্থ বা গ্যাস বেরিয়ে এসে শিলাকে গ্রাস করতে পারে এবং তার ফলেও শিলা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

তার মানে, পরিবর্তিত শিলাকে বলা চলে আগ্নেয় উদ্‌বেধ বা ভূত্বকের প্রচণ্ড আলোড়নের সাক্ষ্য।

পৃথিবীর শিলাময় ত্বক

আমাদের এই গ্রহের শিলাময় ত্বকটি পৃথিবীর উপরিতলে অতি পাতলা একটি আবরণ মাত্র। গোটা কমলালেবুর কাছে কমলালেবুর খোসা যতোখানি পাতলা, প্রায় তের হাজার কিলোমিটার

ব্যাসের পৃথিবীর কাছে প্রায় সত্তর কিলোমিটার পুরু এই ত্বক তার চেয়েও অনেক বেশি পাতলা।

পৃথিবীর এই শিলাময় ত্বকটি কিন্তু রয়েছে খানিকটা ভিন্নভাবে। একেবারে ওপরের দিকে এই শিলা রয়েছে আলগা ঝুরো অবস্থায়, যাকে আমরা বলি বালি বা কাঁকর বা মাটি। এটিকে বলা হয় ম্যান্টল শিলা। এই ম্যান্টল শিলার নিচে রয়েছে আস্তর শিলা (bedrock)।
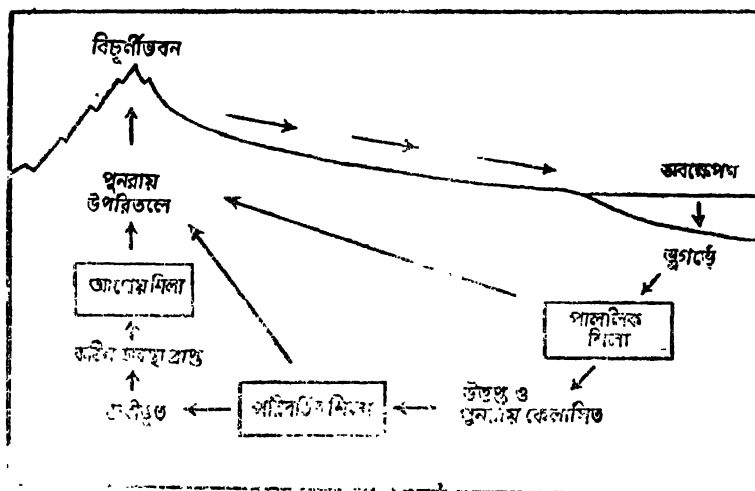
শিলার চক্র

শিলার বিচূর্ণীভবন ঘটে। গুঁড়ো গুঁড়ো সেই শিলা জলে ও বাতাসে স্থানান্তরিত হয়। শেষপর্যন্ত সমুদ্রের তলদেশে পলি হয়ে জমে (অবক্ষেপণ)। স্তরে স্তরে জমে ওঠা পলি হয়ে ওঠে পাললিক শিলা। উত্তপ্ত হয়ে নতুন করে দানা বেঁধে (কেলাসিত) পাললিক শিলা হয়ে ওঠে পরিবর্তিত শিলা। সেই পরিবর্তিত শিলা উত্তাপে গলে যায়, কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, হয়ে ওঠে আগ্নেয় শিলা। এই আগ্নেয় শিলা উপরিতলে উঠে আসে। তখন আবার বিচূর্ণীভবন, আবার অবক্ষেপণ, ইত্যাদি। এমনিভাবে অনেক অনেকখানি সময় নিয়ে শিলার চক্রটি ঘটে চলে।

এমনিতে মনে হতে পারে ম্যান্টল শিলা ও আস্তর শিলার মধ্যে বুঝি খুবই তফাত। আসলে কিন্তু তা নয়। বরং খুবই গভীর সম্পর্ক—

কেননা একটি এসেছে অপরটি থেকে। ম্যাণ্টল শিলা হচ্ছে চূর্ণ শিলা, যা পাওয়া গিয়েছে আস্তর শিলার বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয় থেকে। অন্যদিকে ম্যাণ্টল শিলার আলগা টুকরোগুলো কোনো একসময়ে এঁটে যেতে পারে এবং হয়ে উঠতে পারে আস্তর শিলা।

একটু পরেই আমরা ভূ-গোলকের ভিতরের দিকে তাকাব এবং ভূত্বকের শিলার অবস্থান ও বিন্যাস সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে চেষ্টা করব। তার আগে পৃথিবীর বাইরের দিকে যে আরো দুটি মণ্ডল থেকে গিয়েছে---বারিমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডল --সে-সম্পর্কে কিছু আলোচনা সেরে নেওয়া যাক।

বারিমণ্ডল

পৃথিবীকে বলা হয় জলময় গ্রহ, ঠিকই বলা হয়। পৃথিবীর উপরিতলের বেশির ভাগটাই জল। মহাকাশ থেকে তাকিয়ে পৃথিবীকে দেখায় হালকা নীল একটা গোলকের মতো, তার গায়ে সাদা মেঘের ফুটফুট দাগ। সে-জায়গায় চাঁদের চেহারা ম্যাড়মেড়ে হলদেটে। চাঁদের উপরিতলে জলের চিহ্নমাত্র নেই।

পৃথিবীর উপরিতলের ১০০ ভাগের ৭২ ভাগ জলে ঢাকা। জল-ভাগের মোট আয়তন ৩৬ কোটি ১২ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার (পৃথিবীর উপরিতলের মোট আয়তন ৫১ কোটি ১ লক্ষ বর্গ-কিলোমিটার) সাগর ও মহাসাগরের গড় গভীরতা হচ্ছে ৩,৮০০ মিটার। আর সমুদ্র-পিঠ (sea level) থেকে স্থলভাগের গড় উচ্চতা ৭০০ মিটার। স্থলভাগের সবচেয়ে উঁচু জায়গা হিমালয়ের মাউণ্ট এভারেস্ট (৮,৮৪৮ মিটার উঁচু), স্থলভাগের সবচেয়ে গভীর জায়গা প্রশান্ত মহাসাগরের মারিয়ানাস ট্রেঞ্চ (১১,০৪০ মিটার গভীর)। এই সবচেয়ে উঁচু ও সবচেয়ে গভীর দুটি জায়গাতেই মানুষ পৌঁছতে পেরেছে। এভারেস্টের

চুড়োয় প্রথম মানুষ তেনজিং ও হিলারি ১৯৫৩ সালে। মারিয়ানাস ট্রেঞ্চের তলদেশে জ্যাকি পিকার্ড ও লেফটেনেন্ট ডোনাল্ড ওয়াল্শ, ১৯৬০ সালে।

পৃথিবীর উপরিতলে যদি উঁচু-নিচু না থাকত, সবটাই হত মসৃণ, তাহলে পৃথিবীর সমস্ত জল সারা গোলক জুড়ে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ত। হিসেব করে দেখা হয়েছে, এমনি অবস্থায় পৃথিবীর গোলকটি ২,২৫০ মিটার গভীর জলের নিচে ঢাকা পড়ে যেত। বঙ্গোপসাগরের জল যদি কোনো কারণে আরো ১২ মিটার উঁচু হয়ে ওঠে তাহলে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত গোটা বাংলাদেশ জলের তলায় ডুবে যাবে। সমুদ্র-পিঠ থেকে কলকাতা শহরের উচ্চতা ৯ মিটারেব বেশি নয়। বঙ্গোপসাগরের জল ৯ মিটার উঁচু হয়ে উঠলেও কলকাতার কোনো একতলা বাড়িতে বাস করা সম্ভব হবে না।

সাগরে ও মহাসাগরে যতো জল আছে তার মোট পরিমাণ ১২৫ কোটি ঘন-কিলোমিটার। সূর্যের তাপে যতো জল প্রতি বছর বাষ্প হয়ে উবে যায় তার পরিমাণ অন্ততপক্ষে ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ঘন-কিলোমিটার।

বারিমণ্ডলের ভাণ্ডারে এখন যতো জল আছে তার ৯৭ শতাংশই আছে সমুদ্রে। বাকি জলের ২ শতাংশ জমিতে ও মেরুদেশের বরফে, ১ শতাংশ বায়ুমণ্ডলে। গ্রীনল্যাণ্ড ও কুমেরুর বরফ-আচ্ছাদন যদি গলিয়ে ফেলা যায় তাহলে ২ কোটি ৫০ লক্ষ ঘন-কিলোমিটার জল পাওয়া যেতে পারে।

পৃথিবীতে এই যে বিপুল পরিমাণ জল, তার জন্যই পৃথিবীতে জীবন তৈরি হওয়ার পক্ষে এমন চমৎকার অবস্থা তৈরি হয়েছে। জল আছে বলেই জীবন। কি মানুষ, কি জীবজন্তু—সকলকেই বেঁচে থাকার জন্য জলের ওপরে নির্ভর করতে হয়। পৃথিবীর আবহাওয়া, পৃথিবীর জলবায়ু, পৃথিবীর বৃষ্টিপাত—তাও অনেকখানি নির্ভর করে সাগর ও মহাসাগরের ওপরে। আদি প্রাণের জন্ম হয়েছিল

সমুদ্রে*, বহু কোটি বছর সমুদ্রই ছিল প্রাণের আশ্রয়—ডাঙার জীবন তো অনেক পরের। এমনকি আজকের দিনেও শুকনো ডাঙায় যতো-না জীবের বাস, তার চেয়ে অনেক বেশি জীবের বাস সমুদ্রের জলে। হিসেব করে দেখা হয়েছে, কীটপতঙ্গ বাদে অন্যান্য জীব পৃথিবীতে আছে ৪,৫০,০০০ প্রজাতির।** এদের মধ্যে পাঁচভাগের চারভাগ, অর্থাৎ ৩,৬০,০০০ প্রজাতির জীব বাস করে সমুদ্রের জলে। সেখানে যদি শুধু শামুকের হিসেব নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে, শামুক (molluscs) পাওয়া যাচ্ছে অন্তত পক্ষে ৪০,০০০ প্রজাতির। যদি শুধু কাঁকড়া-জাতীয় খোলাবিশিষ্ট জীবের হিসেব নেওয়া যায়, তাদের সংখ্যাও ৪০,০০০ প্রজাতির কম নয়। আর মাছ? এখনো পর্যন্ত যতোদূর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, মাছের প্রজাতি ২৫,০০০-এরও বেশি। সমুদ্রে উদ্ভিদও হয়ে থাকে, তাও সংখ্যায় কম নয়—সামুদ্রিক উদ্ভিদের প্রজাতির সংখ্যা অন্তত পক্ষে ৮,০০০।

---

* সম্প্রতিকালে কোনো কোনো বিজ্ঞানী বলছেন, প্রাণের জন্ম মহাকাশে। কেননা মহাকাশে জৈব পদার্থের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন। তাঁদের মতে, আদিম সমুদ্রে প্রাণের জন্ম হয়নি, মহাকাশে তৈরি হওয়া প্রাণ আদিম সমুদ্রে আশ্রয় পেয়েছিল ও লালিত হয়েছিল।

**জীবজগতকে চেনার ও বোঝার সুবিধের জন্য জীববিজ্ঞানীরা জীবজগতকে নানাভাবে ভাগ করেছেন ও জীবের আলাদা আলাদা নামকরণ করেছেন। জীবজগতকে প্রথমে তাঁরা ভাগ করেছেন দুটি প্রধান সর্গে (kingdom)—উদ্ভিদ ও প্রাণী। সমগ্র প্রাণীজগতকে তাঁরা ভাগ করেছেন বারোটি প্রধান পর্বে (phylum)। যেমন, একটি পর্ব মেরুদণ্ডী প্রাণীদের নিয়ে—কোর্ডেট্স (chordates), একটি পর্ব বহুগ্রন্থি-প্রত্যঙ্গ-বিশিষ্ট প্রাণীদের নিয়ে—অ্যান্থ্রোপড্স (anthropods), ইত্যাদি। প্রত্যেকটি পর্বকে ভাগ করেছেন কয়েকটি শ্রেণীতে (class)—যেমন, মানুষের শ্রেণী স্তন্যপায়ী (mammalia)—প্রত্যেকটি শ্রেণীকে কয়েকটি বর্গে (order)—মানুষের বর্গ প্রাইমেট্স (primates)—প্রত্যেকটি বর্গকে কয়েকটি গোত্রে (family)—মানুষের গোত্র হোমিনিডী (hominidae)—প্রত্যেকটি গোত্রকে কয়েকটি জাতিতে

পৃথিবীর তাবৎ পদার্থ সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়—অজস্র লবণ, অজস্র খনিজ ও প্রায় সমস্ত মৌলিক পদার্থ। কোনো কোনো খনিজ—যেমন, ম্যাগ্‌নেসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম—এত প্রচুর পরিমাণে আছে যে নিষ্কাশন করার খরচ পুষিয়ে যায়। সোনাও আছে, তার পরিমাণ প্রতি লিটারে ০·০১১ মাইক্রোগ্রাম, বা এক-গ্রামের একশো-কোটি ভাগের এগারো-ভাগ। পরিমাণটি এতই সামান্য যে নিষ্কাষণ করার খরচ পোষায় না। তবুও, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯২৪ সালে, জার্মানরা একবার সমুদ্রের জল থেকে সোনা সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিল। কোনো লাভ হয়নি।

দেখা যাচ্ছে, দ্রবণকারী তরল পদার্থ হিসেবে সমুদ্রের জল অসাধারণ। শুধু তাই নয়, সমুদ্রকে বলা চলে অসাধারণ এক জৈব রসায়নাগারও। সেখানে আছে এমন সমস্ত জৈব উপকরণ যার ওপরে সূর্যের আলোর ক্রিয়া ঘটলে তৈরি হয় সমুদ্র-শৈবাল (phytoplankton)। সমুদ্রের যতোদূর পর্যন্ত সূর্যের আলো পৌঁছয় ততোদূর পর্যন্ত সারা সমুদ্র জুড়ে তৈরি হয়ে চলে এই শৈবাল বা ফাইটোপ্লাংক্টন। বলা হয়ে থাকে, এই ফাইটোপ্লাংক্টনই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন সরবরাহ করার বড়ো কারখানা*। অন্যদিকে এই

(genus)—মানুষের জাতি হোমো—প্রত্যেকটি জাতিকে কয়েকটি প্রজাতিতে (species)—মানুষের প্রজাতি স্যাপিয়েন্‌স্ (sapiens)। জীববিজ্ঞানীরা প্রত্যেকটি জীবের বৈজ্ঞানিক নামকরণ করেছেন, ল্যাটিন ভাষায়। প্রত্যেকটি নামে দুটি অংশ—প্রথমে জীবটির জাতি, পরে প্রজাতি। মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম—হোমো স্যাপিয়েন্‌স্। জীবের শ্রেণীবিন্যাসের ব্যাপারটিকে তুলনা করা চলে পিরামিডের সঙ্গে—পিরামিডের ভূমিতে রয়েছে লক্ষ লক্ষ প্রজাতি আর চূড়োয় দুটি সর্গ। কিংবা গাছের সঙ্গে—গাছের কাণ্ডে সর্গ আর একেবারে মগডালগুলোতে প্রজাতি।

*গাছের পাতার সবুজ অংশে আছে ক্লোরোফিল। সূর্যের আলো পড়লে এই ক্লোরোফিল বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও জলকে রূপান্তরিত করতে

ফাইটোপ্লাংক্টনই হয়ে ওঠে সমুদ্রের খাদ্য-চক্রে প্রথম ধাপ। ফাইটোপ্লাংক্টন খায় সমুদ্রের অতিক্ষুদ্র জীব—জু-প্লাংক্টন। তাকে খায় ছোটমাছ। ছোটমাছকে বড়োমাছ। বড়োমাছকে হাঙ্গর ইত্যাদি। উদ্ভিদ ও প্রাণীর অবশেষ স্রোতের সঙ্গে উঠে আসে সমুদ্রের ওপরে, সূর্যের আলোর এলাকায়। সেখানে তৈরি হয়ে চলে ফাইটোপ্লাংক্টন। এই চক্রটি সামনে ঘটে চলেছে।

এমনকি ফলনের দিক থেকে বিচার করলেও সমুদ্রের সঙ্গে কারও তুলনা হয় না। এক হেক্টর (২.৪৭ একর) সমুদ্রে চাষ করলে আড়াই টন মাছ পাওয়া যেতে পারে। একই ভাবে তুলনা করলে জমির ফলন অনেক কম।

সমুদ্রের জল আরো একটি বড়ো রকমের কাণ্ড ঘটিয়ে থাকে – তা হচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রাকে খুব বেশি উঠতে-নামতে না দেওয়া। পৃথিবীতে যদি সমুদ্র না থাকত তাহলে পৃথিবীর অবস্থা হত জলহীন চাঁদের মতো। চাঁদে দেখা যায়, দিনের বেলায় যেখানকার তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে হয়ে দাঁড়ায় ১৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (লেখা হয় এইভাবে : ১৫০° সে), রাত্রিবেলা সেই একই জায়গার তাপমাত্রা অতি অল্প সময়ের মধ্যে নেমে যায় শূন্যের নিচে ১৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে (লেখা হয় এইভাবে : –১৫০° সে)। অর্থাৎ, তাপমাত্রার হেরফের ৩০০° সে জুড়ে। পৃথিবীর স্থলভাগে সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রা হয়ে থাকে ৪৯° সে, সবচেয়ে কম –৮৭° সে—তাও একজায়গায় নয়। পৃথিবীর সমুদ্রে তাপমাত্রার হেরফের ২৭° সে থেকে –২° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে।

পারে কার্বোহাইড্রেট ও অক্সিজেনে। কার্বোহাইড্রেট গাছের অংশীভূত হয়, অক্সিজেন বাতাসে ছাড়া পায়। এমনিভাবে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন সরবরাহ বজায় থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সালোকসংশ্লেষ (photosynthesis)। পৃথিবীব্যাপী বিশাল বিশাল সাগর ও মহাসাগরে যে বিপুল পরিমাণ ফাইটোপ্লংকটন তৈরি হয়ে চলেছে, তা থেকে বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন সরবরাহ হয়ে থাকে।

পৃথিবীর সমুদ্রের জল কখনোই স্থির থাকে না, পৃথিবীর গোলকটিকে ঘিরে অনবরত চলছে। সমুদ্রের জলের এই সচলতার কারণ অনেক—দিনে একবার নিজের অক্ষের চারদিকে পৃথিবীর পাক খাওয়া, বছরে একবার সূর্যের চারদিকে কক্ষপথে পৃথিবীর ঘুরে আসা, চাঁদ ও সূর্যের টানে জোয়ার ভাঁটা হওয়া, ইত্যাদি।

সূর্যকিরণের তাপ বিষুব-অঞ্চলে বেশি, মেরু-অঞ্চলে কম। ফলে বিষুব-অঞ্চলে সমুদ্রের জল বেশি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ফুলে ওঠে*। তখন অবস্থাটা দাঁড়ায় এই যে বিষুব-অঞ্চল থেকে মেরু-অঞ্চল পর্যন্ত সমুদ্রের উপরিতলে একটা ঢাল তৈরি হয়ে যায় যেন—যতো সামান্য মাত্রাতেই হোক। এই ঢাল বেয়ে বিষুব-অঞ্চলের গরম জল নেমে আসে দুই মেরুর দিকে। তখন মেরু-অঞ্চলের ঠাণ্ডা জল নিচে চলে যায় এবং সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে বিষুব অঞ্চলের দিকে চলতে চায়।

সমুদ্রের জল উত্তাপ যেমন ধরে রাখে, তেমনি ছেড়ে দেয়। গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের জল উত্তপ্ত হতে হতে শীতকাল এসে যায়, তখন সমুদ্রের স্রোত ও বাতাসের প্রবাহ এই দুয়ে মিলে সমুদ্রের জলের উত্তাপকে ছড়িয়ে দিতে থাকে। অন্যদিকে, শীতকালে সমুদ্রের জল শীতল হতে হতে গ্রীষ্মকাল এসে যায়, তখন একই ভাবে সমুদ্রের শীতলতা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই কারণে সমুদ্রের ধারে কোনোটাই বেশি হতে পারে না—না গ্রীষ্ম, না শীত।

জীববিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর জীবমণ্ডলে যে একটা সমতা ও ছন্দ বজায় থাকছে তা এই সমুদ্রের জন্যই।

সমুদ্রের তলদেশের গড়ন নানারকমের হয়ে থাকে—যেমন হয়ে থাকে স্থলভাগের মাটির। সমুদ্রের তলদেশের আলাদা আলাদা গড়নকে নানা নাম দেওয়া হয়েছে—যেমন, মহীসোপান (conti-

---

* পদার্থের সাধারণ ধর্ম, উত্তপ্ত হলে বেড়ে যাওয়া বা প্রসারিত হওয়া। বাড়তে পারে দৈর্ঘ্যে বা আয়তনে বা ঘনমানে। এখানে সূর্যের তাপে সমুদ্রের জল ঘনমানে বেড়ে গিয়ে ফুলে উঠছে।

nental shelf), মহীঢাল (continental slope), অতল সমভূমি (abyssal plain) ও খাত (trench)।

মহাদেশের সন্নিহিত সমুদ্রের অগভীর এলাকাকে বলা হয় মহীসোপান। বহু ক্ষেত্রে এই মহীসোপান হচ্ছে মহাদেশেরই অংশ, সমুদ্রের জলের উচ্চতা বেড়ে যাবার ফলে যা ডুবে গিয়েছে*। মহীসোপানের এলাকা কিন্তু খুব বড়ো নয়—সাগর ও মহাসাগর যতো এলাকা জুড়ে আছে তার একশো-ভাগের সাড়ে-সাত ভাগ। এলাকায় ছোট হলেও মহীসোপান কিন্তু গুরুত্বের দিক থেকে ছোট নয়। কেননা এই মহীসোপান থেকেই পাওয়া যায় তেল ও গ্যাস (যেমন পাওয়া গিয়েছে পারশ্য উপসাগরে, উত্তর সাগরে, আরব সাগরের বোম্বে হাই-তে)। এই মহীসোপান থেকেই বেশির ভাগ মাছ ধরা হয়।

মহাদেশগুলোকে বলা যেতে পারে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা বড়ো বড়ো স্থলভাগ। যেন বড়ো বড়ো কতকগুলো চাতাল (platform)। চাতালের কিনারগুলো নিচু, তাই সমুদ্রের জলে ডুবে গিয়েছে। চাতালের এই ডুবে-থাকা অংশকেই বলা হচ্ছে মহীসোপান। কতদূর পর্যন্ত এলাকাকে মহীসোপান হিসেবে ধরা হয়? যতোদূর পর্যন্ত সমুদ্রের গভীরতা একটু একটু করে বাড়ে। সাধারণত দেখা যায়, ১৩৫ মিটার গভীরতা না হওয়া পর্যন্ত, কোথাও কোথাও ২০০ মিটার গভীরতা না হওয়া পর্যন্ত, এ-ব্যাপারটি চলতে থাকে। তারপরেই

* ভূ-বিজ্ঞানীরা এমন প্রমাণ পেয়েছেন যে পৃথিবীতে মাঝে মাঝে হিমযুগ এসেছে, আবার চলে গিয়েছে। শেষ হিমযুগটি এসেছিল আজ থেকে ২৫,০০০ বছর আগে, শেষ হয়েছে ১০,০০০ বছর আগে। হিমযুগে ভূপৃষ্ঠের বেশির ভাগ এলাকা পুরু বরফের নিচে ঢাকা পড়েছিল। হিমযুগ শেষ হতে বরফ কিছুটা গলেছে ও বরফের এলাকা শেষ হয়ে গিয়েছে। বরফ যতো গলেছে, সমুদ্রের জলের পরিমাণ ততো বেড়েছে, সমুদ্রের জল ততো উঁচু হয়েছে। অবশ্য খুবই আস্তে আস্তে।

প্রায় খাড়া ঢাল, যার নাম মহীঢাল। মহাসাগর আসলে শুরু হচ্ছে এই মহীঢাল থেকে। ভারতের মহীসোপান পূর্ব উপকূলে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত, পশ্চিম উপকূলে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত। তবে সবচেয়ে বেশি বোম্বাইয়ের উপকূলে—প্রায় ৩৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত। মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে, ভারতের পূর্ব উপকূলটি তৈরি হয়েছে বঙ্গোপসাগরে, আর পশ্চিম উপকূলটি আরব সাগরে। আর দুটি সাগরই ভারত মহাসাগরের উত্তর দিকে বেড়ে আসা অংশ।

মহীঢাল হচ্ছে সেই এলাকা যেখানে মহীসোপান আরো ঢালু হয়ে অতল সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে। অর্থাৎ, অতল সমুদ্রের দিকে মহী-সোপানের কিনারকে বলা হচ্ছে মহীঢাল।

মহাসাগরের তলদেশ যেখানে ৩,৪০০ মিটার থেকে ৫,৫০০ মিটার পর্যন্ত গভীর তাকে বলা হয় অতল সমভূমি। মহাসাগরের তলদেশের অন্ততপক্ষে তিনভাগের দু-ভাগ এই অংশে পড়ে। তবে এই তলদেশটি মোটেই সমভূমি নয়, ভয়ানক রকমের উঁচুনিচু। এখানে আছে পাহাড়, পর্বত, আগ্নেয়গিরি ও লম্বা লম্বা ফাটল। আর আছে উঁচু শিরা (ridge)। পৃথিবীর চারটি মহাসাগরের তলদেশে মাঝ-বরাবর টানা লম্বা এই শিরার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সমুদ্রের তলদেশের প্রসারণ নিয়ে আলোচনা করার সময়ে এই শিরার কথা আবার আমাদের তুলতে হবে।

অতল মহাসাগরের তলদেশে আর যে ব্যাপারটি আছে তার নাম খাত। সবচেয়ে গভীর যে খাতের সন্ধান এখনো পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে সেটি মারিয়ানাস দ্বীপের কাছে (১১,০৪০ মিটার গভীর)। মহাসাগরের তলদেশের এই খাতের কথা অল্প কিছুদিন হল জানা গিয়েছে। গোড়ার দিকে খাতের কোনো ব্যাখ্যা ছিল না। পরে মহাদেশের সঞ্চরণ সম্পর্কে তত্ত্ব খাড়া করতে গিয়ে এই খাতকে বড়ো রকমের ভূমিকা দিতে হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা তুলব।

বায়ুমণ্ডল

প্রাচীনকালে বায়ুকে সৃষ্টির একটি মৌলিক উপাদান বলে মনে করা হত। পঞ্চভূতের (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম) একটি হচ্ছে মরুৎ বা বায়ু। গ্রীক বিজ্ঞানীরা মনে করতেন সৃষ্টির মৌলিক উপাদান চারটি—জল, আগুন, মাটি ও বাতাস। বায়ু যে কতকগুলো গ্যাসের মিশ্রণ মাত্র তা জানা গিয়েছে আঠারো শতকের শেষদিকে, কতকগুলো গ্যাসকে আলাদা করে চিনতে পারার পরে। কার্বন ডাই-অক্সাইডকে চেনা গিয়েছিল ১৭৫৪ সালে, নাইট্রোজেনকে ১৭৭২ সালে, অক্সিজেনকে ১৭৭৩ সালে।

নানা গ্যাসের মিশ্রণে তৈরী বায়ুমণ্ডলে কোন্ গ্যাস কতখানি আছে তার হিসেব এই :

গ্যাস	শতকরা ভাগ
নাইট্রোজেন	৭৮·০৩
অক্সিজেন	২০·৯৯
আর্গন	০·৯৪
কার্বন ডাই-অক্সাইড	০·০৩
হাইড্রোজেন	০·০১
নিয়ন	০·০০১২
ক্রিপ্টন	০·০০১
হিলিয়াম	০·০০০৫
ওজোন	০·০০০০৬
জেনন	০·০০০০০৯

এ-ছাড়াও বায়ুমণ্ডলে আছে জলীয় বাষ্প (শতকরা ০·১ থেকে ০·4 ভাগ), ধুলো, বালি, জীবাণু ও কিছু কিছু দূষিত পদার্থ।

বায়ুমণ্ডলকে কতকগুলো স্তরে ভাগ করা হয়েছে। ভূ-পৃষ্ঠের সবচেয়ে কাছে যে স্তরটি তাকে বলা হয় ট্রোপোস্ফিয়ার troposphere)। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পনেরো-কুড়ি কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত এই স্তরটির বিস্তার। বায়ুমণ্ডলের সমস্ত ধুলো, ধোঁয়া, জলীয় বাষ্প, জীবাণু ও কার্বন ডাই-অক্সাইড রয়েছে এই স্তরটিতে। বায়ুমণ্ডলের যা-কিছু আলোড়ন তাও এখানে। বায়ুমণ্ডলের এই সবচেয়ে নিচের স্তরেই আবদ্ধ থাকে মেঘ, ঝড়বৃষ্টি, সাইক্লোন ও ঘূর্ণিবাত্যা। বায়ুমণ্ডল সবচেয়ে ঘন এই ট্রোপোস্ফিয়ারে, বায়ুমণ্ডলের শতকরা নব্বই ভাগ জড়ো হয়ে আছে এখানে। একটা হিসেব আছে, ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডলের যা ঘনত্ব, সেই ঘনত্বে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে যদি চেপে আনা যায় তাহলে বায়ুমণ্ডলের বিস্তৃতি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে দশ কিলোমিটারের বেশি হবে না।

ট্রোপোস্ফিয়ারের ওপরের স্তরের নাম স্ট্রাটোস্ফিয়ার। স্তরটির বিস্তার ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সত্তর-আশি কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত। এই স্তরে ধুলো বা ধোঁয়া নেই, জলীয় বাষ্প না-থাকার মতো। মেঘের রাজ্য এই স্তরের অনেক নিচে। ঝড় এতদূর পৌছতে পারে না। তাপমাত্রা এখানে খুবই কম, হিমাঙ্কেরও অনেক নিচে।

স্ট্রাটোস্ফিয়ারে আছে ওজোন-গ্যাসের একটি পর্দা, যার কথা বিশেষভাবে বলা দরকার। ওজোন অক্সিজেন-ঘটিত একটি গ্যাস। অক্সিজেনের অণু তৈরি হয় দুটি অক্সিজেন পরমাণুর সংযোগে, ওজোন অণু তিনটি অক্সিজেন পরমাণুর সংযোগে (O_2 হচ্ছে অক্সিজেন, O_3 ওজোন)। ওজোনের এই পর্দাটি রয়েছে পনেরো থেকে চল্লিশ কিলোমিটার উঁচুতে। এই পর্দাটি আছে বলেই সূর্যের কিরণের অতি-বেগুনী রশ্মি* (ultra-violet ray) পৃথিবীর মাটিতে পৌছতে পারে না।

***সূর্যের কিরণের যেটুকু আমরা দেখতে পাই—আলোর অংশ—তাতে আছে সাতটি রঙ। বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলদে, কমলা, লাল। এই**

বায়ুমণ্ডলে ওজোন-পর্দাটি না থাকলে সূর্যকিরণের অতিবেগুনী রশ্মি সরাসরি পৌঁছে যেত জীবমণ্ডলের এলাকায়। সেটা হত জীবের টিকে থাকার পক্ষে মারাত্মক এক অবস্থা। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে এবং স্ট্রাটোস্ফিয়ার দিয়ে জেট-বিমান চলাচলের ফলে এই ওজোন-পর্দাটি নষ্ট হতে চলেছে। বহু বিজ্ঞানী এ-বিষয়ে সাবধান হতে বলেছেন।

বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ওপরের স্তরের নাম আয়নোস্ফিয়ার (ionosphere)। এই স্তরটির সীমানা স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ওপর থেকে উঁচুর দিকে কয়েক-শো কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়ানো। আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল কেন বলা হচ্ছে? এই স্তরের বায়ুমণ্ডলে বায়ুর উপাদানের পরমাণুগুলো রয়েছে আয়নিত অবস্থায়। আয়ন কি? বিষয়টি নিয়ে আগে একবার আলোচনা করেছি, আবার বলছি। আমরা জানি, বস্তুর পরমাণু এমনিতে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ হয়ে থাকে, কেননা পরমাণুর নিউক্লিয়সের পজিটিভ চার্জ সেই নিউক্লিয়সের চারদিকে ঘুরে চলা ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জের সমান। কিন্তু কোনো কারণে যদি পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন বেশি বা কম হয়ে যায়—তখন? ইলেকট্রন বেশি হলে পরমাণুটি হয়ে পড়ে নেগেটিভ চার্জ বিশিষ্ট, ইলেকট্রন কম হলে পজিটিভ চার্জ বিশিষ্ট। নেগেটিভ হোক, পজিটিভ হোক, এমনি চার্জবিশিষ্ট পবমাণুকে বলা হয় আয়ন। এখন, ব্যাপারটা হয় কি, সূর্যকিরণে যে-সব অতি-ছোট মাপের তরঙ্গ

সাতটি রঙ হচ্ছে আলোর সাতটি তরঙ্গ। এক-একটি এক-এক মাপের—ছোট থেকে বড়ো। ছোটর দিকে আছে বেগুনী, বড়োর দিকে লাল। কিন্তু সূর্যকিরণে এই সাতটি ছাড়াও আছে আরো অনেকগুলো তরঙ্গ, যা চোখে দেখা যায় না। লাল উজিয়ে অবলোহিত রশ্মি (infra-red ray), বেগুনী পেরিয়ে অতিবেগুনী রশ্মি। এই অতিবেগুনী রশ্মি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি হয়ে গেলে মানুষের শরীরের পক্ষে, বিশেষ করে চোখের পক্ষে, খুবই ক্ষতিকর। সে-অবস্থায় এমনকি জীবমণ্ডলও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

আছে—যেমন, এক্স-রশ্মি, অতিবেগুনী রশ্মি—সেগুলো বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে পৌঁছে সেখানকার পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন খসিয়ে ফেলে। তখন পরমাণু হয়ে পড়ে আয়নিত। আয়নিত পরমাণু দিয়ে গড়া বায়ুমণ্ডলের বিশেষ স্তরকেই বলা হয় আয়নোস্ফিয়ার।

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যতো উঁচুতে ওঠা যায় বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব ততো কমে, বেশ ভালোরকমই কমে। ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব প্রতি ঘন-সেন্টিমিটারে এক-গ্রামের হাজার ভাগের ১.২ ভাগ। আর ২০০ কিলোমিটার উঁচুতে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব কমে গিয়ে দাঁড়ায় প্রতি ঘন-সেন্টিমিটারে এক গ্রামের দশলক্ষ-কোটি ভাগের ১.০ ভাগ। স্ট্রাটোস্ফিয়ারে বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব এতই কম যে পৃথিবীর সবচেয়ে জোরালো ভ্যাকুয়াম-যন্ত্রেও এত কম ঘনত্ব তৈরি হতে পারে না। এই অসম্ভব-কম-ঘনত্বের স্তরটি অসম্ভব পাতলা হতে হতে শেষপর্যন্ত মহাশূন্যে মিলিয়েছে। কোথায় যে মিলিয়েছে বলা শক্ত। এমনকি ৫,০০০ কিলোমিটার ওপরেও বায়ুমণ্ডলের ছিটে টের পাওয়া যায়। তবে বায়ুমণ্ডলের একেবারে বাইরের দিকে রয়েছে চৌম্বকমণ্ডল (magnetosphere), সেখানে পৃথিবীর চুম্বকত্বের দরুন আটক পড়া কণিকাগুলো পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখা বরাবর ছড়িয়ে আছে। যাকে আমরা বলেছি ভান অ্যালেন বলয়। বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো এই বলয় এমনকি একলক্ষ কিলোমিটার দূরেও কখনো কখনো বিলীন হয় না।

ভূ-পৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে ১৪.৭ পাউণ্ড। চাপের এই মাত্রাকে বলা হয় ১ বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপার যন্ত্রে বা ব্যারোমিটারে বায়ুমণ্ডলের চাপ মাপা হয় নলের মধ্যে পারদের স্তম্ভ কতখানি উচ্চতা পর্যন্ত খাড়া হয়ে থাকতে পারছে তাই দিয়ে। এক বায়ুমণ্ডল চাপে এই উচ্চতা হয় ৭৬০ মিলিমিটার।

বায়ুমণ্ডল ও বারিমণ্ডল, এই দুয়ে মিলে অন্য একটি মস্ত কাজ করে

থাকে। তা হচ্ছে জীবমণ্ডলে জীবের টিকে থাকার উপযোগী তাপ-মাত্রা বজায় রাখা। বায়ুমণ্ডল আছে বলেই জীবমণ্ডলে তাপমাত্রা দুপুরবেলা প্রচণ্ড বাড়তে পারে না, রাত্রিবেলা প্রচণ্ড কমতে পারে না।

বায়ুমণ্ডলের অন্য আরেকটি মস্ত কাজ, উল্‌কাপাত থেকে পৃথিবীর মাটিকে বাঁচানো। পৃথিবীর ওপরে প্রতিদিন হাজার-হাজার উল্‌কাপাত হয়ে চলেছে*। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পরে বাতাসের ঘষা লেগে উল্‌কাতে আগুন ধরে যায় এবং পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছবার আগেই উল্‌কা পুড়ে ছাই হয়ে যায় (মাটি থেকে তাকিয়ে আমরা বলি, তারা খসল)। অধিকাংশ উল্‌কাই আকারে একটি কণিকার মতো, সেগুলো পুড়ে ছাই হতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু উল্‌কা যদি বড়ো হয় তাহলে পুড়তে পুড়তেও তার খানিকটা অংশ মাটিতে পড়ে। এমনি উল্‌কাও পৃথিবীর মাটিতে কম পাওয়া যায়নি।

বায়ুমণ্ডল কিন্তু বাইরের মহাকাশকে দেখার ব্যাপারে খানিকটা আড়ালও তুলে থাকে। বায়ুমণ্ডল দিয়ে প্রবেশ করতে পারে একমাত্র চোখে দেখা যায় যে-আলো সেই আলোর তরঙ্গ ও রেডিও তরঙ্গ। এই দুটি হচ্ছে পৃথিবীর মাটি থেকে পৃথিবীর বাইরের জগৎকে দেখার জানলা। বাইরের জগৎকে সত্যিকারের আমরা দেখতে পেয়েছি মহাকাশ-গবেষণার যুগ শুরু হবার পরে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে গিয়ে।

চোখে দেখতে পাওয়া আলোর সবক'টিকে যে বায়ুমণ্ডল সমান অবাধে প্রবেশ করতে দেয়, তা নয়। নীল আলোকে খানিকটা বাধা

---

*মহাকাশ থেকে যতো ধুলো ও উল্‌কা পৃথিবীর অভিকর্ষের টানের এলাকায় এসে পড়ে এবং পুড়তে পুড়তে ছাই হয়ে গিয়ে পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসে তার ফলে প্রতি বছরে পৃথিবীর ভর বেড়ে যায় এক-কোটি টন। অন্যদিকে একই সঙ্গে হাইড্রোজেন হিলিয়াম ও আরো কিছু হালকা গ্যাসের কণিকা মহাশূন্যে উধাও হয়ে যায়।

দেয়, লাল আলোকে ছেড়ে দেয়। বায়ুমণ্ডলে বাধা পেয়ে নীল আলো চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে—এই কারণে আকাশ নীল। বায়ুমণ্ডলের বাইরে গেলেই আকাশ আর নীল থাকে না, কালো হয়ে ওঠে (মহাকাশচারীরা তা দেখেছেন)। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ে সূর্যকে যে লাল দেখায় তার কারণও এই। এই দুই সময়ে সূর্যের আলোকে অনেক বেশি পুরু বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসতে হয়। ফলে নীল আলো আরো বেশি বাধা পায়, লাল আলো পায় না—সূর্যকে মনে হতে থাকে লাল-আলোর সূর্য।

পৃথিবীর ভিতরের কথাঃ

ভূত্বক, ম্যাণ্টল ও অষ্টি

সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ চলেফিরে বেড়াচ্ছে—কেউ ডাঙায়, কেউ জলে, কেউ আকাশে। পৃথিবীর জল-স্থল-অন্তরীক্ষ জয় করেছে মানুষ। আর মানুষের কৌতূহলেরও শেষ নেই। শুধু জানার আগ্রহ থেকে মানুষ পৃথিবীর উপরিতলে সর্বত্র ঢুঁড়ে বেড়িয়েছে—বিষুব অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চল পর্যন্ত, মহাসাগরের তলদেশ থেকে পর্বতের চুড়ো পর্যন্ত। এতই তার কৌতূহল যে চারলক্ষ কিলোমিটার দূরত্ব পার হয়ে চাঁদের মাটিতে পর্যন্ত নেমেছে।

মানুষ চাঁদে পাড়ি দিয়েছে মহাকাশযানে চেপে। গভীর সমুদ্রে হাজির হয়েছে ডুবো-আধার নামিয়ে। যে মানুষের এতখানি কৃতিত্ব সে কিন্তু এখনো পৃথিবীর ভিতরটায় যেতে পারেনি। অথচ পৃথিবীর উপরিতল থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছতে হলে দূরত্ব পার হতে হয় মাত্র ৬,৩৭৮ কিলোমিটার। সেজন্য অবশ্যই শিলামণ্ডল ভেদ করতে হেব, শিলামণ্ডলের নিচে যা-কিছু আছে তাও ভেদ করতে হবে।

এমনিতে মনে হতে পারে, যে-মানুষ মহাকাশ পেরিয়ে চারলক্ষ কিলোমিটার দূরের চাঁদে পৌঁছবার উপযোগী রকেট তৈরি করতে পেরেছে তার পক্ষে শিলামণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছবার উপযোগী যান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করাটা শক্ত নয়। বিজ্ঞানীরাও বলেন, কাজটা অসম্ভব নয়। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেন, নিকট ভবিষ্যতে এ-কাজটি সম্পন্ন হবে এমন সম্ভাবনা নেই। মহাকাশচারীরা থাকছেন, তাঁরা মহাকাশে অনুসন্ধান চালাবেন। গভীরসমুদ্রচারীরা থাকছেন, তাঁরা মহাসাগরের তলদেশে ঘুরে বেড়াবেন। কিন্তু যাঁদের বলা চলে 'শিলাচারী', যাঁরা পৃথিবীর গভীরে যেতে সমর্থ—তাঁদের দেখা পাওয়ার আশা আপাতত দুরাশা মাত্র।

এ-কাজে সমস্যা যে কতখানি সেটা একবার দেখা যেতে পারে। প্রথমেই হাতে থাকা চাই অতি-উন্নত এমন এক যান্ত্রিক ব্যবস্থা যার সাহায্যে হাজার-হাজার কিলোমিটার কঠিন শিলা ভেদ করা সম্ভব। কথাটা সহজে বলা গেল বটে কিন্তু কাজে অনেক জটিল ও দুরূহ। যে শিলার কথা বলা হচ্ছে তা শুধু কঠিন নয়, তাছাড়াও যতো বেশি গভীরে ততো বেশি উত্তপ্ত এবং ততো বেশি চাপের মধ্যে স্থিত। এত বেশি উত্তাপ ও এত বেশি চাপ যে কল্পনা করাও শক্ত। পৃথিবীর যতো গভীরে যাওয়া যায় ততো উত্তাপ বাড়ে। বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠতে পারে ২০০০ থেকে ২২২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড—অর্থাৎ, উত্তাপের এই মাত্রা সূর্যের উপরিতলের উত্তাপের প্রায় অর্ধেক। আর চাপ? পৃথিবীর কেন্দ্রে চাপের মাত্রা পৃথিবীর উপরিতলে বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে ৩৫ লক্ষ গুণ অধিক।

পৃথিবীর গভীরে যাবার জন্য গর্ত খোঁড়ার চেষ্টা অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আট-কিলোমিটারের বেশি গভীর গর্ত খোঁড়া বা ড্রিল করা সম্ভব হয়নি।

তাহলে পৃথিবীর গভীরে অনুসন্ধান চালাবার উপায় কী? শুনলে অবাক হতে হবে, এই অনুসন্ধান চালানো হয়েছে ভূমিকম্পের

সাহায্যে। এমনিতে ভূমিকম্প আমাদের কাছে একটা ভয়ের ব্যাপার, ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে, মানুষ প্রাণ হারায়, আরো অনেক ধ্বংসকার্য ঘটে। কিন্তু ভূমিকম্পের ভালো দিকও আছে। ভূমিকম্পের ঢেউ পৃথিবীর ভিতর সম্পর্কে অনেক খবর বিজ্ঞানীদের জানিয়েছে।
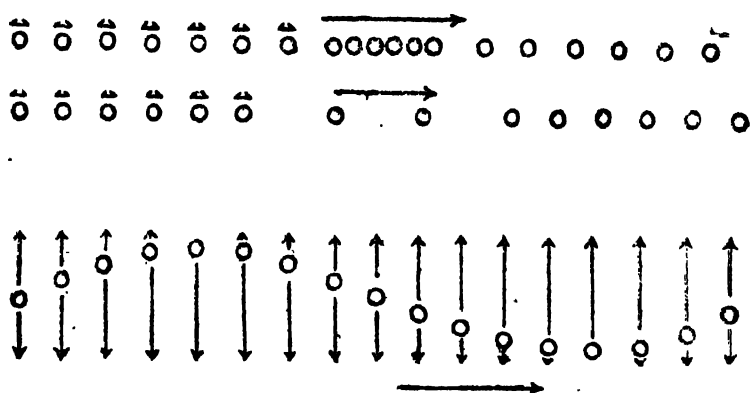
ভূমিকম্পের 'পি' ও 'এস' তরঙ্গের চলন।

ওপরের অংশে 'পি' তরঙ্গ। কণিকাগুলো প্রথমে রয়েছে ঠেলার মধ্যে, তার নিচে টানের মধ্যে। তীরচিহ্ন তরঙ্গের গতির দিকে। 'পি' তরঙ্গের চলনের সময়ে কণিকাগুলো সামনে-পিছনে কাঁপতে থাকে। যখন কোনো শিলার মধ্যে দিয়ে 'পি' তরঙ্গ চলে তখন শিলার কণিকাগুলো এমনি সামনে-পিছনে কাঁপে। কঠিন ও তরল উভয় বস্তুর মধ্যে দিয়েই 'পি' তরঙ্গ পার হয়। পৃথিবীর ভিতরে কোনো অংশ যদি তরল হয় তাতে 'পি' তরঙ্গ আটকায় না।

নিচের অংশে 'এস' তরঙ্গ। এবারে কণিকাগুলো কাঁপছে ওপরে-নিচে—অর্থাৎ, তরঙ্গের গতি যেদিকে (তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে) তার সমকোণে কণিকাগুলো ওঠানামা করছে। 'এস' তরঙ্গ যখন কোনো শিলার মধ্যে দিয়ে পার হয় তখন শিলার কণিকাগুলো তরঙ্গের চলার দিকের সমকোণে কাঁপতে থাকে। তার মানে, তরল পদার্থের মধ্যে দিয়ে 'এস' তরঙ্গের চলন সম্ভব নয়। পৃথিবীর ভিতরে কোনো অংশ যদি তরল হয় সেখানে এসে 'এস' তরঙ্গ থেমে যায়।

ভূমিকম্পের বিচার-বিশ্লেষণ করাটা তাই হয়ে উঠেছে আলাদা একটি বিজ্ঞান। তার নাম ভূকম্পবিদ্যা (Seismology)।

আমরা জানি, এক্স-রশ্মির সাহায্যে মানুষের শরীরের ভিতরটা দেখতে পাওয়া যায় —অথচ সাদা চোখে তা দেখা যায় না। ভূমিকম্প এই এক্স রশ্মির মতো। ভূমিকম্পের ঢেউ পৃথিবীর ভিতরকার কাঠামোকে এক্স-রশ্মিতে তোলা ছবির মতো স্পষ্ট করে তোলে।

ভূমিকম্পের ঢেউ পৃথিবীর ভিতর দিয়ে চলাচল করে, একথা আগেও জানা ছিল। আরো জানা গিয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন শিলার মধ্যে দিয়ে (অর্থাৎ, ভৌতিক ও রাসায়নিক গড়নের দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন) ভূমিকম্পের ঢেউয়ের চলার বেগও ভিন্ন হয়ে থাকে। ভূমিকম্প থেকে তিন ধরনের ঢেউ উঠে থাকে —মুখ্য (primary) বা 'পি' ঢেউ, গৌণ (secondary) বা 'এস' ঢেউ, লম্বা (long) বা 'এল' ঢেউ। 'এল' ঢেউ চলে পৃথিবীর উপরিতল দিয়ে —'পি' বা 'এস' ঢেউয়ের মতো পৃথিবীর ভিতর দিয়ে নয়।

'পি' ঢেউকে বলা হয় সংনমন (compression) ঢেউ বা টানা-ও-ঠেলা ঢেউ। শব্দের ঢেউয়ের মতো এই ঢেউ তৈরি হয় পরের-পর
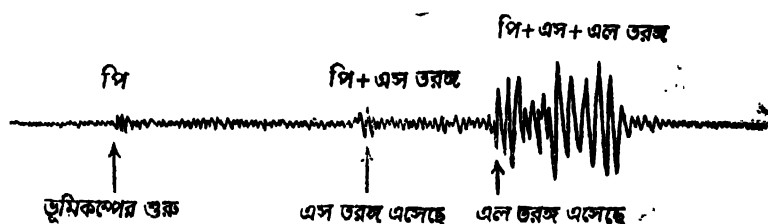
প্রথমে এসে পৌঁছেছে 'পি' তরঙ্গ—ভূমিকম্পের শুরু। তারপরে কিছুদূর পর্যন্ত শুধু 'পি' তরঙ্গের ছবি। তারপরে এসে পৌঁছেছে 'এস' তরঙ্গ। তারপরে কিছুদূর পর্যন্ত 'পি'+'এস' তরঙ্গের ছবি। তারপরে এসে পৌঁছেছে 'এল' তরঙ্গ। তারপরে কিছুদূর পর্যন্ত 'পি'+'এস'+এল' তরঙ্গের ছবি। তারপরে ভূমিকম্প শেষ।

টানা ও ঠেলার মধ্যে দিয়ে। 'এস' ঢেউকে বলা হয় তির্যক্

(transverse) বা ঝাঁকুনি (shake) ঢেউ। এই ঢেউ চলে যে-দিকে ঝাঁকুনি পড়ছে তার সমকোণে। 'পি' ঢেউয়ের বেগ অপেক্ষাকৃত বেশি (সেকেণ্ডে ৫.৫ থেকে ১৩.৮ কিলোমিটার)। 'এস' ঢেউ চলে আরো আস্তে (সেকেণ্ডে ৩.৫ থেকে ৭.২ কিলোমিটার)। এই কারণে সাইজ্মোগ্রাফ যন্ত্রে (ভূমিকম্প ধরার যন্ত্র) প্রথমে এসে পৌঁছয় 'পি' ঢেউ, তারপরে 'এস' ঢেউ।

ভূমিকম্পের ঢেউ হালকা শিলার মধ্যে দিয়ে যে-বেগে চলে, ঘন শিলার মধ্যে দিয়ে চলে তার চেয়ে বেশি বেগে। কাজেই ভূমিকম্পের ঢেউয়ের গতি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন কোন্ ধরনের শিলার মধ্যে দিয়ে ভূমিকম্পের ঢেউ এসেছে। তাছাড়া, ভূমিকম্পের ঢেউ বিক্ষিপ্ত হয়, বা, পৃথিবীর কোনো এক গভীরতায় পৌঁছে দিক বদলায়। যে-গভীরতায় ভূমিকম্পের ঢেউয়ের দিক বদলে যাচ্ছে সেখানে শিলাও বদলে যাচ্ছে —এটা ধরে নেওয়া চলে।

এমনিভাবে, পৃথিবীর ভিতর দিয়ে 'পি' ও 'এস' ঢেউয়ের চলাচল বিশ্লেষণ করে করে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অভ্যন্তরকে তিনটি স্পষ্ট এলাকায় ভাগ করেছেন : ভূত্বক (crust), ম্যাণ্টল (mantle), এবং কোর (core) বা অষ্ঠি।

একসময়ে ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, আমাদের এই ভূ-গোলকের ভিতরটা উত্তপ্ত গলিত শিলায় ভরা। গলিত শিলার গোলকটির উপরিভাগ আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়েছে এবং তার ফলে উপরিভাগটি কঠিন হয়ে গিয়েছে। গরম দুধ ঠাণ্ডা হতে থাকলে যেমন তার ওপরে সর পড়ে, তেমনি ঠাণ্ডা হতে হতে এই উত্তপ্ত গলিত শিলার গোলকটির ওপরে শিলাময় ত্বকের আবরণ পড়েছে। এই হচ্ছে ভূত্বক। মাঝে মাঝে এই ভূত্বকে ফাটল দেখা দেয়, তখন সেই ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসে ভিতরকার উত্তপ্ত গলিত শিলা। এই হচ্ছে আগ্নেয়গিরি। এতে যেন সেই ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণার পক্ষেই প্রমাণ পাওয়া গেল। এখন আমরা জানি, গোড়ার দিকের ভূ-বিজ্ঞানীদের এই ধারণা ভুল

ছিল। তবুও ভূত্বক কথাটি থেকেই গিয়েছে, ভূ-বিজ্ঞানীরা এখনো শিলামণ্ডলের বাইরে দিকের কঠিন অংশকে এই নামে অভিহিত করে থাকেন।

তারপরে ভূমিকম্পের ঢেউ থেকে পৃথিবীর ভিতরের অনেক খবর আমরা জেনেছি এবং ভূত্বক সম্পর্কেও সঠিক ধারণা করতে পেরেছি। প্রথমেই বলা দরকার, গোটা ভূ-গোলকটির তুলনায় ভূত্বকের খোলকটি (shell) বড়োই পাতলা। মহাসাগরের নিচে যে ভূত্বক রয়েছে তা মাত্র পাঁচ-কিলোমিটার পুরু। আর উঁচু পর্বতের নিচের ভূত্বক সত্তর কিলোমিটার পুরু। এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে ভূত্বকের শিলাগুলো সব একজাতীয় ও সমানভাবে সাজানো। বরং উলটো, সেখানে শিলায় শিলায় খুবই তফাত—ঘনত্বে, আকারে, গড়নে। মানুষের কাছে ভূত্বকের গুরুত্ব যদিও খুব বেশি, কিন্তু গোটা ভূ-গোলকের কাছে সামান্য। ভূ-গোলক যতোখানি জায়গা জুড়ে আছে তার একশো-ভাগের একভাগে আছে ভূত্বক।

মহাসাগরের নিচে যে ভূত্বক তার সঙ্গে মহাদেশ গঠনকারী ভূত্বকের যথেষ্ট তফাত আছে। সমুদ্রের নিচে ভূত্বকের গড়ন হয়ে থাকে একই রকমের—তার প্রায় সবটাই অতি-ঘন ব্যাসল্ট শিলায় গঠিত। এই
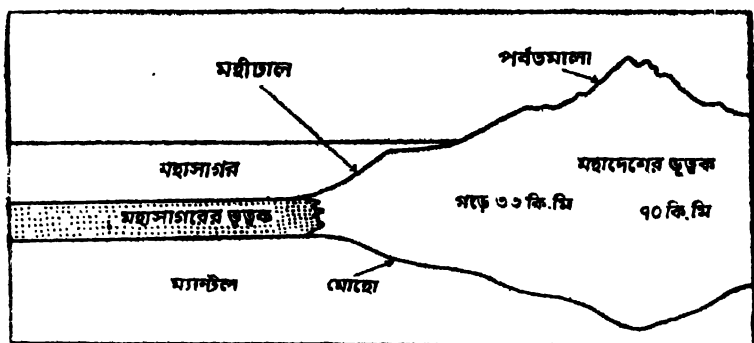
ভূত্বকের গড়ন। চিত্রে দেখানো হয়েছে ভূত্বকের বিভিন্ন অংশ কতখানি পুরু। ভূত্বক সবচেয়ে বেশি পুরু পর্বতমালার নিচে, সবচেয়ে কম পুরু মহাসাগরের নিচে।

ব্যাসল্ট শিলা আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা শিলার মতো। তুলনায় মহাদেশীয় ভূত্বক আরো জটিল। সেখানে আছে দুটি স্পষ্ট স্তর—ওপরের স্তরে হালকা রঙের গ্র্যানিট-সদৃশ শিলা আর নিচের স্তরে গাঢ় রঙের ঘন ব্যাসল্ট শিলা। ওপরের স্তরের গ্র্যানিট শিলা অপেক্ষাকৃত হালকা, তার ঘনত্ব ২˙৭, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে সিলিকা (silica) ও অ্যালুমিনা (alumina)। তাই এই শিলাকে বলা হয় সিয়াল (sial)। আর নিচের স্তরের ব্যাসল্ট শিলা অপেক্ষাকৃত ভারী, তার ঘনত্ব ২˙৮ থেকে ৩˙০, এমনকি কখনো কখনো
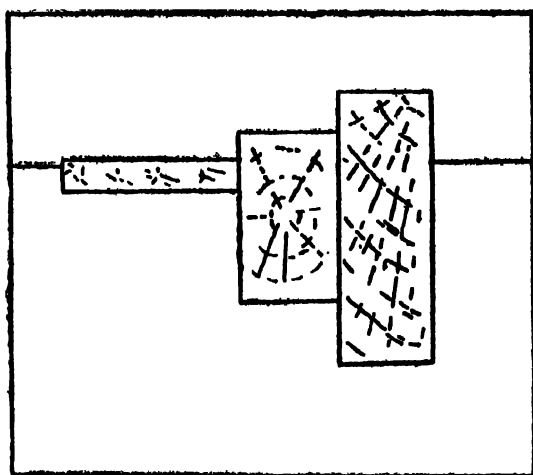
বিভিন্ন আকারের তিনখণ্ড কাঠ যদি জলের ওপরে ভাসানো যায় তাহলে দেখা যাবে ভারী খণ্ড জলের মধ্যে অনেক বেশি ডুবে থেকে ভাসছে, হালকা খণ্ড জলের মধ্যে অনেক কম ডুবে থেকে ভাসছে। ভূত্বকের বেলাতেও একই ব্যাপারে ঘটে। ওপরের দুটি চিত্রের মধ্যে মিল লক্ষ করার মতো। ভূত্বক গড়ে ৩৩ কিলোমিটার পুরু। কিন্তু পর্বতমালার নিচে এই ভূত্বক ৭০ কিলোমিটার পুরু—ভাসমান ভূত্বকের ক্ষেত্রে এমনটি হওয়াই স্বাভাবিক।

৩˙৪। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আছে সিলিকা ও ম্যাগনেসিয়া (magnesia)। তাই এই শিলাকে বলা হয় সিমা (sima)।

মহাদেশীয় ভূত্বকের তুলনায় মহাসাগরীয় ভূত্বক কম পুরু, এ-ঘটনা

কিছুকাল আগেও ভূ-বিজ্ঞানীদের কাছে গোলমেলে মনে হত। এখন জানা গিয়েছে, ভূত্বকের ওপরকার হালকা গ্র্যানিট শিলা তলাকার অপেক্ষাকৃত ভারী ব্যাসল্ট শিলার ওপরে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। আর এই ভাসমান শিলার কোনো কোনো অংশ অন্যান্য অংশের চেয়ে আরো বেশি গভীর পর্যন্ত ডুবে আছে। বিশেষ করে যেখানে পর্বত-মালা রয়েছে সেখানে পদার্থ ভেসে থাকার নিয়মেই নিচের ভূত্বক অনেক গভীর পর্যন্ত ডুবে যায়। মনে হতে পারে, ওপরের পর্বতের মতো নিচেও যেন একটা উল্‌টানো পর্বত রয়ে গিয়েছে। ওপরের পর্বতে যতোই ক্ষয় হয় নিচের পর্বতের গভীরতা ততোই কমতে থাকে (অর্থাৎ পর্বতটি যেন আরেকটু গা ভাসিয়ে ওঠে—ভাসমান পদার্থ হালকা হতে থাকলে যা হয়) এবং সরে-যাওয়া হালকা শিলার জায়গা দখল করে ভারী শিলা।

মোহো

ব্যাপারটা ঘটেছিল ১৯০৯ সালে। যুগোস্লাভিয়ার জাগ্রেব-এ ৮ই অক্‌টোবর তারিখে ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে, ভূমিকম্পের ঢেউ ধরা পড়েছে জাইস্‌মোমিটারে। অধ্যাপক আন্দ্রিয়া মোহোরোভিচিচ সেই সব নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখছিলেন। এই কাজ করতে গিয়েই তিনি একটি চমকপ্রদ আবিষ্কার করে বসলেন। সেটি এই : পৃথিবীর ভিতরে বিশেষ একটি গভীরতায় ভূমিকম্পের ঢেউ আচমকা দিক বদল করে ও আরো বেশি বেগে চলতে থাকে। ব্যাপারটাকে বোঝার জন্য তিনি আরো নানা জায়গা থেকে ভূমিকম্পের ঢেউয়ের ছবি পরীক্ষা করে দেখলেন। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত করলেন, ভূমিকম্পের ঢেউয়ের আচরণ যে বদলে যাচ্ছে তার কারণ—যে শিলার মধ্যে দিয়ে ভূমিকম্প পার হচ্ছে সেই শিলা বদলে যাওয়া। তিনি জানতে পারলেন, উপরিতলের কাছাকাছি এলাকায় ভূমিকম্পের ঢেউ আস্তে চলে, কিন্তু ভূত্বকের নিচের দিকে বিশেষ এক গভীরতায় ভূমিকম্পের ঢেউয়ের দিক বদল

হয় ও বেগ বাড়ে। অর্থাৎ, ধরে নিতে হয়, এখানেই ভূত্বকের এলাকা শেষ, শুরু হচ্ছে নতুন এক শিলার এলাকা। নতুন এই শিলা আরো নমনীয়, তারই ফলে এই এলাকায় ঢুকতে গিয়ে ভূমিকম্পের ঢেউয়ের দিক বদলে যায় ও বেগ বাড়ে।

এ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল, একটা জায়গায় গিয়ে ভূত্বক শেষ হচ্ছে। তার মানে, ভূত্বক প্রকৃতই আছে। আর একটা উপায় পাওয়া গেল ভূত্বক কতখানি গভীর তার একটা মাপ নেওয়ার। আর নিশ্চিতভাবে জানা গেল, ভূত্বক পার হলেই ভূমিকম্পের ঢেউয়ের চলাচলে একটা ছেদ এসে যায়। ছেদ ঘটানোর এই এলাকার নাম দেওয়া হল মোহোরোভিচিচ ছেদ বা সংক্ষেপে, মোহো।

আসলে কী ঘটে ? মোহো পার হলেই কেন ভূমিকম্পের ঢেউয়ের দিক বদলে যায় ও বেগ বাড়ে ? মোহো পার হয়ে ভূমিকম্পের ঢেউ ঢুকছে মধ্যমণ্ডলে বা ম্যান্টল-এ—দিক বদলে যাওয়া ও বেগ বাড়ার এটাই কারণ। ম্যান্টল কী ? অতি ঘন ও কঠিন শিলার একটি মণ্ডল, প্রায় ৩,০০০ কিলোমিটার পুরু। এই ম্যান্টল পার হবার সময়ে ভূমিকম্পের ঢেউয়ের কিছুটা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং আরো কিছু ব্যাপার ঘটে। এ-থেকে বোঝা যায়, ম্যান্টল-এ কতকগুলো স্তর আছে।

ম্যান্টল-এর শিলা কী ধরনের ? হাতেনাতে পরীক্ষা না করে বলা শক্ত। তবে মনে হয়, ম্যান্টল-এর শিলা আগ্নেয় শিলা, তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে লোহা ও ম্যাগনেসিয়াম। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, কোনো কোনো আগ্নেয়গিরির লাভায় ম্যান্টল-এর শিলা কিছুটা থেকে যেতে পারে, ম্যাগ্‌মার সঙ্গে ম্যান্টল-এর শিলা উঠে আসা অসম্ভব নয়। ম্যান্টল-এর শিলা সম্পর্কে যতোটুকু ধারণা করা হয়েছে তা এই আগ্নেয়গিরির শিলা পরীক্ষা করেই।

পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল

পৃথিবীর ভিতরে প্রায় তিনহাজার কিলোমিটার গভীরতায়

পৌঁছবার পরে ভূমিকম্পের ঢেউ থেকে আবার নতুন খবর পাওয়া যায়। ভূমিকম্পের ঢেউয়ের আচরণে আবার একটা বড়োরকমের বদল ঘটে। তার মানে ভূমিকম্পের ঢেউ এবারে পৃথিবীর কোর বা অষ্ঠিতে ঢুকতে চলেছে।

অষ্ঠি হচ্ছে পৃথিবীর কেন্দ্রীয় এলাকা, বিশাল এক গোলকের মতো, ম্যাণ্টল দিয়ে পুরোপুরি ঘেরা। পৃথিবীর এই অষ্ঠির ব্যাস প্রায় ৭,০০০ কিলোমিটার।

আমরা জেনেছি, ভূমিকম্পের ঢেউয়ে আছে দুটি ঢেউ—'পি' ও 'এস'। এই দুটি ঢেউ পৃথিবীর অষ্ঠির এলাকা থেকে দু-রকম খবর পাঠিয়েছে। তা থেকে জানা গিয়েছে, পৃথিবীর অষ্ঠি দু-ভাগে বিভক্ত—একটি বাইরের ভাগ বা বহিরাষ্ঠি (outer core), অপরটি ভিতরের ভাগ বা অন্তরাষ্ঠি (inner core)। বহিরাষ্ঠি প্রায়
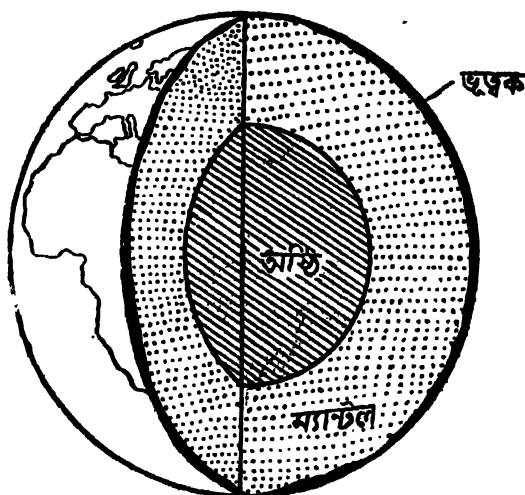
পৃথিবীর গড়ন

২,০০০ কিলোমিটার পুরু এবং সম্ভবত তরল শিলায় গঠিত অন্তরাষ্ঠির ব্যাস প্রায় ৩,০০০ কিলোমিটার এবং কঠিন শিলায় গঠিত

অষ্ঠি সম্পর্কে সমস্ত ধারণাই গড়ে তুলতে হয়েছে 'পি' ও 'এস' ঢেউয়ের পাঠানো খবর থেকে। 'পি' ঢেউ যেই-না বহিরাষ্ঠির মধ্যে ঢোকে তার বেগ আচমকা কমে যায়—যেন সেই ঢেউ একটা তরল পদার্থের মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছে। কিন্তু অন্তরাষ্ঠিতে পৌঁছেই 'পি' ঢেউয়ের বেগ আচমকা আবার বাড়ে—যেন সেই ঢেউ আবার পার হচ্ছে কঠিন পদার্থ। 'এস' ঢেউয়ের আচরণ আরো পরিষ্কার। 'এস' ঢেউ তরল পদার্থের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না—আর প্রকৃতই দেখা যাচ্ছে 'এস' ঢেউ পৃথিবীর অষ্ঠি পার হতে অপারগ। এ থেকে আরো নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে হয় বহিরাষ্ঠি তরল শিলায় গঠিত।

অষ্ঠির গঠন সম্পর্কে হয়তো জানা গেল, কিন্তু গড়ন? এটাও অনুমানের ব্যাপার। ধরে নেওয়া হয় অষ্ঠিতে আছে শতকরা আশিভাগ লোহা এবং বিভিন্ন পরিমাণে নিকেল, সিলিকন ও কোবাল্ট। কোনো কোনো উল্কাপিণ্ড বিশ্লেষণ করেও একই গড়ন পাওয়া গিয়েছে—আর উল্কাপিণ্ডকে সাধারণত ধরে নেওয়া হয় পৃথিবীর মতোই অন্য এক গ্রহের ভেঙে-যাওয়া টুকরো-টাকরা।

ভূমিকম্প

লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়ে আসছে কিন্তু প্রাচীনকালের মানুষদের এ-বিষয়ে কোনো ধারণা ছিল না। মাটি কেঁপে ওঠা এবং তার ফলে ভাঙচুর হওয়ার ঘটনা তারা অবশ্যই দেখত, কিন্তু সেটাকে তারা ব্যাখ্যা করত নানারকম কাহিনী তৈরি করে। যেমন, মঙ্গোলিয়ার লামারা ভাবত, পৃথিবীকে পিঠের ওপরে ধরে আছে একটি ব্যাঙ, এই ব্যাঙ ডেকে উঠলে বা নড়ে উঠলে পৃথিবী কেঁপে ওঠে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানরা ভাবত, পৃথিবী হচ্ছে গ্যাস-ভর্তি একটি ফাঁপা গোলক, কোনো কারণে ভিতরকার গ্যাস বাইরে বেরিয়ে

এলে যে চাপ তৈরি হয় তাতে মাটি কেঁপে ওঠে। হিন্দুরা ভাবত পৃথিবীকে মাথার ওপরে ধারণ করে আছে একটি সাপ—বাসুকি। এই সাপ নড়ে উঠলেই ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্প সম্পর্কে এমনি সব ব্যাখ্যা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের পুরা-কাহিনীতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্প নিয়ে গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ শুরু করেছেন মাত্র তিনশো বছর আগে। ভূমিকম্প কি-করে হয় সেটা তাঁরা অনেক আগেই ব্যাখ্যা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ভূমিকম্প কেন হয় তারা ব্যাখ্যা, তাঁরা মনে করেন, সম্প্রতিকালে যে প্লেট টেক্‌টোনিক তত্ত্ব উপস্থিত করা হয়েছে (বিষয়টি নিয়ে আমরা পরে আলোচনা তুলব) তার সাহায্যেই সম্পূর্ণভাবে দেওয়া গিয়েছে।

প্রথমে আমরা আলোচনা করব, ভূমিকম্প কী ?

মনে করা যাক একটা টেবিলের ওপরে কতকগুলো কাপ-ডিশ রয়েছে। এবারে যদি টেবিলের ওপরে একটা ঘুষি মারা যায় তাহলে কী ঘটে ? কাপ-ডিশগুলো ঝনঝন করে নড়ে ওঠে। অথচ কাপডিশ তো কেউ হাত দিয়ে নাড়ায়নি, তাহলে কেন কেঁপে উঠল ? ঘুষি মারার ফলে টেবিলের কাঠে কাঁপুনি উঠেছে, সেই কাঁপুনি চলে গিয়েছে কাপে ও ডিশে। এই যে ব্যাপারটি ঘটল, এও ভূমিকম্পেরই মতো।

ভূমিকম্প ঘটে মাটির নিচের শিলায় আচমকা ভাঙন ধরার ফলে। মাটির নিচে বলতে খুব একটা নিচে নয়, সাধারণত উপরিতল থেকে ত্রিশ কিলোমিটার গভীরতার মধ্যে। আরও গভীরের শিলাও ভাঙতে পারে, তবে ৭০০ কিলোমিটারের বেশি গভীরতায় কখনোই নয়।

শিলা যেখানে ভাঙে সেখান থেকে একটা শক্তি ভূমিকম্পের ঢেউয়ের আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। চারদিকের শিলার মধ্যে দিয়ে সেই ঢেউ পার হবার সময়ে শিলাগুলোকে কাঁপিয়ে দেয়। এই হচ্ছে ভূমিকম্প।

ভূমিকম্প কিভাবে ঘটে সেটা বোঝার আগে অন্য একটি বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনা তুলতে হবে। কোনো বস্তুকে টানলে

বা চাপ দিলে বা মোচড়ালে সেই বস্তুটি ভাঙতে পারে। সব বস্তুই কি ভাঙে? না। টানে বা চাপে বা মোচড়ে নানা বস্তুর নানা রকমের আচরণ। প্লাস্টিকের ওপরে চাপ দিলে প্লাস্টিক বেঁকে যায়, তারপরে সেই চাপ সরিয়ে নিলেও প্লাস্টিক বাঁকা বা বিকৃত অবস্থাতেই থাকে। একটুকরো রবারকে কিন্তু যতোই টানা বা চাপা বা মোচড় দেওয়া যাক, ছেড়ে দিলেই রবার আবার আগের মতো। রবার হচ্ছে ইলাস্টিক বা নমনীয়। একখণ্ড চকখড়ি কিন্তু এ-অবস্থায় সহজেই ভেঙে যায়। চকখড়ি ভঙ্গুর। এমন পদার্থও আছে যা শীতল অবস্থায় ভঙ্গুর, উত্তপ্ত অবস্থায় প্লাস্টিক।

এবারে বোঝা যাচ্ছে, কেন ৭০০ কিলোমিটারের নিচে শিলা কখনো ভাঙে না। সাতশো কিলোমিটারের নিচে উত্তাপ এত বেশি যে শিলা প্লাস্টিক অবস্থায় এসে যায়। আর সবচেয়ে বেশি ভঙ্গুর অবস্থায় থাকে উপরিতল থেকে ত্রিশ কিলোমিটার গভীরতার মধ্যে। উপরিতল থেকে ৫-৭ কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত পাললিক স্তর, তার নিচে ১৫-২০ কিলোমিটার পুরু গ্র্যানিট স্তর, তার নিচে ১৫-২০ কিলোমিটার পুরু ব্যাসল্ট স্তর। ভূমিকম্প সাধারণত ঘটে থাকে গ্র্যানিট স্তরে কিংবা ব্যাসল্ট স্তরে।

যে জায়গার শিলা ভেঙে গিয়ে ভূমিকম্প তৈরি হচ্ছে তাকে বলে ভূমিকম্পের কেন্দ্র (focus)। অনেকখানি জায়গা জুড়ে এই কেন্দ্র— একটি বিন্দু মাত্র নয়। আর কেন্দ্রের ঠিক ওপরে ভূ-পৃষ্ঠের যে জায়গাটি রয়েছে তাকে বলে ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র (epicentre)।

ভূমিকম্প কি করে ঘটে?

আমরা জেনেছি, মাটির অনেক নিচে যে-সমস্ত শিলা থাকে সেগুলোর ওপরে প্রচণ্ড চাপ ও টান পড়ে। তারই মধ্যে বহুকাল থাকতে থাকতে শিলা ক্রমশ বিকৃত হয় ও বেঁকে যায়। কিন্তু শিলা যতোই শক্তপোক্ত হোক, এমনকি যতোদূর শক্তপোক্ত হওয়া সম্ভব তাও যদি হয়, তাহলেও শেষপর্যন্ত এমন একটা সময় আসে যখন সেই

শিলায় ভাঙন ধরে। আর তখনই শুরু হয় চ্যুতি (fault)। শিলার দুই খণ্ড ফাটল-বরাবর বা চ্যুতির তল-বরাবর আচমকা সরে যেতে থাকে। তারই ফলে শিলার মধ্যে তৈরি হয় ঢেউয়ের মতো গতি। এই হচ্ছে ভূমিকম্পের ঢেউ।

তার মানে, ভূমিকম্প হতে হলে চ্যুতি হওয়া চাই। শিলার মধ্যে যখন ফাটল ধরে তখন সেই ফাটল বরাবর শিলাগুলো সরতে থাকে। এই হচ্ছে চ্যুতি। চ্যুতি নানারকমের হতে পারে। যেমনই হোক, তার পরিণতি ভূমিকম্প।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মাটির নিচের শিলায় হামেশাই চ্যুতি ঘটে চলেছে। কারণ পৃথিবীতে ভূমিকম্প তো আর কম হচ্ছে না। আমরা শুধু বড়ো বড়ো ভূমিকম্পগুলোর কথা মনে রাখি—যেখানে অনেক প্রাণহানি হয়, অনেক সম্পত্তি নষ্ট হয়—কিন্তু ছোটখাটো ভূমিকম্পের হিসেব কে রাখে। আর মহাসাগরের এলাকায় যতো ভূমিকম্প হয় তার অল্পই আমরা টের পাই।

তাই বলে একথাও ঠিক নয় যে সারা বিশ্বে যখন-তখন যেখানে-সেখানে ভূমিকম্প হয়ে চলেছে। ভূমিকম্পের হদিস নিতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, ভূমিকম্প ঘটে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট এক অঞ্চলে, বা, ভূ-কম্পন বলয়ে (seismic belts)। সবচেয়ে বড়ো বলয়টি রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে। পৃথিবীতে যতো ভূমিকম্প ঘটে তার শতকরা আশিভাগই ঘটে এই বলয়ে। লক্ষ করার বিষয়, এই বলয়েই রয়েছে নবীন পর্বতমালা ও আগ্নেয়গিরি। বলয়টির সীমানা নির্দেশ করতে হলে বলতে হয় পশ্চিমে দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার সীমান্ত, উত্তরে আলাস্কা, এবং এই বলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে জাপান, ফিলিপাইন, নিউজিল্যাণ্ড, ইন্দোনেশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ।

তারপরের বলয় ভূমধ্যসাগরীয় ও ট্রান্স-এশীয়। এই বলয়ের বিস্তৃতি আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা পার হয়ে

ভূমিকম্পের বলয়
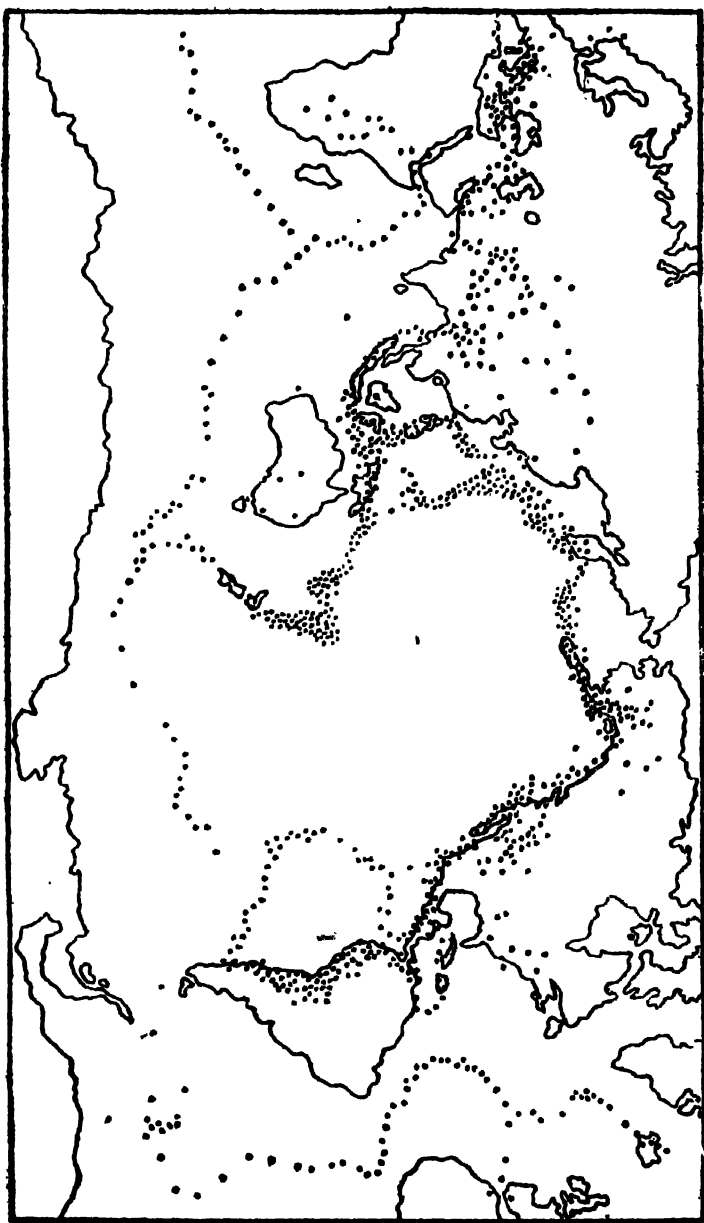
ইউরোপ-এশিয়ার দক্ষিণাংশ পর্যন্ত। পৃথিবীতে যতো ভূমিকম্প ঘটে তার ৯৫ শতাংশ এই বলয়ে ঘটে থাকে। বাকি ৫ শতাংশ ভূমিকম্প পৃথিবীর অন্যান্য অংশে।

ভূকম্পন বলয়ের বাইরে কোনো এলাকায় কখনো ভূমিকম্প হবে না এমন কথা কেউ বলে না। যে-কোন জায়গায়, যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো মাত্রার ভূমিকম্প ঘটে যেতে পারে।

ভূমিকম্পের মাপ

কোনো কোনো ভূমিকম্পকে বলা হয় 'ছোট', কোনো কোনো ভূমিকম্পকে 'বড়ো'। ধ্বংসকাণ্ড কম হলে ছোট, ধ্বংসকাণ্ড বেশি হলে বড়ো। কিন্তু এ-থেকে ভূমিকম্পের কোনো মাপ পাওয়া যায় না। মাঝারি গোছের ভূমিকম্পতেও অনেক সময়ে বিরাট ধ্বংসকাণ্ড হয়ে গিয়েছে। তাহলে ভূমিকম্পের মাপ কি-ভাবে নেওয়া হয়? ভূকম্প-বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের মাপ নিয়েথাকেন তার তীব্রতা বা মাত্রা দিয়ে।

কী পরিমাণ শক্তি ভূমিকম্প থেকে ছাড়া পাচ্ছে তাই দিয়েই ভূমিকম্পের মাত্রা মাপা হয়। এই মাপ নেওয়া হয় পুরোপুরি যন্ত্রের সাহায্যে, মানুষের বিচার বা ধারণার ওপরে কিছুমাত্র নির্ভর করা হয় না।

ভূমিকম্পের মাপ নেবার এই যন্ত্রটির নাম, আগে বলেছি, সাইস্‌মোমিটার। এই যন্ত্রে আছে স্প্রিং দিয়ে আটকানো একটি পেণ্ডুলাম, তার ডগায় একটি কলম, আর একটি ঘুরতে-থাকা ড্রাম। এই কলম ড্রামের কাগজের ওপরে সবসময়ে দাগ টেনে চলেছে। ভূমিকম্প না হলে কলমের টান সিধে, আর ভূমিকম্প হলে ভয়ানক রকমের খাঁজ কাটা-কাটা। যন্ত্রের ব্যবস্থা এইরকম যে মাটি কাঁপলেও কলম কাঁপে না, কিন্তু ড্রাম ওপরে-নিচে কাঁপে।

এই যন্ত্রে ভূমিকম্পের দাগ কতখানি বিস্তার নিয়ে ওঠা-নামা করেছে তা থেকেই ভূমিকম্পের মাপ ঠিক করা হয়। এজন্য যে স্কেল

ব্যবহার করা হয় তার নাম রিক্‌টার (Richter)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতত্ত্ববিদ রিক্‌টারের নামে এই নাম। তিনি সারা পৃথিবীর
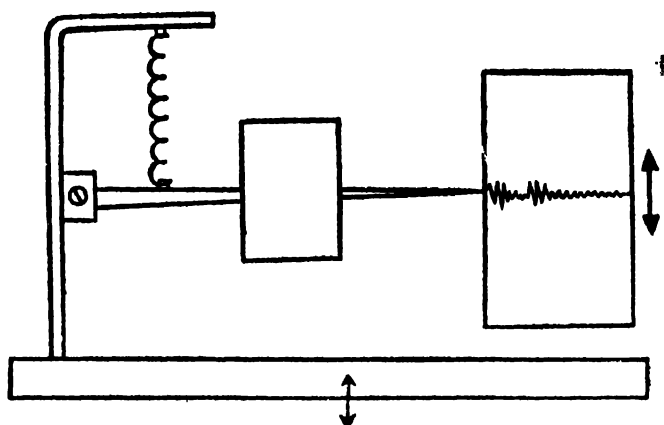
ভূমিকম্প মাপার যন্ত্র বা জাইস্‌মোমিটার। এই যন্ত্রে আছে স্প্রিং দিয়ে আটকানো পেণ্ডুলাম, তার সঙ্গে ভারী ওজন (ছবিতে আয়তক্ষেত্র এঁকে দেখানো হয়েছে), যেটি নড়ে না। ওজনের অন্যদিকে কলম, কলমের ডগা ড্রামের কাগজে ঠেকে আছে। ড্রামটি ঘোরে আর মাটি কাঁপলে ওপরে-নিচে কাঁপে। মাটি কাঁপলে যন্ত্রের ভূমিও ওপরে-নিচে কাঁপে। ছবিতে তীরচিহ্ন দিয়ে কাঁপুনি দেখানো হয়েছে।

পঞ্চাশ বছরের ভূমিকম্প বিশ্লেষণ করে ভূমিকম্পের মানের সঙ্গে ভূমিকম্পের শক্তির একটি সম্বন্ধ স্থির করেছেন। তাকেই বলে রিক্‌টার স্কেল। সম্বন্ধটি এই রকম :

ভূমিকম্পের মান	৭	৭·৫	৮·০	৮·৩	৮ ৫
শক্তি ($১০^{২৬}$ আর্গ) ×	·০৪	·৩২	২·৫	৭ ৯	২০

রিক্‌টার স্কেলে ভূমিকম্পের মান যদি হয় ৭ তাহলে ভূমিকম্পের শক্তি দাঁড়ায় $·০৪ \times ১০^{২৬}$ বা ৪×১০^{২৪} আর্গ। এই শক্তি ১০ লক্ষ টন টি-এন-টি (অতি বিস্ফোরক পদার্থ) বিস্ফোরণের সমান। তার মানে, হিরোশিমায় যে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ হয়েছিল তার চেয়ে ৫০গুণ অধিক শক্তিসম্পন্ন।

রিক্‌টার স্কেলে ২·৫ মানের ভূমিকম্প এতই সামান্য যে সম্ভবত টের পাওয়া যাবে না।

১৯০৬ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে সানফ্রান্‌সিস্‌কোয় যে ভূমিকম্প হয়েছিল তার মান ছিল রিক্‌টার স্কেলে ৮·৩। তার ফল হয়েছিল অতি ভয়াবহ। এই ভূমিকম্পের কারণ ছিল ক্যালিফোর্নিয়ার পশ্চিম সীমান্তে শত শত কিলোমিটার ধরে বিস্তৃত ভূ-ত্বকের একটি ফাটল—স্যান্‌ আন্‌ড্রিয়ান ফল্‌ট। এই চ্যুতির জন্য ক্যালিফোর্নিয়ায় অনেকবার ভূমিকম্প হয়ে গিয়েছে।

১৮৯৭ সালের ১২ই জুন তারিখে আসামের ভূমিকম্প ছিল আরো বড়ো—রিক্‌টার স্কেলে ৮·৫। শিলং সমেত প্রায় ৪১,৪০,০০০ বর্গ-কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে মাটি কেঁপে ওঠে। ৩৮,০৫,০০০ বর্গ-কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায়। শিলং, গোয়ালপাড়া, গৌহাটি, নওগাঁ ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে একটিও ইটের বাড়ি আস্ত ছিল না। প্রায় ১,৬০০ লোক প্রাণ হারায়। এই ভূমিকম্পের কারণ ছিল দুটি চ্যুতি—চেড্রাং ও সামিন। ভূমিকম্পের ফলে চেড্রাং নদীপথে অনেকগুলো জলপ্রপাত ও প্রায় ৩০টি হ্রদ তৈরি হয়েছিল।

১৮৬৯ সালের ১০ই জানুআরি তারিখে কাছাড়ে যে ভূমিকম্প হয়, রিক্‌টার স্কেলে তার মাত্রা ছিল ৮·৫। ২,৫০,০০০ বর্গ-কিমি অঞ্চল জুড়ে ভয়াবহ সেই ভূমিকম্প, শিলং-এর পাহাড়ের চুড়ো পর্যন্ত ফেটে গিয়েছিল। ভূমিকম্পের কারণ ডাউকি চ্যুতি।

১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুআরি তারিখে গাঙ্গেয় সমভূমি ও হিমালয়ের পাদদেশে প্রায় ৪৯,০০,০০০ বর্গ-কিমি অঞ্চল জুড়ে বড়োরকমের ভূমিকম্প ঘটে। দিল্লী থেকে কলকাতা এবং কাঠমাণ্ডু থেকে ভাগলপুর পর্যন্ত এলাকায় অনেক কিছু ধ্বংস হয়ে যায়। প্রাণহানি ১০,০০০। বিহারের বহু জায়গায় শত শত মিটার ফাটল দেখা দেয়, বহু জায়গায় জমি মোচড় খাবার ফলে রেললাইন ও সাঁকো

পর্যন্ত বেঁকে-ঢুমড়ে যায়। এই ভূমিকম্পের কারণ হিমালয়ের সীমান্ত চ্যুতি।

হিমালয় হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে নবীন পর্বত, ছ'কোটি বছরও বয়স হয়নি। হিমালয় এখনো বাড়ছে, অর্থাৎ হিমালয়ের ওপরের দিকে ওঠার একটা শক্তি ক্রিয়াশীল আছে। তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছে হিমালয় ও তার সংলগ্ন উত্তরের সমভূমির সংযোগস্থলে সীমান্ত চ্যুতি (boundary fault)। এই চ্যুতির জন্য ভারতে অনেক ভূমিকম্প ঘটে গিয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই প্রায় হাজারের মতো। এই সমস্ত ভূমিকম্পের শক্তি বিচার করে ভারতকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায় : (১) হিমালয় পর্বতমালা, তার পাদদেশ, আসাম (অতি ভূমিকম্পপ্রবণ), (২) গাঙ্গেয় সমভূমি (মাঝারি ভূমিকম্পপ্রবণ) এবং (৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি (ভূমিকম্পমুক্ত)। ভারতে সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হয় হিমালয় পর্বতে ও আসামে।

ভারতের শেষ বড়ো ভূমিকম্প ১৯৭৫ সালের ১৯শে জানুআরি তারিখে, হিমালয় প্রদেশের কিন্নরে ও লাহুল স্পিতি অঞ্চলে। ভূমিকম্পের মান রিক্টার স্কেলে ৭·৫১। এই ভূমিকম্পে পারা চু নদীতে ধস নামে, নদীর গতিপথ রুদ্ধ হয়ে গিয়ে হ্রদ তৈরি হয়, স্পিতি ও পারা নদীর দু-ধারে ৪০ কিমি দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে বহু গ্রাম ধ্বংস হয়।

সমুদ্রের নিচে ভূমিকম্প

ভূমিকম্প যেমন হয়ে থাকে স্থলভাগে, তেমনি হতে পারে সমুদ্রের নিচেও। হয়েও থাকে, এবং আমাদের কপাল ভালো যে পৃথিবীর বেশির ভাগ ভূমিকম্প ঘটে সমুদ্রতলে। মাঝে মাঝে এমনও হয় যে সমুদ্রতলের ভূমিকম্পের ফলে তৈরি হয়ে যায় বিশাল বিশাল ঢেউ— কখনো কখনো ১০ মিটার পর্যন্ত উঁচু ও ঘণ্টায় ৮০০ কিলোমিটার

পর্যন্ত গতিবেগসম্পন্ন। এই ঢেউয়ের নাম সুনামি (tsunami)। অতি ভয়ংকর এই সুনামি, সমুদ্রের জাহাজকে পর্যন্ত তুলে এনে ডাঙার ওপরে আছড়ে ফেলে, কিলোমিটারের পর কিলোমিটার গ্রাম-জনপদ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ঘরবাড়ি চুরমার করে, একটি প্রাণকেও রেহাই দেয় না।

আর ভূমিকম্প শুধু যে নিজেই ধ্বংস করে তা নয়, ধ্বংস ডেকে আনে। আগুন লাগা, জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়া, খাদ্য দূষিত হওয়া, স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়া – এসবও ঘটে এবং তার ফলে রোগ ও মহামারী শুরু হয়ে যায়। আরো আছে। অনেক সময়ে মানুষের মনকে বিকল করে দেয়, কেমন উদ্‌ভ্রান্তের মতো আচরণ করতে শুরু করে অনেকে।

আগে বলেছি, ভূমিকম্প শুরু হওয়া মাত্র ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে ভূমিকম্পের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে। জাইস্‌মোমিটারে প্রথম ধরা পড়ে অপেক্ষাকৃত মৃদু 'পি' ঢেউ, তারপরে বেশ জোরালো 'এস' ঢেউ, তারপরে অতি প্রচণ্ড 'এল' ঢেউ। শেষের ঢেউটি তৈরি হয় প্রথম দুটি ঢেউয়ের তৈরি করা শক্তি থেকে। এটি চলে উপরিতলের শিলার মধ্যে দিয়ে এবং অপেক্ষাকৃত আস্তে (সেকেণ্ডে ৩.৫ কিলোমিটার)। কোন্ ঢেউ কোন্ সময়ে পৌঁছচ্ছে তা বিচার করে ভূকম্পবিদরা স্থির করতে পারেন ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র কত দূরে। আর যদি তিনটি জাইসমোমিটার স্টেশন থেকে একই ভূমিকম্পের উপবৃত্ত নির্ধারণ করা হয় তাহলে উপবৃত্তের সঠিক ভৌগোলিক অবস্থান পর্যন্ত জানা সম্ভব। সেজন্য তিনটি বৃত্ত টানতে হবে—প্রতি স্টেশনকে কেন্দ্র করে আর সেই স্টেশন থেকে নির্ধারিত দূরত্বকে ব্যাসার্ধ করে এক-একটি বৃত্ত। বৃত্ত তিনটি যে বিন্দুতে ছেদ করে সেটি ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র।

ভূমিকম্পের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গিয়েছে, পৃথিবীতে যতো ভূমিকম্প ঘটে তার শতকরা ৮৫ ভাগ ঘটে ১৫ থেকে ৫০

কিলোমিটার গভীরতার মধ্যে। এইসব ভূমিকম্পের কেন্দ্র অগভীর (shallow)। কিন্তু এমন ভূমিকম্পও ঘটতে পারে যার কেন্দ্র থাকে ৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি (কিন্তু ৭০০ কিলোমিটারের কম) গভীরে। এই কেন্দ্র গভীর (deep)। আর ৫০ থেকে ৩০০
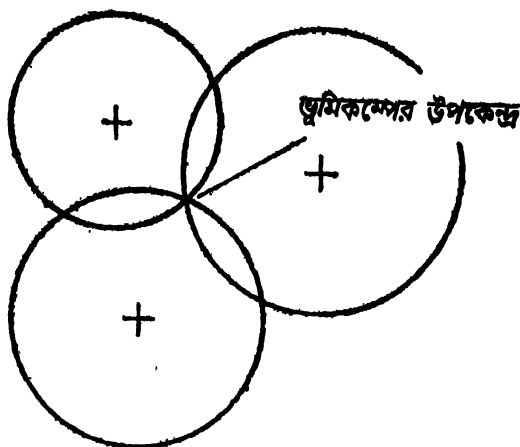
ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রের অবস্থান নির্ধারণ

কিলোমিটারের মধ্যে হলে মাধ্যমিক গভীর কেন্দ্র (intermediate focus)। জাইস্‌মোমিটারে ভূমিকম্পের রেখায় তিন জাতীয় ঢেউয়ের আগমনে সময়ের পার্থক্য হিসাব করে বিজ্ঞানীরা ভূমিকম্পের কেন্দ্রের গভীরতাও নির্ণয় করতে পারেন।

এতক্ষণের আলোচনায় জানা গেল, ভূমিকম্প কি করে হয় ও কোথায় হয়। আরো দুটি প্রশ্ন থাকে—কখন হয় এবং কেন হয়? ভূমিকম্প কেন হয়, এ-আলোচনায় আমরা পরে আসব (প্লেট টেক্‌টোনিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার সময়ে)। এখন দেখা যাক, ভূমিকম্প কখন হবে সেটা আগে থেকে জানা সম্ভব কিনা।

স্পষ্ট করে বলা দরকার, ঘূর্ণিবাত্যা বা সাইক্লোনের পূর্বাভাস যেমন নির্দিষ্টভাবে দেওয়া চলে, ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেবার তেমন কোনো উপায় এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। প্রযুক্তিবিদ্যার

সাহায্যে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেবার চেষ্টা করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা।

তবে দেখা গিয়েছে, ভূমিকম্পের আগে পশুপাখির আচরণ বদলে যায়। পাখি ডাক বন্ধ করে, ঘোড়া অস্থির হয়ে ওঠে, কুকুর করুণ স্বরে ডাকতে থাকে, ইত্যাদি। তাছাড়া, কুয়োর জল ওঠানামা করে, উষ্ণ প্রস্রবণে গ্যাসের ঘনত্ব বেড়ে যায় ও আরো নানা ভৌত কাণ্ডকারখানা ঘটে। কিন্তু এগুলো কোনোটাই সুনির্দিষ্ট লক্ষণ নয়। এসব লক্ষণ দেখে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেবার চেষ্টা কখনো সফল হয়েছে, কখনো হয়নি। চীনারা ১৯৭৫ সালের ৪ঠা ফেব্রুআরির লিওয়ানিঙ উপদ্বীপের হাইচাঙ ভূমিকম্পের সঠিক পূর্বাভাস দিয়েছিল, অথচ সেই একই বছরে পিকিং-এর ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিতে পারেনি (পিকিং-এর ভূমিকম্পে সাতলক্ষ লোক মারা যায়)।

মনে হয়, ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিয়ে মানুষজনকে আগে থেকে সতর্ক করা হচ্ছে—এমন দিন আসতে এখনো অনেক দেরি।

আগ্নেয়গিরি

আগ্নেয়গিরি হচ্ছে ভূত্বকে এমন এক রন্ধ্র বা ছিদ্র বা ফোকর যা দিয়ে গলিত শিলা, বাষ্প, গ্যাস ও আরও কিছু পদার্থ পৃথিবীর ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। গিরি মানে পর্বত, কিন্তু আগ্নেয়গিরি সবসময়ে পর্বত নাও হতে পারে। পাহাড় বা টিলার আকারেও আগ্নেয়গিরি দেখা গিয়েছে। ভারতে আগ্নেয়গিরি নেই।

আগ্নেয়গিরি সবচেয়ে বেশি আছে প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে। এত বেশি যে মনে হতে পারে প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে আগুনের একটি বলয় তৈরি হয়েছে, তাই বলা হয় অগ্নিবলয় (Ring of Fire)। এখন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি আছে প্রায় ৮০০।

পৃথিবীর কোন্ কোন্ জায়গায় জীবন্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে তার চিত্র (ফুটকি বসিয়ে দেখানো হয়েছে)
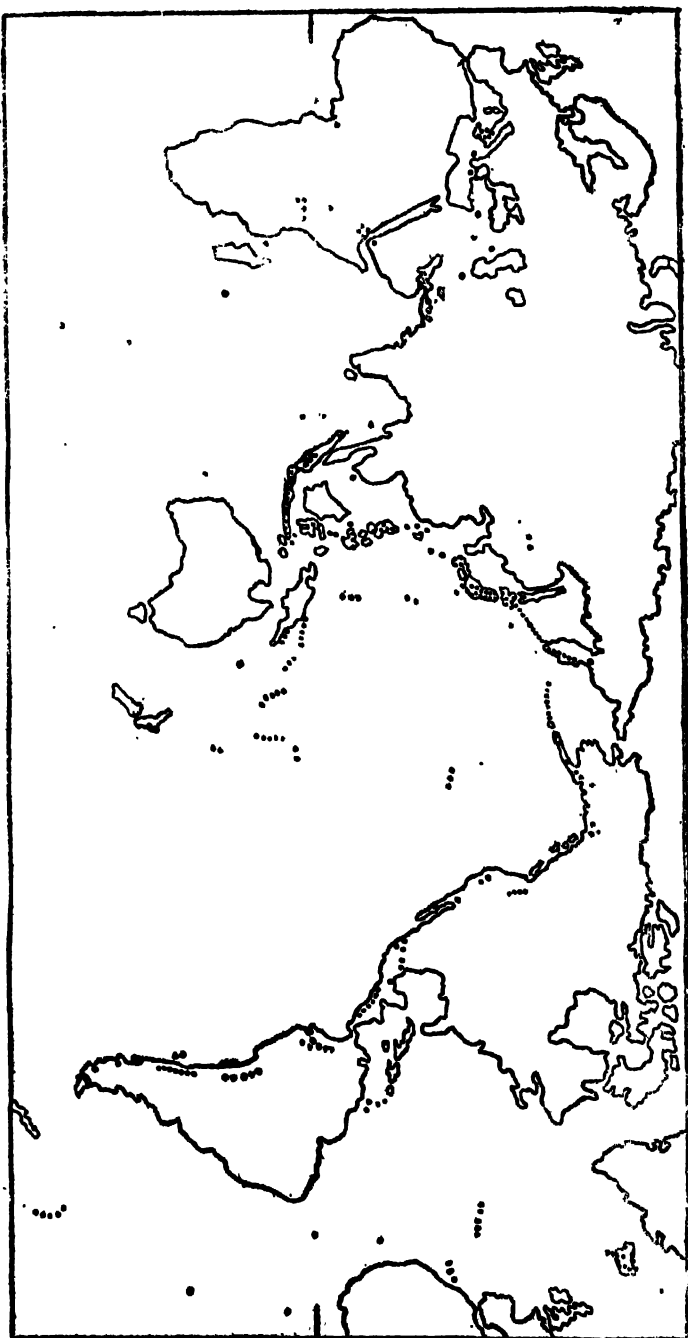
তার মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগই, অর্থাৎ পাঁচশোটি, রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে। শতকরা ১৪ ভাগ আছে ইন্দোনেশিয়ায়, ১৩ ভাগ আটলান্টিকে, ৭ ভাগ ভূমধ্যসাগর ও উত্তর এশিয়া মাইনর ও আফ্রিকায়, ১ ভাগ ভারত মহাসাগরে এবং প্রায় ৩ ভাগ প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী দ্বীপগুলিতে।

আগ্নেয়গিরিকে ইংরেজিতে বলে ভল্‌ক্যানো (volcano)। ইংরেজি কথাটি এসেছে ভাল্‌ক্যান (Vulcan) থেকে। ভাল্‌কান হচ্ছেন প্রাচীন রোমকদের অগ্নিদেবতা। ল্যাটিন গাথায় ইনি দেবতাদের লৌহকার বা কামার। ইনিই প্রথম তৈরি করেন বর্ম, ঢাল ও অন্যান্য অস্ত্র। ইনি যখন নেহাইয়ের ওপরে হাতুড়ি ঠোকেন, সেই শব্দই শোনা যায় আগ্নেয়গিরি থেকে আগুন বেরিয়ে আসার সময়ে। আমাদের পুরাকাহিনীর বিশ্বকর্মাকে নিয়ে কিন্তু এ-ধরনের কোনো গল্প তৈরি হয়নি।

আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ যে কী ধ্বংসকার্য ঘটাতে পারে, তার একটি দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। সেটি হচ্ছে ৭৯খ্রীষ্টাব্দে ইতালির ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ। তার ফলে দুটি প্রাচীন নগর অঙ্গার ও আগ্নেয়গিরির ভস্মের নিচে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গিয়েছিল। এই ঘটনা নিয়ে লেখা একটি উপন্যাসও আছে। ১৯০২ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডীজের একটি দ্বীপের একটি গ্রামের অস্তিত্ব আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা জ্বলন্ত গ্যাসের মেঘ সম্পূর্ণ লোপ করেছিল। ১৯৪৩ সালে মেক্‌সিকোর দুটি গ্রাম আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের নিচে সম্পূর্ণ চাপা পড়েছে।

এই সমস্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায় আগ্নেয়গিরি কী ব্যাপক ধ্বংস-কার্য ঘটাতে পারে। আরো বোঝা যায় আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণে কত বিভিন্ন রকমের উপকরণ তৈরি হয়ে থাকে।

তবে আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় গলিত শিলা, যার নাম লাভা (lava)। যে ছিদ্র থেকে লাভা বেরিয়ে আসে

সেটির চেহারা সাধারণত ওল্‌টানো ফানেলের মতো। এই ফানেলের নল যুক্ত থাকে ভূত্বকের নিচে গলিত শিলার একটি আধারের সঙ্গে। যে গলিত শিলাকে বলা হয় ম্যাগ্‌মা। পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে উঠে এসে এই ম্যাগ্‌মা জড়ো হয় এক-একটি আধারে—পৃথিবীর উপরিতল থেকে সাধারণত ৫০ কিলোমিটার গভীরতায়। ম্যাগ্‌মা সবসময়েই পৃথিবীর উপরিতলে উঠে আসার পথ খোঁজে। ফলে ভূত্বক যেখানে যেখানে সবচেয়ে দুর্বল সেখানেই ম্যাগ্‌মা ও তার গ্যাসের প্রচণ্ড চাপে ভূত্বকে ছিদ্র হয়ে যায়। তখন ভিতরকার ম্যাগ্‌মা বেরিয়ে আসে বাইরে। নির্গত এই ম্যাগ্‌মাকেই বলা হয় লাভা।

লাভা বা গলিত শিলা এতই উত্তপ্ত থাকে যে তার রঙ হয় লাল, বা আরও উত্তপ্ত হলে, সাদা। তবে এই গলিত তরল শিলা শেষ-

আগ্নেয়গিরির চুড়ো ওল্‌টানো ফানেলের মতো। তার সঙ্গে যুক্ত থাকে নল। চিত্রে একটি আগ্নেয়গিরিকে চিরে ভিতরকার চেহারা দেখানো হয়েছে।
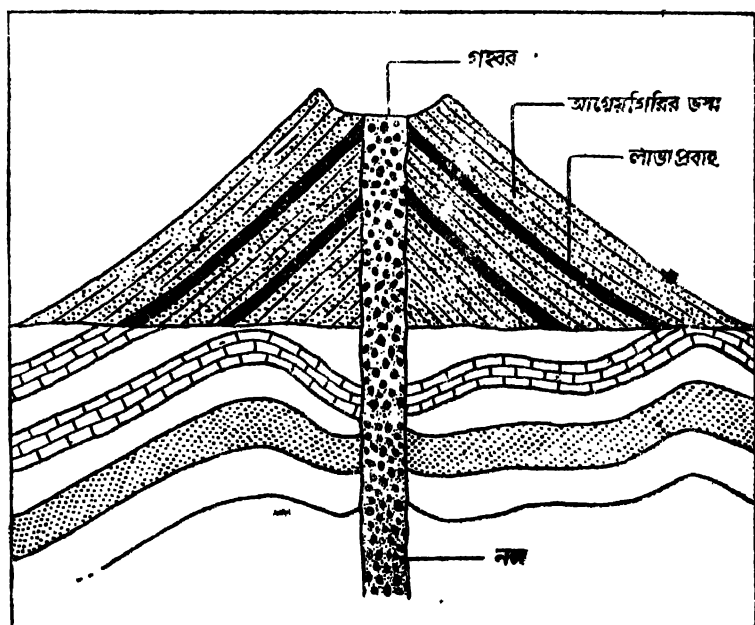
পর্যন্ত কঠিনতা লাভ করে এবং হয়ে ওঠে কঠিন আগ্নেয় শিলা। এই কঠিন আগ্নেয় শিলাকেও লাভা বলা হয়।

সব আগ্নেয়গিরি একরকমের নয়। ছিদ্রের নির্মাণে, উদ্‌গীরণের ধরনে, উৎপন্ন উপকরণের রকমে আগ্নেয়গিরি থেকে আগ্নেয়গিরির ভিন্নতা ঘটে থাকে। এমনকি গলিত লাভা পর্যন্ত সব আগ্নেয়গিরির একরকম নয়। কোথাও ময়দার তালের মতো থকথকে, কোথাও প্রায় জলের মতো তরল। থকথকে লাভার প্রবাহ খুবই আস্তে, সারা দিনে কয়েক শত সেন্টিমিটার মাত্র। কিন্তু তরল লাভার প্রবাহ ঘণ্টায় চল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। জলের মতো লাভার প্রবাহও উঁচু থেকে নিচুর দিকে।

গলিত লাভা কঠিনতা লাভ করার ফলে যে শিলা তৈরি হয় তাও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

বেশির ভাগ আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণে গ্যাসীয় পদার্থ থাকে। এই গ্যাসীয় পদার্থের বেশির ভাগটাই হচ্ছে জলীয় বাষ্প, তার সঙ্গে কম-বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড ও ক্লোরিন।

আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণের সময়ে বিস্ফোরণের মতো যে একটি ব্যাপার ঘটে তার মূলে আছে এই জলীয় বাষ্প। জল যখন বাষ্প হয় তখন তার আয়তন বেড়ে যায় প্রায় হাজার গুণ। প্রচুর পরিমাণ জল যদি অল্প সময়ের মধ্যে বাষ্পীভূত হয় তাহলে প্রচণ্ড শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। উদ্‌গীরণ যখন ঘটে তখন যে গ্যাস বেরিয়ে আসে তার সঙ্গে মিশে থাকে আগ্নেয়গিরির ধুলো আর ছাইয়ের কঠিন কণিকা। উদ্‌গীরণের সময়ে যে কালো ধোঁয়া দেখা যায় সেটা এই ভাবেই তৈরী।

আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণের সময়ে নানা ধরনের কঠিন পদার্থ বাইরে নিক্ষিপ্ত হতে পারে—ধুলোর কণা থেকে শুরু করে বিরাট বিরাট চাঁই পর্যন্ত।

আগ্নেয়গিরির এই যে লাভা তার উৎস কোথায়? প্রাচীনকালে মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবীর একেবারে ভিতর থেকে এই লাভা উঠে আসছে। অর্থাৎ, এখনকার বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ভিরকার যে-অংশকে বলছেন বহিরাষ্ঠি, যেটি আছে তরল অবস্থায়, সেখান থেকে। আমরা জানি, বহিরাষ্ঠির শুরু পৃথিবীর উপরিতল থেকে তিন-হাজার কিলোমিটারেরও বেশি গভীরে। লাভা এতখানি তলা থেকে গোটা ম্যান্টল পার হয়ে ভূত্বক পর্যন্ত উঠে আসতে পারবে, এমনটি হওয়া খুবই শক্ত। আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ শুরু হওয়ার আগে সাধারণত ভূমিকম্প হয়ে থাকে এবং মাটির তলা থেকে গুড়গুড় আওয়াজ শোনা যায়। এই দুয়ের উৎস অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে, তার গভীরতা পঞ্চাশ কিলোমিটারের বেশি নয়। তার মানে, শিলা গলিত হয় ম্যান্টল-এর ওপরের দিকে কিংবা ভূত্বকের নিচের দিকে, তারপরে সেই গলিত শিলা ভূত্বকে ফাটল ধরিয়ে বাইরে আসে।

শিলাকে গলাতে হলে প্রচণ্ড একটা উত্তাপ দরকার। আমরা জানি, পৃথিবীর যতো গভীরে যাওয়া যায় উত্তাপও ততোই বাড়ে। পঞ্চাশ কিলোমিটার গভীরে উত্তাপ এতই প্রচণ্ড হয় যে শিলা গলে যেতে পারে। কিন্তু পঞ্চাশ কিলোমিটার গভীরে চাপও হয় অতি প্রচণ্ড। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই অতি প্রচণ্ড চাপে শিলার পক্ষে গলিত অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু ভূত্বকে যদি ভাঙন ঘটে তাহলে চাপ কমে যায় ও শিলা গলিত হয়ে পড়ে।

কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন, শিলায় যখন ভাঙন ধরে বা ভাঁজ পড়ে, বা একটি শিলা অপর একটি শিলার গা ঘষে চলে যায়, তখন প্রচণ্ড উত্তাপ তৈরি হতে পারে। এই মতের সমর্থনে এমন কথাও বলা হয় যে আগ্নেয়গিরি দেখা যায় বিশেষ করে সেই এলাকাতেই যেখানে ভূত্বকের নড়চড়া বেশি এবং যেখানে পর্বত তৈরি হচ্ছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, আগ্নেয়গিরিগুলো পৃথিবীর উপরিতলে যেমন-

তেমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তা কিন্তু নয়। আগ্নেয়গিরির বলয় মোটামুটি ভূমিকম্পের বলয়ের পাশাপাশি চলেছে। অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি রয়েছে সমুদ্রের কাছে কিংবা এমন এলাকায় যেখানে শিলার ভাঙন ঘটেছে। তাই দেখা যায়, পৃথিবীর জীবন্ত আগ্নেয়-গিরিগুলোর বেশির ভাগই রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরের অগ্নিবলয়ে ও ভূমধ্যসাগবের এলাকায়।

এখনকার বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবীর ভিতরে উত্তাপ তৈরি হওয়ার অন্য একটি কারণও আছে। তা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় খনিজের বিকিরণ। তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার হয়েছে উনিশ শতকের শেষদিকে মাত্র। তার আগে পর্যন্ত পৃথিবীর ভিতরকার উত্তাপকে ব্যাখ্যা করার জন্য ধারণা করা হত, উত্তপ্ত গ্যাসীয় একটি গোলক ঠাণ্ডা হতে হতে তরল হয়েছে এবং তরল গোলকের বাইরের দিকে একটি আবরণ পড়েছে—ভিতরটা এখনো তরল। এই ধারণা বাতিল হবার পরে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ভিতরকার উত্তাপকে ব্যাখ্যা করেছেন তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে। দেখা গিয়েছে, বহু প্রকারের শিলায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে—যেমন, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, বিশেষ আকারের পটাসিয়াম। এই পদার্থগুলো ক্ষয় হয়ে হয়ে চলে এবং অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়। তারই ফলে উৎপন্ন হয় উত্তাপ। পৃথিবীর উপরিতলে এই উত্তাপ এত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যায় যে টের পাওয়া যায় না। কিন্তু পৃথিবীর গভীরে এই উত্তাপ জমা হয়ে চলে এবং ক্রমে প্রচণ্ড হয়ে থাকে। আগ্নেয়গিরির ছিদ্র দিয়ে যে গলিত শিলা বেরিয়ে আসে, সেটির গলন এই উত্তাপের জন্যই।

আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ দেখার সুযোগ কম লোকেই পায়। কিন্তু আগ্নেয়গিরির তৎপরতার ফলে যে ভূ-দৃশ্য রচিত হয় তা সহজেই দেখা যেতে পারে। উদ্‌গীরণ সব আগ্নেয়গিরির একরকম নয়, এবং এক-একরকমের উদ্‌গীরণের ফলে ভূখণ্ডের চেহারা এক-একরকমের হয়ে থাকে। এমনও হতে পারে, ভূত্বকের একটা ফাটল দিয়ে লাভা

বেরিয়ে আসছে। সেই লাভার প্রবাহ কিলোমিটারের পর কিলো-মিটার ছড়িয়ে পড়ে ও জমাট বেঁধে শক্ত হয়। তার ওপরে ছড়িয়ে পড়ে নতুন এক প্রবাহ, সেটিও জমাট বাঁধে। শেষপর্যন্ত দেখা যায়, হাজার-হাজার কিলোমিটার ব্যাপী ছড়ানো অঞ্চল শত-শত মিটার গভীর কঠিন লাভায় ঢেকে গিয়েছে। এমনি অঞ্চল পৃথিবীর নানা জায়গায় পাওয়া যায়, ভারতের দাক্ষিণাত্যেও আছে।

কখনো এমন হয় যে গোটা আগ্নেয়গিরিটি দেবে গিয়েছে বা উড়ে গিয়েছে। তখন সেখানে থেকে যায় প্রকাণ্ড একটি গহ্বর। তারপরে সেই গহ্বর জলে ভরাট হয় ও হ্রদ হয়ে ওঠে। এমনিভাবে তৈরি হওয়া গহ্বরকে বলা হয় কটাহ (caldera)।

কটাহের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্প্রতিকালের সবচেয়ে বড়ো উদ্‌গীরণ ঘটে গিয়েছে ক্রাকাতোয়ায় (জাভা), ১৮৮৩ সালে। কটাহ আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল, তারপরে ১৮৮৩ সালের ২৬শে আগস্ট তারিখে এমন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে যে ক্রাকাতোয়ার বেশির ভাগটাই অদৃশ্য হয়ে যায়। আর এতই প্রচণ্ডভাবে গুড়গুড় আওয়াজ হতে থাকে যে ১৬০ কিলোমিটার দূরে বাটাভিয়ায় পর্যন্ত ঘরবাড়ি কেঁপে ওঠে ও জানলা-দরজা ঝনঝন করে ওঠে। রাস্তায় গুলিগোলা চললে যেমন হয়, তেমনি। শহরের লোক সারা রাত জেগে কাটায়।

উদ্‌গীরণ সবচেয়ে বেশি হয় পরদিন সকাল দশটার সময়ে। বিশাল একটা মেঘ উঠে আসে ৮০ কিলোমিটার উঁচুতে। যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সেই মেঘকে ঠেলে তুলেছিল তার আওয়াজ শোনা যায় ৫,০০০ কিলোমিটার দূর থেকেও। আরও নব্বুই মিনিট পরে ৩৬ মিটার উঁচু একটা ঢেউ (সুনামি) ভারত মহাসাগরকে তোলপাড় করতে থাকে এবং জাভা ও সুমাত্রার তটভূমির ওপরে আছড়ে পড়ে। তার ফলে ২৯৫টি শহর পুরোপুরি বা অংশত ধ্বংস হয় এবং ৩৬,০০০ লোক মারা পড়ে। একটি ওলন্দাজ জাহাজকে সমুদ্র থেকে তুলে ২·৪

কিলোমিটার দূরে ১০ মিটার উঁচু ডাঙাজমির ওপরে আছড়ে ফেলা হয়েছিল।

সারা দিনে আরও কয়েকবার উদ্‌গীরণ হয়। প্রচুর পরিমাণ ছাই বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তার ফলে দিনের আলো চাপা পড়ে গিয়ে অন্ধকার নেমে আসে।

উদ্‌গীরণ শেষ হবার পরে দেখা যায়, মূল ভূখণ্ডের তিনভাগের দু-ভাগ মুছে গিয়েছে। আগে যেখানে ছিল ১২০ থেকে ৪২০ মিটার উঁচু জমি (সমুদ্রের উপরিতলের উপরে), এখন সেখানে ২৭০ মিটার গভীর (সমুদ্রের উপরিতলের নিচে) বিশাল গহ্বর।

উত্তর আমেরিকার একটি কটাহের নাম ক্রেটার লেক। গহ্বরটির মাপ এপারে-ওপারে ১০ কিলোমিটার, গভীরতায় ৬০০ মিটার। এখানে যে আগ্নেয়গিরি ছিল তার নাম মাউন্ট মাজামা। হাজার দশেক বছর আগে এটি জীবন্ত ছিল।

ভূ-বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর আগ্নেয়গিরিগুলোকে তিনভাগে ভাগ করেছেন—জীবন্ত, ঘুমন্ত, মৃত। উদ্‌গীরণ হয়ে চলেছে বা মাঝে মাঝে হচ্ছে, সেই আগ্নেয়গিরি জীবন্ত। উদ্‌গীরণ হয়েছিল কিন্তু এখন আর হচ্ছে না, সেই আগ্নেয়গিরি ঘুমন্ত। যতোদূর ইতিহাস জানা যায় উদ্‌গীরণ আদৌ হয়নি, সেই আগ্নেয়গির মৃত। বিজ্ঞানীদের এই ভাগ-বিভাগ সবসময়ে যে ঠিক থাকে তা নয়। মৃত আগ্নেয়গিরিও হঠাৎ জীবন্ত হয়ে ওঠে।

তবে জীবন্ত আগ্নেয়গিরিগুলোর বেলায় যেন একটা হিসেব পাওয়া যাচ্ছে, কতকাল পরে-পরে উদ্‌গীরণ হতে পারে। মাউন্ট এট্‌না, মাউন্ট ভিসুভিয়াস ও এমনি আরো কয়েকটি আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ সম্পর্কে আগে থেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে মনে হয়।

এক্ষেত্রে একটি বড়ো সহায় হচ্ছে জাইস্‌মোমিটার। জীবন্ত আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি এলাকায় যদি পর-পর ভূমিকম্প হতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে উদ্‌গীরণ হতে আর দেরি নেই। এই খবর

জানার জন্য বিজ্ঞানীদের হাতে আরো যন্ত্র আছে। কিন্তু কোনো যন্ত্রই এখনো পর্যন্ত এত সঠিক নয় যে আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণ সম্পর্কে আগে থেকেই জানা সম্ভব।

বয়সের মাপকাঠি

পৃথিবীকে যে-চেহারায় এখন আমরা দেখছি সেটা চিরকালের নয়। এমনকি সমুদ্র ও মহাদেশের যেটি যেখানে দেখছি তাও ঠিক ঠিক সেখানেই ছিল না। পৃথিবীর উপরিতলে কত-যে বদল হয়েছে, এখনো হচ্ছে ও হতে থাকবে, তার যেন শেষ নেই। সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত অনবরত নতুন করে তৈরি হচ্ছে, অনবরত ছড়িয়ে পড়ছে।

পৃথিবীর উপরিতলের ভাঙাগড়া ও অদলবদল সম্পর্কে বলতে হলে প্রথমেই ঘটনাগুলোকে সময়ের দিক থেকে সাজানো দরকার। সেজন্য চাই পৃথিবীর ইতিহাসে সময়ের আগে-পরে ধরার জন্য একটা মাপকাঠি। ভূ-বিজ্ঞানীরা যে মাপকাঠি তৈরি করেছেন সেটি ধরাই আমাদের পক্ষে সুবিধের। এটিকে বলা হয় ভূতত্ত্বীয় কাল-বিভাগ, সারা বিশ্বে এটি স্বীকৃত।

পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪৬০ কোটি বছর। এই গোটা সময়কালকেই কতকগুলো ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। সময় অবশ্য কখনো থেমে থাকেনি, কিন্তু ভূ-বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ইতিহাস উদ্ধার করেছেন যে-সব শিলাস্তর থেকে তার মধ্যে ছেদ আছে। তারই ভিত্তিতে ভূতত্ত্বীয় কালবিভাগ। প্রথমে কয়েকটি বড়ো আকারের বিভাগ— অধিযুগ (Era)। অধিযুগ বিভক্ত যুগে (Period)। যুগ বিভক্ত উপযুগে (epoch)। শেষে থাকে বয়স। সারণির চেহারায় ভূতত্ত্বীয় কাল-বিভাগটি এই রকম :

ভূতত্ত্বীয় কাল-বিভাগ

অধিযুগ	যুগ	উপযুগ	বয়স (কোটি বছরে)
	(গ) কোয়াটারনারি	গ$_২$ হলোসিন	---
		গ$_১$ প্লেইস্টোসিন	০.১
	(খ) নিওজিন বা	খ$_২$ প্লায়োসিন	০.৮
(৪) নবজীবীয়	ঊর্ধ্ব টার্শারি	খ$_১$ মায়োসিন	২.৫
	(ক) প্যালিওজিন বা	ক$_৩$ অলিগোসিন	৩.৮
	নিম্ন টার্শারি	ক$_২$ ইয়োসিন	৬ ৫
		ক$_১$ প্যালিওসিন	৮ ০
	(গ) ক্রীটেশাস		১৪.০
(৩) মধ্যজীবীয়	(খ) জুরাসিক		২০.০
	(ক) ট্রায়াসিক		২৪.০
	(চ) পার্মিয়ান		২৯.০
	(ঙ) কার্বনিফেরাস	ঙ$_২$ পেনসিলভ্যানিয়ান ঙ$_১$ মিসিসিপিয়ান	৩৫ ০
	(ঘ) ডেভনিয়ান		৪১.০
(২) পুরাজীবীয়	(গ) সিলুরিয়ান		৪৪.৫
	(গ) অর্ডোভিসিয়ান		৫০ ৫
	(ক) কেম্ব্রিয়ান		৬০ ৫
	(খ) নব প্রাক্‌কেম্ব্রিয়ান (অ্যালগংকিয়ান)		২০০.০
(১) প্রাক্‌কেম্ব্রিয়ান	(ক) পুরা প্রাক্‌কেম্ব্রিয়ান (আর্কিয়ান)		৩৬০.০ অপেক্ষা বেশি

ওপারের সারণিতে শেষ স্তম্ভে বয়সের হিসেব দেওয়া হয়েছে। এই বয়েস কি-ভাবে হিসেব করা হয়? সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ৩৬০ কোটি বছর পর্যন্ত সময়কালকে হিসেবের মধ্যে আনা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই হিসেব বার করেছেন শিলার বয়স থেকে। আগেকার কালে এই হিসেব করা হত এক-একটি যুগের শিলার স্তর জমতে কতখানি সময় লাগতে পারে সে-সম্পর্কে মোটামুটি একটা আন্দাজ থেকে। পৃথিবীর বয়স হিসেব করা হত অন্য নানা উপায়ে। সহজেই বোঝা যায়, বিচার যেখানে কোটি কোটি বছর নিয়ে সেখানে বয়সের হিসেব ঠিকমতো ধরাটা অতি জরুরী বিষয়।

বয়সের হিসেব করতে গিয়ে তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার হবার আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা অনেকটা হাতড়ে বেড়িয়েছেন বলে মনে হয়। বিশপ আশার যখন বলেছিলেন পৃথিবীর জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে, বাইবেলের কাহিনীর ভিত্তিতে তৈরি করা সেই হিসেব নাকচ করার মতো হাতিয়ার বিজ্ঞানীদের হাতে ছিল না। স্বয়ং নিউটনও এই হাতিয়ারের সন্ধান দিতে পারেননি। জেম্‌স হাটন (১৭২৬-৯৭) বলেছিলেন, 'এই জগৎ-ব্যাপারের কোথায় যে শুরু তার কোনো চিহ্ন আমি পাইনি, কোথায় যে শেষ তার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখিনে।' এই সময় থেকে তো বটেই, তার আগেও অনেকেই ধারণা করতে পেরেছিলেন যে বাইবেলের ভিত্তিতে পৃথিবীর বয়স হিসেব করাটা ভুল। ১৭৬০ সালে তৈরি করা একটা হিসেবে বলা হয়েছিল, পৃথিবীর বয়স সম্ভবত ৭৫,০০০ বছর।

১৭৪৯ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী কোঁৎ দ্য বুফোঁ বাইবেলের কাহিনীকে একটা বৈজ্ঞানিক মোচড় দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বললেন, বাইবেলে জগৎ-সৃষ্টির যে ছ'টি দিনের কথা বলা হয়েছে সেটা সম্ভবত ছ'টি দীর্ঘ যুগ। কিন্তু গির্জার চাপে তাঁকে এই ধর্ম-বিরোধী উক্তি অস্বীকার করতে হয়েছিল।

পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে সঠিক ধারণা করাটা আরো জরুরী হয়ে দেখা দিল চার্লস ডারউইনের (১৮০৯-৮২) বিবর্তনবাদের তত্ত্ব * প্রকাশিত হবার পরে। বিবর্তনবাদ মানতে হলে জীবজগতের ক্রম-বিকাশের জন্য অনেক অনেক বড়ো মাপের সময়কাল ধরা দরকার, যা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের বিজ্ঞানীরা ধারণায় আনতে পারতেন না। আর ঠিক এই সময়ে তখনকার বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন (১৮২৪-১৯০৭) আঁক কষে মোক্ষমভাবে প্রমাণ করে দিলেন যে সূর্যের বয়স ২ কোটি বছরের বেশি হতে পারে না। আর পৃথিবীর বয়স নিয়ে দুটি আলাদা উপায়ে হিসেব করে প্রমাণ করে দিলেন পৃথিবীর বয়স আরো অনেক কম। লর্ড কেলভিনের মতো পদার্থবিজ্ঞানীর হিসেবকে নাকচ করতে পারে, এমন ক্ষমতা অন্য কোনো বিজ্ঞানীর ছিল না। লর্ড কেলভিন বলতেন, 'যদি তুমি মাপ নিতে না পারো তাহলে তোমার জ্ঞান হয় সামান্য ও প্রয়োজনের চেয়ে কম।' লর্ড কেলভিনের মাপজোক ছিল নিখুঁত, তাঁর হিসেবে ভুল হবে এমন সম্ভাবনা ছিল না।

পৃথিবীর বয়স হিসেব করতে গিয়ে লর্ড কেলভিনের একটি উপায় ছিল এইরকম : উত্তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হতে হতে পৃথিবী আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে, তাহলে তার জন্য কতখানি সময় লাগতে পারে ? আঁক কষে দেখালেন, বড়ো জোর একাকোটি বছর। চার্লস ডারউইন ও তাঁর ভূতত্ত্ববিদ সমর্থকরা মনে মনে বুঝতেন যে পৃথিবীর বয়স আরো অনেক বেশি। কিন্তু লর্ড কেলভিনের হিসেবে ভুল কোথায়, তা ধরার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না।

ভুল ধরা পড়েছিল আরো পরে। সূর্য সম্পর্কে লর্ড কেলভিনের

* এই তত্ত্বে বলা হয়েছে যে প্রজননগত মিউটেশন ঘটার ফলে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব হয়ে থাকে। প্রজননগত মিউটেশনের ফলে পূর্বপুরুষের চেহারা থেকে ভিন্নাবস্থা ঘটে। যে-সব অবস্থা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার পক্ষে সহায়ক সেগুলো টিকে থাকে। এই হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন।

পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না যে সূর্যের মধ্যে শক্তি উৎপন্ন হয় নিউক্লিয়ার ফিউসন ঘটার ফলে, যে-কারণে আগামী বহু শত-কোটি বছর ধরে সূর্য এমনি জ্বলন্ত অবস্থায় থাকবে। আর পৃথিবীর ঠাণ্ডা হওয়া সম্পর্কে লর্ড কেলভিন কল্পনাও করতে পারতেন না যে পৃথিবী আদৌ ঠাণ্ডা হচ্ছে কিনা সন্দেহ। কেননা, পৃথিবীর চারদিকে ছড়ানো রয়েছে অজস্র তেজস্ক্রিয় শিলা যা থেকে বিকিরণ ঘটে ও উত্তাপ ছড়ায়।

১৮৯৯ সালে আইরিশ পদার্থবিজ্ঞানী জন জলি অভিনব এক উপায়ে পৃথিবীর বয়স হিসেব করতে চেয়েছিলেন। তা হচ্ছে, সমুদ্রের জলে মোট কী পরিমাণ লবণ আছে তার হিসেব নেওয়া, পৃথিবীর নদীগুলো দিয়ে মোট কী পরিমাণ লবণ প্রতি বছরে সমুদ্রে এসে পড়ে তার হিসেব নেওয়া। প্রথম সংখ্যাটিকে দ্বিতীয় সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই বেরিয়ে পড়ে সমুদ্রের বয়স। আর পৃথিবীর বয়স সমুদ্রের বয়সের চেয়ে কিছু বেশি। পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের মোট জলের পরিমাণ প্রায় ১৫০ কোটি ঘন-কিলোমিটার। এখনকার সমুদ্রে লবণ আছে শতকরা ৩ ভাগ। এ-থেকে হিসেব করা চলে, এখনকার সমুদ্রে লবণের পরিমাণ চারশো-কোটি কোটি টনেরও বেশি। পৃথিবীর নদীগুলো দিয়ে বছরে প্রায় ৪০ কোটি লবণ এসে সমুদ্রের জলে মিশছে। তার মানে সমুদ্রের বয়স ১০ কোটি বছর। হিসেবটা সহজ কিন্তু এই হিসেবের মধ্যে এত কিছু ধরে নেওয়া হয়েছে যে সহজেই তা বেঠিক হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা এখন আর এই হিসেবকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না।

অন্য একদল বিজ্ঞানী পৃথিবীর বয়স বার করতে চেষ্টা করেছিলেন পৃথিবীর সমস্ত শিলাস্তর জমতে কত সময় লেগে থাকতে পারে সেই হিসেব থেকে। যেমন, ধরা যাক, ৩০ মিটার পুরু বালিপাথর তৈরি হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পলল জমতে কত সময় লাগতে পারে? এ থেকে অবক্ষেপণের হার (অর্থাৎ, কত সময় নিয়ে কত পলল জমছে তার হিসেব) জানা যেতে পারে। এখন যদি জানা যায়

প্রথম পলল জমতে শুরু হওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত কতখানি পুরু শিলাস্তর তৈরি হয়েছে তা থেকে বয়সের হিসেব পাওয়া যায়। এই উপায়ও নির্ভরযোগ্য নয়। তার কারণ, যে-সব তথ্যের ওপরে নির্ভর করে এই হিসেব করতে হচ্ছে সেই তথ্যগুলো নির্ভুলভাবে পাওয়াটাই প্রায় অসম্ভব।

এখনকার ভূ-বিজ্ঞানীরা শিলার বয়স ঠিক করেন তেজস্ক্রিয়তার হিসেব থেকে। এটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে ভূত্বকে কিছু কিছু খনিজে থেকে গিয়েছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ - যথা, ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম। এই তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো নিজের থেকেই ভেঙে ভেঙে পড়ে। এই ভাঙন সবসময়ে একই হারে। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাপমাত্রা যাই হোক, চাপ যাই হোক, অন্য কোনো ভৌত অবস্থা যাই হোক, ভাঙনের হার একই রকম থেকে যায়।

সবচেয়ে বেশি কাল ধরে ভাঙন চলে ইউরেনিয়ামে। খানিকটা ইউরেনিয়াম যদি থাকে এবং তার মধ্যে যদি ৪৫০ কোটি বছর ধরে ভাঙন চলতে থাকে তাহলে মূল তেজস্ক্রিয়তার মাত্র অর্ধেক থেকে যায়। এই সময়কালকে বলা হয় অর্ধ-জীবন। তারপরে আরো ৪৫০ কোটি বছর যদি পার হয় তাহলে যে তেজস্ক্রিয়তা থেকে গিয়েছে তার অর্ধেক চলে যায়। এমনি চলতে থাকে। ভাঙন চলতে চলতে ইউরেনিয়াম শেষপর্যন্ত রূপান্তরিত হয় সীসেতে। আর এই ভাঙন চলবার সময়ে নিঃসৃত হয় হিলিয়াম গ্যাস ও তার সঙ্গে উত্তাপের আকারে শক্তি। ইউরেনিয়ামের ভাঙনের ব্যাপারটাকে এইভাবে প্রকাশ করা হয় :

ইউরেনিয়াম → সীসে + হিলিয়াম + শক্তি

ইউরেনিয়ামের বেলায় দেখা গিয়েছে তেজস্ক্রিয় ভাঙন ঘটতে ঘটতে যেমন পাওয়া যায় সাধারণ সীসে, তেমনি তার তিনটি আইসোটোপ*—সীসে ২০৬, সীসে ২০৭, সীসে ২০৮। ব্যাপারটাকে এইভাবে প্রকাশ করা হয় :

ইউরেনিয়াম ২৩৮→সীসে ২০৬

ইউরেনিয়াম ২৩৫→সীসে ২০৭

থোরিয়াম ২৩২→সীসে ২০৮

আজকাল সূক্ষ্ম মাপজোক নেবার এমন সব যন্ত্রপাতি বিজ্ঞানীদের হাতে এসেছে যার সাহায্যে তাঁরা আইসোটোপগুলোর আলাদা মাপ নিতে পারেন। এবং তা থেকে ধরে নিতে পারেন বয়সের হিসেব।

*আইসোটোপ বুঝতে হলে প্রথমে জানা দরকার পরমাণুর গঠন। পরমাণুর গঠন এই রকম: পরমাণুর কেন্দ্রে আছে কেন্দ্রীণ বা নিউক্লিয়াস। তাকে ঘিরে রয়েছে সূর্যকে ঘিরে থাকা গ্রহের মতো এক বা একাধিক নেগেটিভ চার্জবিশিষ্ট ইলেকট্রন। পরমাণুর ভর প্রায় সবটাই রয়েছে নিউক্লিয়াসের মধ্যে। নিউক্লিয়াসের গঠনে আছে প্রায় সমান ভরের দুটি ভিন্ন ধরনের স্থায়ী কণিক—প্রোটোন ও নিউট্রন। প্রোটোন পজিটিভ চার্জবিশিষ্ট এবং নিউট্রন বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ। ইলেকট্রনের নেগেটিভ চার্জ ও প্রোটোনের পজিটিভ চার্জ মাত্রার দিক থেকে সমান। অতএব, বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ একটি পরমাণুতে নিউক্লিয়াসের প্রোটোন ও নিউক্লিয়াসকে ঘিরে থাকা ইলেকট্রন সমান-সংখ্যক হয়ে থাকে। পরমাণুর ইলেকট্রনের সংখ্যাকে বলা হয় পারমাণবিক সংখ্যা। যেমন, হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ১ ($_1H$), সীসের ৮২ ($_{82}Pb$), ইউরেনিয়ামের ৯২ ($_{92}U$)। এই পারমাণবিক সংখ্যাই নির্ধারণ করে পরমাণুর রাসায়নিক আচরণ। কিন্তু পরমাণুর ভর নির্ভর করছে নিউক্লিয়াসের ওপর। এই নিউক্লিয়াসে আছে যেমন প্রোটোন তেমনি নিউট্রন। যেমন ধরা যাক, সাধারণ বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ সীসে তার পরমাণুতে আছে ৮২টি ইলেকট্রন। তার মানে, ৮২টি প্রোটোনও আছে। তার ওপরে আছে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রন। এই নিউট্রন যতো সংখ্যকই থাকুক না কেন তার ফলে পরমাণুর রাসায়নিক আচরণে কোনো হেরফের হয় না। কিন্তু হেরফের হয় ভরে। যতো বেশি নিউট্রন ততো বেশি ভর। কাজেই একই পদার্থের একাধিক প্রকারের পরমাণু পাওয়া যেতে পারে, যেগুলো রাসায়নিক আচরণের দিক থেকে অভিন্ন, কিন্তু ভরে ভিন্ন। পরমাণুর ভরকে আমরা প্রকাশ করতে পারি

বয়স হিসেব করার জন্য বিজ্ঞানীরা অন্য একটি আইসোটোপকেও কাজে লাগিয়েছেন। সেটি হচ্ছে পটাসিয়াম ৪০ (^{40}K)। পটাসিয়ামের তিনটি আইসোটোপ পাওয়া যায়—^{39}K, ^{40}K, ^{41}K। এই তিনটির মধ্যে একমাত্র ^{40}K বা পটাসিয়াম৪০ তেজস্ক্রিয়। বেশির ভাগ আগ্নেয় শিলায় এই আইসোটোপটি আছে, ফলে বিজ্ঞানীদের পক্ষে খুবই সুবিধের হয়েছে।

দুটি সম্পূর্ণ পৃথক প্রক্রিয়ায় পটাসিয়াম৪০ পরিবর্তিত হয় ক্যালসিয়াম৪০-এ এবং আর্গন৪০ গ্যাসে। প্রথম প্রক্রিয়ার বেলায় অর্ধজীবনের মাত্রা ১৪৭ কোটিবছর, দ্বিতীয়টির বেলায় ১১৯০ কোটিবছর।

শিলার বয়স হিসেব করার জন্য পটাসিয়াম-আর্গন পদ্ধতি খুবই উপযোগী। নানা ধরনের শিলার বয়স এই পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা চলে। উল্কাপিণ্ডের বয়স জানার জন্যও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বয়স যদি পঞ্চাশ-হাজার বছরের কম হয় তাহলে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কার্বন-১৪ থেকে বয়সের হিসেব করা চলে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় রেডিওকার্বন বয়স-নির্ধারণ। এটি হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের এক চাঞ্চল্যকর কৃতিত্ব। এমনকি প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণে যে-সব উপকরণ পাওয়া যায় তাদের বয়সও এই পদ্ধতিতে সঠিকভাবে নির্ধারণ করা চলে।

বয়স নির্ধারণের রেডিওকার্বন পদ্ধতির মূলকথাটি হচ্ছে এই অনুমান যে সকল জীবন্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে আছে নির্দিষ্ট পরিমাণ

প্রোটোনের সংখ্যার সঙ্গে নিউট্রনের সংখ্যা যোগ করে। এটিকে বলা হয় ভর-সংখ্যা। সাধারণ সীসের ভর-সংখ্যা ২০৪। কিন্তু সীসের এমন পরমাণুও পাওয়া যায় যার ভর-সংখ্যা ২০৬ বা ২০৭ বা ২০৮ (লেখা হয় এইভাবে: $^{206}_{82}Pb$, $^{207}_{82}Pb$, $^{208}_{82}Pb$)। এই তিনটি সীসের আইসোটোপ। তেমনি ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় দুই প্রকার ভর-সংখ্যার: ২৩৮ ও ২৩৫। আমরা লিখব ইউরেনিয়াম ২৩৮ ও ইউরেনিয়াম ২৩৫।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কার্বন-১৪। জীবদেহের মৃত্যু ঘটলে এই কার্বন-১৪ বা রেডিওকার্বন আস্তে আস্তে ক্ষয় পেতে থাকে ও বিলীন হয়। ক্ষয় চলে সমান ও নির্দিষ্ট মাত্রায় এবং জানা মাত্রায়। কার্বন-১৪-র অর্ধ-জীবনের মাপ ৫৭৩০ বছর। তার মানে, ৫৭৩০ বছর পার হলে কার্বন-১৪ অর্ধেক ক্ষয়ে গিয়েছে। ধরা যাক, একখণ্ড প্রাচীন কাঠের বয়স জানার চেষ্টা হচ্ছে। যদি দেখা যায় জীবন্ত উদ্ভিদে যে পরিমাণ রেডিওকার্বন থাকে তার অর্ধেক আছে এই কাঠে, তাহলে কাঠটির বয়স হওয়া উচিত ৫৭৩০ বছর।

যে-কোনো জৈব পদার্থের বয়স নির্ধারণ করার জন্য রেডিওকার্বন পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এই জৈব পদার্থ হতে পারে কাঠ বা মাংস বা হাড় বা মল বা শস্যদানা বা এমনকি মৌমাছির চাক। গাছের পাতায় লেখা প্রাচীন পুঁথির বয়স এইভাবে পাওয়া যেতে পারে। ফ্রান্সের ক্রো-মাঞঁ মানুষের গুহা থেকে যে পোড়াকয়লা পাওয়া গিয়েছে তার বয়স এই পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়েছে—কিছু কম-বেশি ১৫,৫১৬ বছর। বিধ্বস্ত পম্পেই থেকে পাওয়া রুটির টুকরো থেকে এই পদ্ধতিতে যে বয়স পাওয়া গিয়েছে তা সঠিকভাবেই গিয়ে দাঁড়ায় ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে।

বয়স নির্ধারণের আরও কয়েকটি পদ্ধতি আছে। যেমন, নির্ধারিত হতে পারে গাছের গুঁড়িতে বলয়ের সংখ্যা দেখে (বছরে একটি করে বলয় তৈরি হয়), হ্রদের তলদেশে বছরে বছরে জমা পললের স্তর থেকে, বা এমনকি উদ্ভিদজগতে ও প্রাণিজগতে পরিবর্তন বিচার করে।

তবে তেজস্ক্রিয়তা ও রেডিওকার্বনের হদিস পাবার পর থেকে অন্য কোনো পদ্ধতির তেমন প্রয়োজন হয় না। বেশির ভাগ শিলায় ও খনিজে পাওয়া যায় তেজস্ক্রিয়তা, জৈব পদার্থে রেডিওকার্বন। এ থেকেই বয়স বেরিয়ে আসে। পৃথিবীর বয়স যে ৪৬০ কোটি বছর তাও এই উপায়েই জানা গিয়েছে।

বয়স জানতে পারার উপায়টা হাতে আসার পরেই ভূ-বিজ্ঞানীরা চাইলেন এই ৪৬০ কোটি বছরের সময়কালকে বয়সের সীমানা দিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে তুলতে—যেমনটি তুলতে হয় সভ্যতার কাহিনীকে। এই উদ্দেশ্যেই তৈরি হয়েছে ভূতত্ত্বীয় কাল-বিভাগ, যার উল্লেখ আমরা আগে করেছি।

মহাদেশের সঞ্চরণ

আগেকার কালে ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল পৃথিবীর মহাদেশ-গুলো স্থির অবস্থায় আছে, তাদের কোনো নড়াচড়া নেই। তখনকার অবস্থায় এই ধারণাই স্বাভাবিক ছিল। পৃথিবীর উপরিতলে এখন আমরা যে-যে জায়গায় ও যেমন-যেমন চেহারায় বিভিন্ন মহাদেশ ও সমুদ্র দেখি সেটা চিরকালের নয়—একথা মনে করার কোনো কারণ তখন ছিল না। যদি বলা হত, কুড়ি কোটি বছর আগেও ভারত ছিল দক্ষিণ মেরুর কাছে, আটলান্টিক মহাসাগরের প্রায় কোনো অস্তিত্ব ছিল না, হিমালয়ের জায়গায় ছিল টেথিস নামে বিশাল সমুদ্র, নিউইয়র্ক ছিল বিষুবরেখায়, এমনি আরো কত-কি, তাহলে কেউ-ই তা বিশ্বাস করত না। বিজ্ঞানের কল্পকাহিনীতেও এমন কথা কখনো শোনা যায়নি।

তাই বলে কোনো কালেই এমন কথা কেউ বলেন নি, তাও ঠিক নয়। সেই ১৬২০ সালেই বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক স্যার ফ্র্যানসিস বেকন লক্ষ করেছিলেন, আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে দক্ষিণ আমেরিকার উপকুল ও আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে আফ্রিকার উপকুলের মধ্যে আশ্চর্য মিল রয়েছে। দুটিকে পাশাপাশি রাখলে প্রায় জোড় মিলে যায়। যদি আমরা মনে রাখি মহাদেশেরই খানিকটা অংশ মহীসোপান হয়ে সমুদ্রের নিচে ডুবে আছে, আর এই
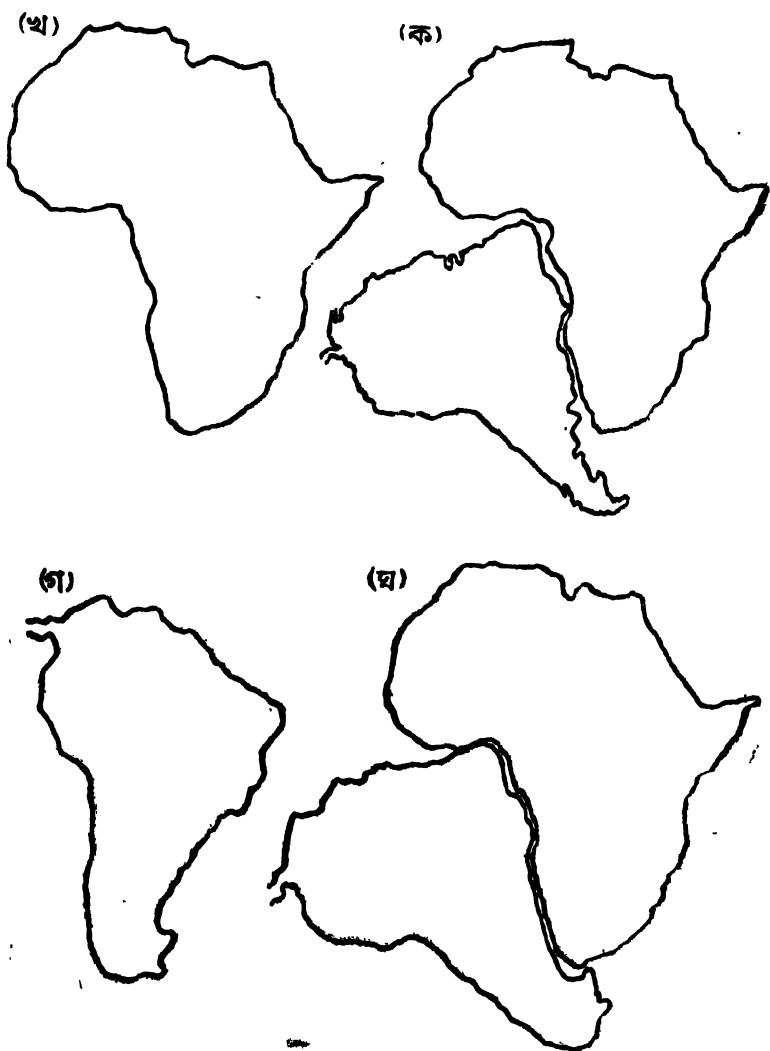
আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকাকে পাশাপাশি রাখলে প্রায় জোড় মিলে যায় —চিত্রে তাই দেখানো হয়েছে।

(ক) উপকূলের সঙ্গে উপকূল মেলালে যতোখানি মিলে যায়।

(খ) ও (গ) ১০০০ মিটার পর্যন্ত মহীসোপানকে ধরে নিয়ে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলের চেহারা।

(ঘ) (খ) ও (গ)-কে জোড় মেলালে কেমন বেমালুম মিলে যায়।

মহীসোপান সমেত সম্পূর্ণ মহাদেশটিকে ধরি, তাহলে দেখা যাবে দক্ষিণ আমেরিকার আটলান্টিক উপকূল আর আফ্রিকার আটলান্টিক উপকূল বেমালুম মিলে যাচ্ছে। এ থেকে অবশ্যই মনে হতে পারে, অতীতে কোনো এক সময়ে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা একই ভূখণ্ডের অংশ ছিল। পরে সেই ভূখণ্ড ভেঙে টুকরো হয়ে গিয়েছে এবং টুকরোগুলো দূরে সরে গিয়েছে। এ-থেকে ভূ-বিজ্ঞানীরা এই ধারণা গড়ে তুলেছেন যে শুধু দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা নয়, অন্যান্য মহাদেশও পৃথিবীর উপরিতলে নড়াচড়া করেছে। মহাদেশের এই নড়াচড়ার নাম দেওয়া হয়েছে মহাদেশের সঞ্চরণ (continental drift)।

শুধু এইটুকুই কি কারণ যে এক মহাদেশের উপকূলের চেহারার সঙ্গে আর এক মহাদেশের উপকূলের এমনই মিল যে দুটিকে একই জিনিসের ভাঙা টুকরোর মতো জুড়ে দেওয়া চলে? না, আরো কারণ আছে এবং সেই কারণগুলো খুবই জোরালো।

প্রথমে দেখা যাক এক মহাদেশের শিলার সঙ্গে অপর মহাদেশের শিলার ধরনের কোনো মিল পাওয়া যায় কিনা। ভূ-বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা পড়েছে যে দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন শিলাময় ভূমি আর আফ্রিকার প্রাচীন শিলাময় ভূমি একই ধরনের—কি অবস্থানের দিক থেকে, কি বয়সের দিক থেকে। দুই শিলাভূমির মাঝখানে প্রাচীন কালের যে ক্ষয়ে-যাওয়া পর্বতের চিহ্ন পাওয়া যায় তাও একদিকে চলেছে মনে হয়।

দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার স্থানে স্থানে প্রাচীনকালের হিমবাহের চলার চিহ্ন পাওয়া যায়, হিমবাহের সঙ্গে আসা পাথরের চাঁই ও শিলার সন্ধান মেলে। হিমবাহের এই চলা ঘটেছিল ২৫ কোটি বছর আগে। যে-দিকে চলেছিল তা বিচার করলে ধারণা করতে হয় দক্ষিণ আমেরিকার কিছু কিছু পাথরের চাঁই ও শিলা এসেছে আফ্রিকা থেকে। বাস্তবেও তার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। হিমবাহের
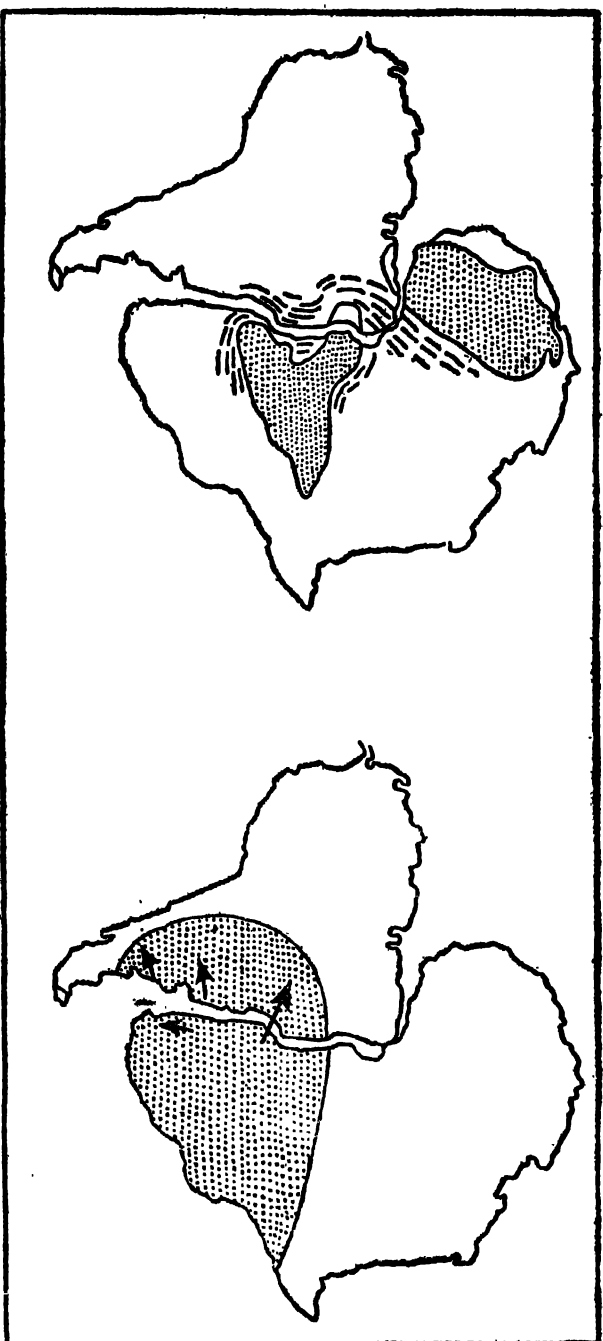
দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার প্রাচীন শিলাময় ভূমি একই ধরনের। দুই শিলাভূমির মাঝখানে প্রাচীন যে পর্বতের চিহ্ন পাওয়া যায় তা একই দিকে চলেছে। বাঁ-দিকেরচিত্রে তাই দেখানো হয়েছে। চিত্রে ছায়াবৃত অংশ হচ্ছে প্রায় ২০০ কোটি বছরের প্রাচীন শিলাভূমি আর ভাঙা-ভাঙা রেখায় দেখানো হয়েছে প্রায় ৫০ কোটি বছরের প্রাচীন পর্বতের চিহ্ন। ডানদিকের চিত্রে দেখানো হয়েছে ২৫ কোটি বছর আগে হিমবাহের চলার চিহ্ন। সেই সময়ে মহাদেশ দুটি দক্ষিণমেরুর কাছে ছিল।

সঙ্গে আসা এমন কিছু কিছু পাথরের চাঁই ব্রেজিলে পাওয়া গিয়েছে, শিলার ধরনের দিক থেকে বিচার করলে যা আছে একমাত্র আফ্রিকায়। হিমবাহের চলাটাই এই ধারণা সৃষ্টি করে যে এই দুটি মহাদেশ ২৫ কোটি বছর আগে দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি ছিল। তার পরে এই দুটি মহাদেশ উত্তরদিকে সরে এসেছে এবং পৃথক হয়ে গিয়েছে।

দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা যে এক সময়ে যুক্ত ছিল তার আরও প্রমাণ রয়েছে প্রাচীন উদ্ভিদ ও জীবের নিদর্শনে। দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীন উদ্ভিদ ও জীব উভয় মহাদেশে একই রকমের ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি সরীসৃপের নাম উল্লেখ করা চলে : মেসোসরাস। এই সরীসৃপটির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে যেমন দক্ষিণ আমেরিকায়, তেমনি আফ্রিকায়। এই সরীসৃপটির পক্ষে তো আর বিশাল এক সমুদ্র পার হয়ে এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব যুক্তিসঙ্গত ভাবেই ধরে নেওয়া চলে যে ৩০ কোটি বছর আগে এই দুটি মহাদেশ যুক্ত ছিল।

এ-বিষয়ে আরো সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে পুরা-চুম্বকত্ব থাকে। প্রাচীন শিলায় চুম্বকত্বের যে-সব লক্ষণ থেকে যায় তা বিচার করে নির্ধারণ করা চলে দক্ষিণ মেরুর তুলনায় দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা কোন্ অবস্থানে ছিল। এই বিচার থেকেও বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন, সাড়ে-বারো কোটি বছর আগেও এই দুটি মহাদেশ খুবই কাছাকাছি ছিল। তারপরে দক্ষিণ মেরুর বিচারে ভিন্ন অবস্থানে সরে গিয়েছে।

আর চূড়ান্ত সাক্ষ্য পাওয়া গিয়েছে পাললিক শিলার স্তরবিন্যাস থেকে। ব্রেজিলের কিনারে ও পশ্চিম আফ্রিকার কিনারে পাললিক শিলার যে স্তরবিন্যাস পাওয়া যায় তা এতই অভিন্ন যে ধরে নিতে হয় তা একই এলাকায় তৈরী। সম্ভবত তৈরি হয়েছিল দুই মহাদেশ আলাদা হতে শুরু করার সময়ে মধ্যবর্তী অগভীর সমুদ্রে।

এই হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার ক্ষেত্রে মহাদেশের সঞ্চরণ। কিন্তু যে সব সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এই দুটি মহাদেশের সঞ্চরণ স্বীকৃত হল সেগুলো কি অন্যান্য মহাদেশের বেলায় খাটে না? বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান থেকে জানা গেল, সমানভাবেই খাটে। যেমন, দক্ষিণ আমেরিকায় ও আফ্রিকায় যে-সময়ে হিমবাহের চলন ঘটেছিল সেই একই সময়ে হিমবাহের চলনের সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়
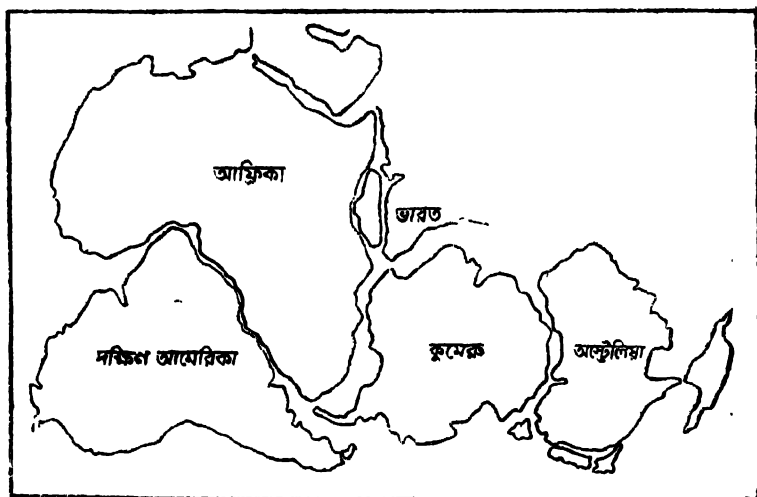
গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড

ও ভারতেও। আরও দেখা যাচ্ছে, কুমেরু ও অস্ট্রেলিয়া ও ভারতের শিলায় রয়েছে বহু মিল।

এবার তাহলে সেই আগের অবস্থা কল্পনা করা চলে। মহাদেশগুলো তখনো আলাদা আলাদা হয়ে সরে যায়নি—একসঙ্গে যুক্ত ছিল। এই অবস্থায় ভূ-গোলকের দক্ষিণদিকের মহাদেশগুলো (দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া) একসঙ্গে যুক্ত ছিল। আর ভাবা যেতে পারে, তারই সঙ্গে যুক্ত ছিল ভারত, শ্রীলঙ্কা, নিউজীল্যাণ্ড ও মালাগাসি (মাদাগাস্কার)। সব মিলিয়ে একটি বিশাল ভূখণ্ড—বৃহৎ এক মহাদেশ। অখণ্ড এই মহাদেশের নাম দেওয়া হয়েছে

গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড (Gondwanaland)*। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ২০ কোটি বছর আগে পর্যন্ত এই বৃহৎ মহাদেশের অস্তিত্ব ছিল। তারপরে এটি ভাঙতে শুরু করেছে। একই ভাবে উত্তরের মহাদেশগুলোকেও একসঙ্গে যুক্ত করা যায়। যুক্ত এই বিরাট মহাদেশের নাম দেওয়া হয়েছে লরেসিয়া (Laurasia)। গত ১৩ কোটি বছর ধরে এই মহাদেশটি ভাঙছে।
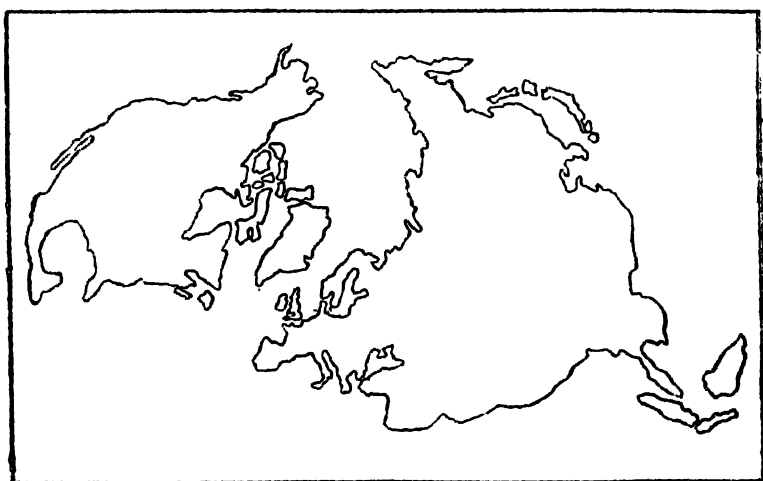
লরেসিয়া

তাহলে তো এমনও হতে পারে যে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ও লরেসিয়া এক সময়ে একসঙ্গে যুক্ত ছিল। বিজ্ঞানীরা তাই মনে করেন। বৃহৎ এই দুটি মহাদেশ—গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ও লরেসিয়া—পৃথক হয়ে যাবার

* পার্মিয়ান যুগের শুরুতে, অর্থাৎ ২৯ কোটি বছর আগে, ভারতীয় উপদ্বীপের কতকগুলি উপত্যকায় নদী ও হ্রদ থেকে পলল জমতে থাকে। এটা চলতে থাকে ক্রীটেশাস যুগ পর্যন্ত। তার ফলে তৈরি হয় ৬৩০০ মিটার থেকে ৬৬০০ মিটার গভীর এক বেলেপাথর-কাদা-কয়লার স্তরক্রম। মধ্য ভারতের যে অঞ্চলে এই স্তরক্রম পাওয়া যায় সেটা ছিল 'গণ্ড' নামক আদিবাসীদের

আগে একসঙ্গে যুক্ত ছিল এবং তার ফলে তৈরি হয়েছিল অতিবৃহৎ এক মহাদেশ—প্যান্‌জিয়া (Pangaea)। সম্ভবত ৩০ কোটি বছর আগে
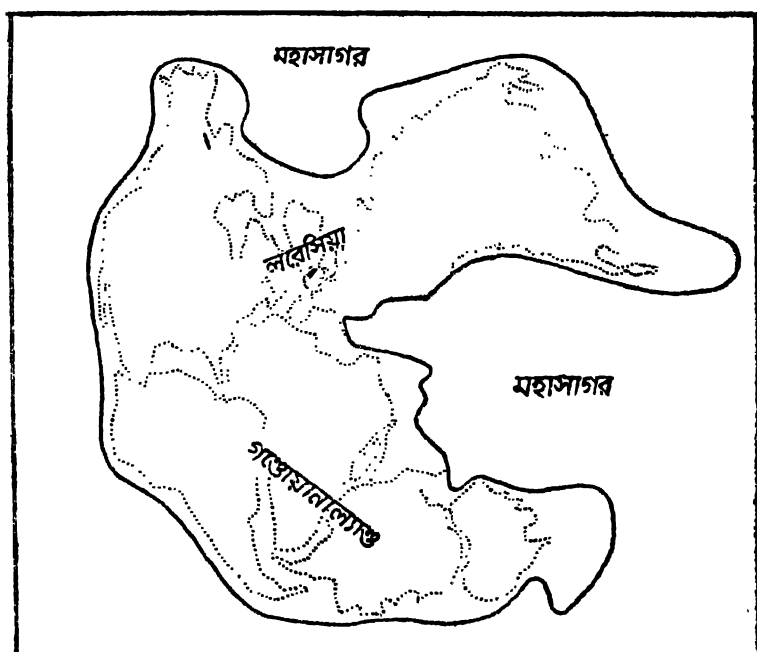
প্যানজিয়া

বাসস্থান। তাদের নাম থেকে এই স্তরটির নাম দেওয়া হয় গণ্ডোয়ানা। এই নাম থেকেই গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড। মনে রাখা দরকার, গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড নামটি যদিও এসেছে মধ্য-ভারতের গণ্ড উপজাতির নাম থেকে, কিন্তু গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড এককভাবে ভারত নয়। গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড বিরাট এক মহাদেশ, ভারত যার অংশ মাত্র। পরবর্তীকালে গণ্ডোয়ানা মহাদেশ খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়ে দূরে সরে গিয়েছে এবং এক-একটি মহাদেশের চেহারা নিয়েছে—যথা, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, কুমেরু, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদ। এই ভূখণ্ডগুলো গণ্ডোয়ানা কালে একই মহাদেশের মধ্যে ছিল, এই কারণে এখন পৃথক হয়ে যাওয়া আলাদা আলাদা খণ্ডগুলোর মধ্যেও গণ্ডোয়ানা স্তরের অনুরূপ শিলা পাওয়া যায়।

প্যানজিয়ার অস্তিত্ব ছিল এবং সেই অস্তিত্ব দশকোটি বছর ধরে বজায় ছিল।

পৃথিবীর উপরিতলে মহাদেশগুলো নড়ে বেড়াচ্ছে, বা সঞ্চরণ করছে, এটা কোনো নতুন কথা নয়। ফ্রান্সিস বেকনের কথা বলেছি, কিন্তু তিনি মহাদেশের সঞ্চরণের কথা বলেন নি, বলেছিলেন দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার উপকুল-রেখার মধ্যে মিলের কথা। এ-ঘটনা ১৬২০ সালের। তারপরে উল্লেখ করা হয় একজন নীতিপ্রচারক লেখকের নাম — ফ্রাঁসোয়া প্লাসেৎ। ১৬৬৬ সালে একটি পুস্তিকা লিখে তিনি উদ্ভট কতকগুলো ধারণা প্রচার করেছিলেন। তার মধ্যে একটি এই যে, নোয়ার বন্যার আগে পৃথিবী নিশ্চয়ই অবিভক্ত ছিল। আমেরিকা যে সরে গিয়েছে তার কারণ এই নয় যে আমেরিকার ভূখণ্ড সরে গিয়েছে। তার কারণ, আটলান্টিস নামে একটি মহাদেশ সমুদ্রের নিচে ডুবে গিয়েছে এবং তার ফলে পশ্চিমে একটি মহাদেশ জেগে উঠেছে। কিংবা, আমেরিকার সৃষ্টি কতকগুলো দ্বীপ সংযুক্ত হবার ফলে।

আটলান্টিকের মহাদেশগুলোর ভাঙন ও সঞ্চরণ সম্পর্কে প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ করেছিলেন ফরাসী বিজ্ঞানী স্নাইডার-পেলেগ্রিনি, ১৮৫৮ সালে। বলেছিলেন, গলিত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধার সময়ে মহাদেশগুলো গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর মাত্র একদিকে এবং তার ফলে অস্থির অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। নোয়ার বন্যার সময়ে এই ভূখণ্ডে ব্যাপকভাবে ফাটল ধরে ও আমেরিকা মূল ভূখণ্ড থেকে আলাদা হয়ে সরে যায়। এই উক্তির সমর্থনে দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার তটরেখার মিলের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু স্নাইডারের কথা উনিশ শতকের বিজ্ঞানীদের কাছে উদ্ভট মনে হয়েছিল। ভূ-বিজ্ঞানীদের কাছে তখন চার্লস লায়লের বাক্য ছিল বেদবাক্যের মতো। ১৮৩০ সালে প্রকাশিত হয়েছে লায়লের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ভূবিদ্যার নীতি, বর্তমানে ক্রিয়াশীল হেতুসমূহের নিরিখে

পৃথিবীর উপরিতলের পূর্বতন পরিবর্তনসমূহ ব্যাখ্যা করার একটি প্রয়াস'। তাতে তিনি উপস্থিত করেছেন তাঁর প্রাকৃতিক নিত্যতাবাদ (Uniformitarianism theory) এবং সেই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার জন্য একটি সূত্র —'বর্তমানই হচ্ছে অতীতের চাবিকাঠি।' মোট কথাটি এই—পৃথিবীতে এখন যে-সব প্রক্রিয়া ঘটছে তাই দিয়েই দূর অতীতের প্রক্রিয়াগুলোর ব্যাখ্যা হতে পারে। এবং প্রক্রিয়াগুলো ঘটছে অতি দীর্ঘ সময় ধরে। এর মধ্যে একটানা হয়ে চলার একটা ধারণা পাওয়া যায়—সেখানে কোনো বিপর্যয়কে আমল দেওয়া হচ্ছে না। অথচ, মহাদেশের সঞ্চরণের কথা যাঁরা বলেছেন তাঁরা ধরে নিয়েছেন সেই একটি বিপর্যয়কেই। এও একটা কারণ যে উনিশ শতকে মহাদেশের সঞ্চরণ নিতান্তই কথার কথা হয়ে থাকল।

তারপরে, ১৮৮৫ সালে, অস্ট্রীয় ভূ-বিজ্ঞানী এডওআর্ড সয়েস মহাদেশের রহস্য ব্যাখ্যা করার জন্য আরও কিছু সূত্রের সন্ধান দিলেন। দক্ষিণ গোলার্ধের মহাদেশগুলোতে ছড়ানো শিলা পর্যবেক্ষণ করে তিনি জানতে পারলেন যে শিলাগুলোর মধ্যে অনেক লক্ষণগত মিল আছে। এই সাক্ষ্যের ওপরে নির্ভর করেই সয়েস মহাদেশগুলোর মধ্যে জোড় মেলালেন। তার ফলে পাওয়া গেল অতি বিশাল এক ভূখণ্ড, এবং তার নাম তিনি দিলেন গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড।

সয়েসের বইয়ে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু সমস্ত পর্বতমালা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা ছিল। তিনি দেখেছিলেন, এশিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্ত থেকে ভূমধ্যসাগর অঞ্চল বরাবর পরপর রয়েছে ধনুকের মতো আকারের পর্বতলালা। আর সাধারণত দেখা যাচ্ছে, ধনুকের মতো আকারের এইসব পর্বতমালার উত্তল দিক রয়েছে সমুদ্রের দিকে। এ থেকে ধারণা করতে হয়, চাপ এসেছে পাশ থেকে। সয়েসের এই আলোচনার ওপরে নির্ভর করেই ১৯১০ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী এফ বি টেলর মহাদেশের সঞ্চরণকে প্রথম একটি তত্ত্ব হিসেবে দাঁড় করাতে পারলেন। তিনি বললেন, "গুড়িগুড়ি একটা জোরালো চলন

পৃথিবীর পর্বতমালা
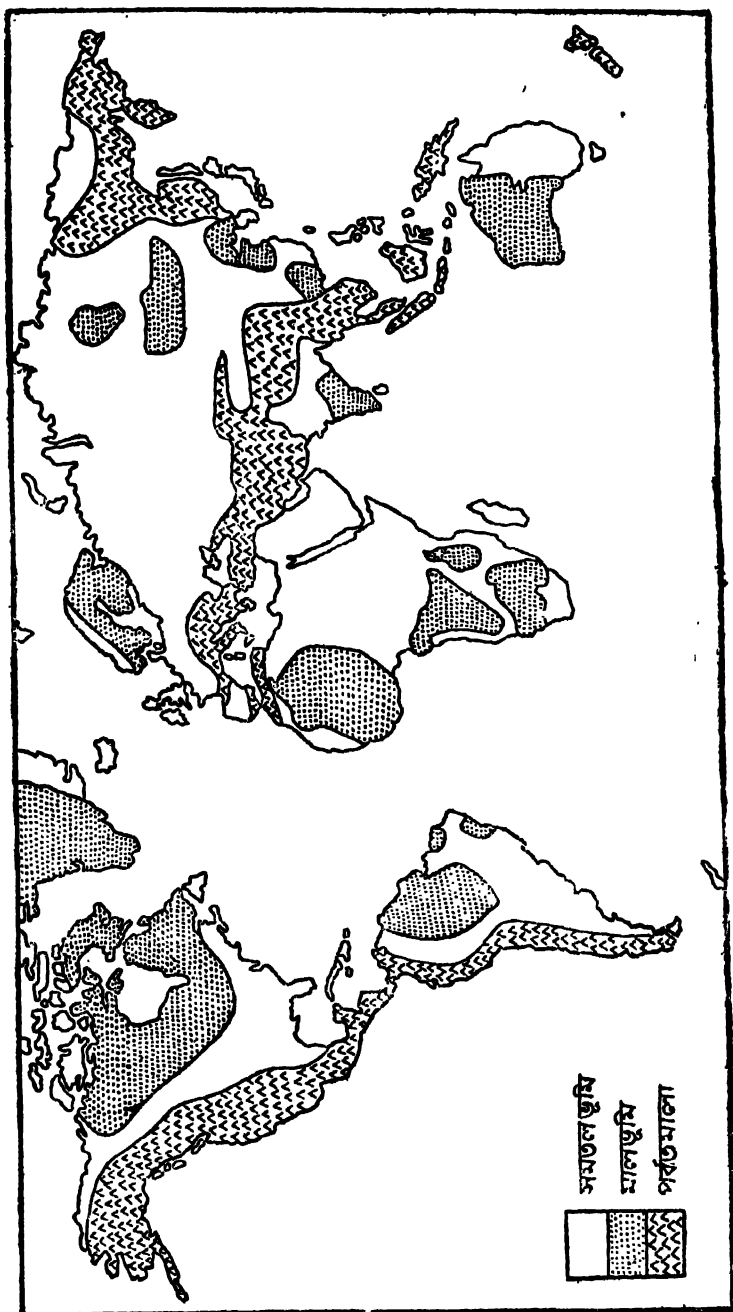
ঘটেছে উত্তর থেকে আর তারই ফলে আফ্রিকা ও ভারতীয় উপদ্বীপের প্রাচীন ভূখণ্ডের ওপরে চাপ পড়েছে। সরাসরি উত্তরের দিকে শিলাস্তূপ উঁচু হয়ে উঠে তৈরি হয়েছে হিমালয় পর্বতমালা ও পামির মালভূমি। আরও পুবে এই পর্বতমালা স্বচ্ছন্দে বাঁক নিতে পেরেছে মালয়েশিয়ায় ও ইন্দোনেশিয়ায়।

আফ্রিকার ওপরে চাপ পড়ার দরুন এমনিভাবে গড়ে উঠেছে দক্ষিণ ইউরোপের পর্বতমালা, যদিও এশিয়ার চেয়ে ইউরোপে পর্বত তৈরি হওয়ার ব্যাপারটা নানা কারণে অনেক বেশি জটিল।

উত্তর থেকে আসা ভূত্বকের এই গুড়িগুড়ি চলনের সমর্থনে গ্রীনল্যাণ্ডকে তুলে ধরলেন টেলর। গ্রীনল্যাণ্ড হচ্ছে প্রাচীন এক ভূখণ্ডের অংশ, আর প্রাচীন এই ভূখণ্ড থেকেই ফাটল বরাবর ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছে কানাডা ও উত্তর ইউরোপ। সয়েস ও অন্য বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছিলেন, উত্তর আটলান্টিকের দুই দিকে পুরাজীবীয় শিলা প্রায় একই রকমের। তাঁরা ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এই বলে যে আটলান্টিস নামে একটি মহাদেশ ডুবে যাবার ফলে এই দুটি দিক আলাদা হয়ে গিয়েছে, আগে যুক্ত ছিল। তাঁরা ভাবতে পারেননি যে মহাদেশীয় ভূখণ্ডগুলো সরে যেতেও পারে।

একসময়ে ভূ-বিজ্ঞানীরা ভাবতেন, আপেল শুকিয়ে গেলে আপেলের চামড়ায় যেমন ভাঁজ পড়ে, তেমনি পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে হতে সংকুচিত হয় আর তারই ফলে ভূত্বকে ভাঁজ পড়ার ফলে পর্বতের সৃষ্টি। টেলর কিন্তু এই তত্ত্ব মানতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল, টার্শারি যুগের নবীন পর্বতগুলোকে যেখানে-যেখানে দেখা যাচ্ছে তাকে ভূগোলকের সংকোচন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে মহাদেশের চলন কেন হবে সেই ব্যাখ্যার মধ্যেও যাননি। যেমন, তিনি বলছেন, "ঐক্যের এমন অনেক সূত্র পাওয়া যায় যা দেখাচ্ছে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা আগে ঐক্যবদ্ধ ছিল।" বিনা ব্যাখ্যায়

শুধু এইটুকুই মন্তব্য। সম্ভবত এই কারণেই ভূবিজ্ঞানী-মহলে ১৯১০ সালে লিখিত তাঁর নিবন্ধ সাড়া জাগাতে পারেনি।

মাত্র দু-বছর পরে, ১৯১২ সালে, আলফ্রেড ভেগেনার নামে একজন জার্মান আবহবিজ্ঞানী উপস্থিত করলেন তাঁর 'মহাদেশীয় সঞ্চরণের তত্ত্ব'। ব্রিটিশ ও আমেরিকান বিজ্ঞানীদের অনুসরণ করে নয়, স্বাধীনভাবেই তিনি এই তত্ত্বে পৌঁছেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই তত্ত্বের সমর্থনে উপস্থিত করে চলেন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভূ-প্রাকৃতিক বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন উৎস থেকে প্রচুর সাক্ষ্যপ্রমাণ। এই কারণেই মহাদেশীয় সঞ্চরণের ধারণাটি প্রধানত যুক্ত করা হয় আলফ্রেড ভেগেনারের নামের সঙ্গে। ভেগেনারের সঙ্গে টেলরের সম্পর্ক বোঝাবার জন্য বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে অন্য আরো দুটি নামের উল্লেখ করা হয়—ওয়ালেস ও ডারউইন। বিবর্তনবাদের প্রবক্তা হিসেবে ধরা হয় ডারউইনকে, কিন্তু ওয়ালেসও একই সময়ে বিবর্তনবাদের তত্ত্বে পৌঁছেছিলেন।

আলফ্রেড ভেগেনারের জন্ম ১৮৮০ সালে, বার্লিনে। তিনি ছিলেন একজন খ্রীষ্টীয় সুসমাচার প্রচারকের ছেলে। লেখাপড়া শিখেছিলেন বার্লিনের কোয়েল্‌নিশেস জিমন্যাসিয়ামে, পরবর্তীকালে হাইডেলবার্গ ইন্‌স্‌ব্রুক ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯০৬ সালে ডেনমার্কের এক অভিযাত্রী দলের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব গ্রীনল্যাণ্ডে যান। দু-বছর সেখানে ছিলেন এবং আবহ বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। জার্মানিতে ফিরে আসার পরে মারবুর্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতির্বিদ্যা ও আবহবিদ্যার প্রিভাটডোৎসেণ্ট* নিযুক্ত হন। এই সময়ে আবহবিদ্যা বিষয়ে একটি

* জার্মানিতে সে-সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ পেতে হলে প্রথমে কিছুকাল কাজ করতে হত প্রিভাটডোৎসেণ্ট হিসেবে। প্রিভাট মানে প্রাইভেট, ডোৎসেণ্ট মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার। প্রিভাটডোৎসেণ্ট সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো দায়দায়িত্ব থাকত না, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে কোনো

পাঠ্যপুস্তক লেখেন। ১৯১২ সালে দ্বিতীয় বার গ্রীনল্যাণ্ডে অভিযান করেন। এবারের অভিযান জে পি কখ্-এর সঙ্গে। কিন্তু এই অভিযানটি তেমন সার্থক হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ছিলেন জুনিয়র অফিসার, হাতে ও ঘাড়ে আঘাত পান। যুদ্ধের পরে হামুবুর্গে শিক্ষকতার জীবনে ফিরে আসেন। ১৯২৪ সালে অস্ট্রিয়ার গ্রাৎস বিশ্ববিদ্যালয়ে আবহবিদ্যা ও ভূ-পদার্থবিদ্যার শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করেন। গ্রীনল্যাণ্ডে তৃতীয়বার অভিযানে যান ১৯৩০ সালে। সেখানে বরফের চুড়োয় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

ভেগেনার যে-সময়ে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে মহাদেশের সঞ্চরণের তত্ত্বটি দাঁড় করিয়েছিলেন তখন পৃথিবীর গড়ন ও বিবর্তন সম্পর্কে সাধারণভাবে ধারণা কী ছিল সেটা জানা দরকার। তবেই বোঝা যাবে ভেগেনারের তত্ত্ব সেই সময়ের পক্ষে (এই শতকের গোড়ার দিক) কতখানি বৈপ্লবিক ছিল।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে পৃথিবীকে মনে করা হত এমন এক গলিত বস্তুপিণ্ড যেটি ক্রমেই জমাট বাঁধছে বা কঠিন হয়ে উঠছে এবং ফলে ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। যেহেতু গলিত বস্তুপিণ্ড, অতএব তার ভিতরে হালকা শিলার উপকরণ ওপরের দিকে চলে আসে। তা থেকে তৈরি হয় গ্র্যানিট জাতের আগ্নেয় ও পরিবর্তিত শিলা—তারই সঙ্গে পলল। ওপরের দিকের এই হালকা শিলাকে বলা হয় সিয়াল (sial), কেননা এই শিলায় সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় সিলিকা ও অ্যালুমিনিয়ম। সিয়ালের নিচে থাকে আরো ঘন ও আরো ভারী ব্যাসল্ট জাতের শিলা। তার নাম সিমা (sima), কেননা এই শিলায় সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় সিলিকা ও ম্যাগনেসিয়াম।

বেতনও দেওয়া হত না। অন্যদিকে প্রিভাটডোৎসেন্টেরও কোনো দায়দায়িত্ব থাকত না। তিনি যা-খুশি লেকচার দিতে পারতেন। যে-সব ছাত্র সেই লেকচার শুনতে আসত তারা সামান্য কিছু বেতন দিত। এমনি কিছুকাল থাকার পরে তবে প্রফেসর হওয়া যেত।

পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড সংকুচিত হলে ভূত্বকে ভাঁজ পড়ে, যেমন ভাঁজ পড়ে আপেল শুকিয়ে ছোট হয়ে গেলে তার খোসায়। এই ভাঁজ পড়ার ফলেই তৈরি হয় পর্বত। এমনও হতে পারে ভাঁজের আঁটুনির ফলে পৃথিবীর কোনো অংশ ধসে পড়ল ও দেবে গেল। তাহলে সেখানে একটি সমুদ্র তৈরি হতে পারে। তারই মধ্যে মহাদেশগুলো অক্ষত হয়ে থাকছে। কালক্রমে এই মহাদেশও তলিয়ে যেতে পারে, তখন সেই এলাকাকে গ্রাস করে সমুদ্র। কখনো-বা সমুদ্রের তলদেশের কোনো অংশ জেগে ওঠে ও শুকনো জমি হয়ে যায়।

তবে, যতোই ভাঙাগড়া চলুক, মহাদেশগুলোকে আলাদা আলাদা ধরা হচ্ছে। সেখানে একের সঙ্গে অপরের কোনো যোগ না-থাকারই কথা। কিন্তু দেখা গেল, আলাদা আলাদা মহাদেশেও প্রাচীনকালের জীব ও উদ্ভিদের এমন প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে যেগুলোর মধ্যে মিল পুরোমাত্রার বা অনেকখানি। মহাদেশগুলো যদি এমন বিচ্ছিন্নই থাকে তাহলে কখনোই ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে এমন অভিন্ন জীব ও উদ্ভিদের উদ্ভব হতে পারে না। প্রজননগত নিয়মেই সেগুলো ভিন্ন হয়ে যাবার কথা। তখন ধরে নিতে হল, প্রাচীনকালে মহাদেশগুলো এমন ছিল না, তাদের মধ্যে জমির যোগ ছিল। তখনই অখণ্ড এক মহাদেশের কল্পনা করতে হয়েছিল।

মহাদেশের সঞ্চরণ ব্যাপারটাই এমন ছিল যে গোড়ার দিকের বিজ্ঞানীদের পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া সহজ ছিল না। নিরেট মহাদেশ মহাসাগরের নিরেট তলদেশের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে - এই ভাবনাকেই অসম্ভব মনে হত। অথচ পুরাজীববিজ্ঞানীর অনুসন্ধান থেকে জানা যাচ্ছে—ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে এমন সব উদ্ভিদ ও জীবের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে যেগুলো মানতে হলে অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশগুলো একসময়ে ছিল একক একটি মহাদেশ। ভূ-রসায়নবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ থেকে জানা যাচ্ছে, মহাসাগরের তলদেশের শিলা আর মহাসাগরের দুই বিপরীত দিকে

মহাদেশের ধারের দিকের শিলার মধ্যে রাসায়নিক লক্ষণগত মিল অসাধারণ। ভূ-কালনির্ধারণ বিজ্ঞানীরা তেজস্ক্রিয়তার মাপ থেকে কাল-নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখেছেন—আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দূরে দূরে ছড়ানো মহাদেশগুলোতেও শিলার বয়স একই রকম এবং একই ভূতত্ত্বীয় কালে একই রকম প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সেগুলো গড়ে উঠেছে। এই সবকিছুই প্রমাণ দিচ্ছে মহাদেশগুলো একসময়ে যুক্ত অবস্থায় ছিল। পরে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে ও নানাদিকে সরে এসেছে। অর্থাৎ, মহাদেশের সঞ্চরণ ঘটেছে।

তবে মহাদেশের সঞ্চরণের পক্ষে আরো জোরালো সাক্ষ্য ও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। শুনলে অবাক হতে হবে, সেটা পাওয়া গিয়েছে সমুদ্রের তলদেশ থেকে।

এবার তাহলে আমরা অনুসন্ধানী চোখ নিয়ে সমুদ্রের তলদেশটি দেখার চেষ্টা করব।

মহাসাগরের তলদেশ

মহাসাগরের গড় গভীরতা প্রায় চার-কিলোমিটার। কোথাও আরো কম কোথাও আরো বেশি। গভীরতা সবচেয়ে বেশি প্রশান্ত মহাসাগরের। পৃথিবীর তাবৎ মহাসাগরের গভীরতম স্থান—১১·০৪ কিলোমিটার গভীর মারিয়ানাস ট্রেঞ্চ—তাও এই প্রশান্ত মহাসাগরেই। তাছাড়া, ৬ থেকে ৮ কিলোমিটার গভীর স্থানের সংখ্যা প্রশান্ত মহাসাগরে কম নয়। আটলান্টিক মহাসাগরে সবচেয়ে গভীর (৯·৫ কিলোমিটার) স্থানের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে পুয়েটো রিকোর কাছে।

সমুদ্রের তলদেশের চেহারাটি কেমন? তা জানার জন্য

বিজ্ঞানীরা ব্যাপক অনুসন্ধান চালাচ্ছেন এবং নানান আধুনিক ব্যবস্থার সাহায্য নিচ্ছেন। যেমন, শ্রবণাতীত শব্দতরঙ্গ (সুপারসোনিক ওয়েভ) ব্যবহার করা। বিশেষভাবে সজ্জিত জাহাজ থেকে সুপারসোনিক তরঙ্গ সমুদ্রের তলদেশে পাঠানো হয়। সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে সেই তরঙ্গ ফিরে আসে এবং একটি চিত্রে আঁকা হয়ে যায়। এই চিত্রকে বলা হয় প্রতিধ্বনি-চিত্র (echogram)। এটি দেখে বেশ বোঝা যায় সমুদ্রের তলদেশের চেহারাটি কেমন—কতখানি সমতল, কতখানি উঁচুনিচু, ইত্যাদি।

এই অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে সবচেয়ে অসাধারণ যে-ব্যাপারটি বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন তা এই যে মহাসাগরের তলদেশের বেশির ভাগটাই সমতল। আটলান্টিক মহাসাগরে দেখা গিয়েছে, সুপারসোনিক তরঙ্গপ্রেরক জাহাজ কিলোমিটারের পর কিলোমিটার পার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রতিধ্বনি-চিত্রে গভীরতার বিশেষ হেরফের নেই। তার মানে, মহাসাগরের তলদেশটি মোটামুটি সমতল।

এ থেকে সিদ্ধান্ত করা ভুল হবে যে মহাসাগরের তলদেশ গোড়া থেকেই এমনি সমতল। এমনও হতে পারে, মহাসাগবের আসল তলদেশ খুবই উঁচুনিচু, কিন্তু হাজার হাজার বছর ধরে তার ওপরে পলল জমেছে এবং তার ফলে সমস্ত উঁচুনিচু ভরাট হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা যে তাই তার দুটি প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাসাগরের তলদেশ থেকে নমুনা এনে দেখা গিয়েছে সেটা পলল। আর ভূমিকম্পের ঢেউ পাঠিয়ে দেখা গিয়েছে পলল সব জায়গায় সমান পুরু নয়।

মহাসাগরের তলদেশে পলল আসে কোত্থেকে ? এমনিতে নদীর তলদেশে পলল হিসেবে আমরা পাই কাদা-মাটি-বালি ইত্যাদি। বয়ে আসা জল জমি ধুয়ে এগুলো নিয়ে আসে। সমুদ্রের উপকূলে পাই বালি ও পাথর। এগুলো আসে জমির ভাঙন থেকে। তার মানে, ক্ষয় ও ভাঙনের প্রক্রিয়া যদি চলতে থাকে তবেই পলল পাওয়া যায়। কিন্তু মহাসাগরের তলদেশে পুরু পলল পড়ে কী ভাবে ?

মহাসাগরের তলদেশে বরফ নেই, বাতাস নেই, বয়ে-যাওয়া জল নেই। কাজেই এমন কিছু ঘটতে পারে না যাতে জমির ক্ষয় ও ভাঙন ঘটতে পারে। এই কারণে মহাসাগরের তলদেশের আদি চেহারাটি বজায় থাকছে। অথচ সেই চেহারাটি হাজার বা তারও বেশি মিটার পুরু পললে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। এমনিতে নদীর জলের সঙ্গে বা অন্য উপায়ে যে-সব ধুলো-মাটি-পাথর সমুদ্রে এসে পড়ে তা মহীসোপানের এলাকার মধ্যেই তলদেশে থিতিয়ে পড়ার কথা। কিন্তু সূক্ষ্ম কণিকাগুলোর থিতিয়ে পড়তে এত বেশি সময় লাগে যে সেগুলো মহীসোপানের এলাকা ছাড়িয়ে গভীর সমুদ্রের এলাকায় এসে পড়তে পারে। তার সঙ্গে আছে মহাকাশ থেকে ঝরে পড়া সূক্ষ্ম মহাজাগতিক ধুলো। আর আছে বহুপ্রকারের সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ। সমুদ্রের জলে থাকে ঝিনুক ও শামুক জাতীয় বহু প্রকারের শক্ত খোলাওলা জীব ও অজস্র প্রকারের অতি-ক্ষুদ্র জীব। তাদের দেহাবশেষ হাজার হাজার বছর ধরে গভীর সমুদ্রের তলদেশে জমা হতে থাকে। এই সবকিছু নিয়ে গভীর সমুদ্রের তলদেশের পলল তৈরি হয়—অনেকটা নরম কাদার মতো। তার মধ্যে থেকে নুড়ি ও পাথর একেবারে পাওয়া যায় না তা নয়। মহাদেশ থেকে এই সমস্ত নুড়ি ও পাথর টেনে নিয়ে এসেছে হিমশৈল —বরফ গলে যাবার পরে যার ভেতর থেকে নুড়ি ও পাথর খসে পড়েছে।

সমুদ্রের তলদেশে আর থাকে লাল মাটি (red clay)। এই লাল মাটি সম্ভবত আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরণ থেকে এসেছে।

তবে সমুদ্রতলের সবটাই সমতল নয়। স্থলভাগে যেমন বেশির ভাগটাই সমতল, কিন্তু বাকি অংশে আছে পাহাড়, পর্বত, মালভূমি ইত্যাদি। সমুদ্রতলেও তাই। স্থলভাগে যেমন আছে সারি সারি পর্বত ও আগ্নেয়গিরি, সমুদ্রতলেও একই রকম। প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ থেকে প্রায় আড়াই-হাজার কিলোমিটার লম্বা পর্বতশ্রেণী

উঠেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের শত শত দ্বীপ ও অ্যাটল তৈরি হয়েছে আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরণ জমা হয়ে হয়ে। এমনকি জাপান ও ফিলিপাইনের মতো দ্বীপও আসলে এমনি ধরনের আগ্নেয়গিরি। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু আগ্নেয়গিরি রয়েছে হাওয়াই দ্বীপে—মনা লোয়া। তার চূড়ো সমুদ্র-পিঠ থেকে ৪২০০ মিটার উচুতে উঠেছে। আর সমুদ্র-তল থেকে সমুদ্র-পিঠ-পর্যন্ত এই আগ্নেয়গিরির ধড় প্রায় সাড়ে-তিন কিলোমিটার উঁচু। পুরোটা একসঙ্গে দেখতে পাওয়া গেলে প্রায় এভারেস্টের মতো উঁচু মনে হত।

পুরোটা একসঙ্গে দেখতে হলে প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত জল সরিয়ে ফেলতে হয়। মনে করা যাক তাই করা হয়েছে। তখন কিন্তু মনা লোয়ার চূড়োয় দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকালে আশ্চর্য এক দৃশ্য চোখে পড়বে। প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল এলাকা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরভাবে সাজানো আগ্নেয়গিরির চূড়োর পর চূড়ো। কোনো কোনো চূড়োকে দেখাচ্ছে মুকুটের মতো, কেননা প্রবাল শিলা এই চূড়োগুলোকে আংটির মতো বেড় দিয়ে আছে। উচ্চতায় এগুলো সমান মাপের, সমুদ্র-পিঠ থেকে কয়েক মিটার মাত্র উঁচু (এগুলোকে বলা হয় অ্যাটল)। আরো অনেকগুলো চূড়ো রয়েছে যাদের ওপরের দিক সমতল, যেন ছুঁচলো মাথাগুলো কেউ কেটে নিয়ে গেছে (সমুদ্রের স্রোতে ক্ষয়ে গিয়ে এই অবস্থা) এবং অনেকের বসার মতো জায়গা করে রেখেছে। তারই মধ্যে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে ছুঁচলো ডগাওলা আগ্নেয়গিরিও। প্রশান্ত মহাসাগরের এই আগ্নেয়গিরির মালা নিয়ে বহুবছর ধরে ভূ-বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু জল্পনা-কল্পনা করেছেন। বিশেষ করে কাটা-মাথা আগ্নেয়গিরিগুলো তাঁদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হত।

তবে মহাসাগরের তলদেশে শুধু যে কতকগুলো ছাড়া-ছাড়া চূড়ো আছে, তাই নয়। আছে টানা পর্বতমালাও। স্থলভাগে পর্বতমালা তৈরি হয়ে থাকে ভূত্বকে ভাঁজ পড়ার দরুন। মহাসাগরের তলদেশেও

একই কারণ ঘটেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোকে দেখে মনে হয় যেন লাইন-বরাবর সাজানো।

আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝ-বরাবর উঠেছে লম্বা একটানা এক গিরিশিরা (ridge)। এমনভাবে উঠেছে যে মনে হয় কেউ যেন একটা দেওয়াল তুলে আটলান্টিকের দুই দিকের উপকূলকে পৃথক করে রাখতে চায়। তবে পুরোপুরি পৃথক করতে পারেনি। কেননা গিরিশিরার উচ্চতা মহাসাগরের তলদেশ থেকে প্রায় ৩,০০০ মিটার পর্যন্ত। কাজেই গিরিশিরার ওপরে কমপক্ষে আরো হাজার-মিটার জল থেকে গিয়েছে। কিন্তু তলা থেকে তাকিয়ে দেখলে অবশ্যই মনে হয় এটি এক বিশাল পর্বতমালা—চওড়ায় ৩২ কিলো-মিটার আর লম্বায় ১৬,০০০ কিলোমিটার। শুরু হয়েছে আফ্রিকার দক্ষিণ ডগার কাছে। আর তারপরে সাপের মতো এঁকেবেঁকে, দু-দিকের দুই উপকূল-ভাগকে সমান দূরে রেখে (অর্থাৎ, আটলান্টিকের ঠিক মাঝ-বরাবর) চলে গিয়েছে আইসল্যাণ্ড পর্যন্ত।

মহাসাগরের মাঝ-বরাবর পর্বতমালা শুধু যে আটলান্টিকে আছে তা নয়। এটি একটানা ছড়িয়ে গিয়েছে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরেও। ভারত মহাসাগরে এই গিরিশিরা শুরু হয়েছে এডেন উপসাগরের কাছে, সেখান থেকে খানিকটা গিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, তারপরে নেমে এসেছে ভারত মহাসাগরের মধ্য-অংশে, ২৫ দক্ষিণ অক্ষাংশের কাছে দু-ভাগে ভাগ হয়েছে। একভাগ আফ্রিকার দক্ষিণ হয়ে যুক্ত হয়েছে মধ্য-আটলান্টিক গিরিশিরার সঙ্গে, অপর ভাগ অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ হয়ে যুক্ত হয়েছে পূর্ব প্রশান্তমহাসাগরীয় গিরিশিরার সঙ্গে, এবং শেষপর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে কালিফোর্নিয়ার উপকূলে।

তার মানে, মধ্য-মহাসাগরীয় এই গিরিশিরা একটানা ছড়ানো রয়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে। সব মিলিয়ে সমুদ্রের নিচে এক বিশাল পর্বতমালা—লম্বায় প্রায় ৬৪,০০০ কিলোমিটার।

চিত্রে দেখানো হয়েছে পৃথিবীর প্রধান প্রধান মধ্য-মহাসাগরীয় গিরিশিরা (টানা ডবল লাইনে) এবং পরিখা (ভাঙা ভাঙা লাইনে)

ভারত মহাসাগরের এই প্রধান গিরিশিরা ছাড়াও আরো একটি গিরিশিরার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এটি শুরু হয়েছে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে এবং ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমাবরাবর দক্ষিণদিকে ছড়িয়েছে। শেষ হয়েছে প্রায় ৩২° দক্ষিণ অক্ষাংশে। এই গিরিশিরার নাম পূর্ব ভারতমহাসাগরীয় গিরিশিরা। লম্বায় ৫,৭৫০ কিলোমিটার, উচ্চতায় প্রায় ২,৫০০ মিটার। তারপরে আছে একটি মগ্ন চড়া, অস্ট্রেলিয়ার দিকে প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়ানো।

উপকূলের কাছে বহু স্থানে সমুদ্রতলে আছে গভীর খাত। তাদের ক্যানিয়ন বলা চলে, তেমনি গভীর খাত, তেমনি খাড়া ধার। এগুলো সাধারণত শুরু হয় মহীসোপানের শেষ থেকে, তারপরে বহু কিলোমিটার পর্যন্ত মহীঢাল দিয়ে নেমে চলে এবং গভীর সমুদ্রতলে পৌঁছে যায় —সমুদ্র-পিঠ থেকে ২,০০০ মিটার নিচে পর্যন্ত। তাদের চলার পথ আঁকাবাঁকা, অনেকটা নদীর চলার পথের মতো। মনে হয়, এ যেন সমুদ্রতলের নদীর উপত্যকা।

নদী যেমন পাথরের মধ্যে দিয়েও পথ করে নিতে পারে—যেমন নিয়েছে হিমালয়ের নদীগুলো—তেমনি সমুদ্রতলের এই ক্যানিয়নগুলোকেও দেখে মনে হতে পারে, প্রচণ্ড একটা শক্তি এখানেও কাজ করেছে।

আবিলতার স্রোত

এই ক্যানিয়নগুলো সমুদ্রের এতই গভীরে থাকে যেখানে সমুদ্রের সাধারণ ঢেউ বা স্রোতের কোনো ধাক্কা পৌঁছয় না। রাতের মতো অন্ধকার সেখানে, আর আলোড়ন বলতে যেটুকু আছে তা অদ্ভুত-গোছের কোনো মাছের নড়াচড়ার দরুন। অথচ ক্যানিয়নের অস্তিত্ব দেখে বোঝা যায়, এমন এলাকাতেও কখনো-কখনো সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেবার মতো প্রচণ্ড স্রোত এসেছে। কেমন করে তৈরি হয় এই স্রোত ?

ব্যাপারটা ঘটে এইভাবে। সমুদ্রের জলে কাদা মিশে থাকে। এই কাদা-মেশানো ঘোলা জল সাধারণ জলের চেয়ে ভারী, অতএব নিচের দিকে নামতে থাকে। মহীসোপানে ও মহীঢালে সমুদ্রের তল-দেশ ক্রমেই নিচের দিকে নেমে গিয়েছে। ফলে, পাহাড়ের গা বেয়ে নদী নেমে আসার মতো এই ঘোলা-জল নামতে থাকে ও প্রচণ্ড গতি-সম্পন্ন হয়ে ওঠে। বরফের ওপর দিয়ে যেমন হিমবাহ নেমে আসে, তেমনি জলের মধ্যে দিয়ে নেমে আসে এই ঘোলা-জল। নামতে নামতে গভীর মহাসাগরের সমতল তলদেশে পৌঁছে যায় এবং তারপরে নিজের বেগের তাড়নায় সেখানকার হাজার বা তারও বেশি মিটার পুরু পললের মধ্যে দিয়ে নদীর মতো পথ কেটে কেটে চলে।

ঘোলা-জলের এই স্রোতকে বলা হয় আবিলতার স্রোত (turbidity current)। ঘণ্টায় একশো কিলোমিটারেরও বেশি বেগে এই স্রোত চলে এবং চলার পথে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়।

সমুদ্রতলের সম্প্রসারণ

মহাদেশের সঞ্চরণের পক্ষে সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে এই মহাসাগরীয় গিরিশিরা থেকে। বিশেষ করে মধ্য-আটলান্টিক গিরিশিরা থেকে।

মধ্য-আটলান্টিক গিরিশিরার মাঝখান দিয়ে বরাবর চলে গিয়েছে গভীর একটি খাত বা পরিখা। অনেকটা উপত্যকার মতো, যার দুটি ধার খাড়া। চেহারাটি সবদিক থেকে এমন যে মনে হতে পারে মহাসাগরের তলদেশ যেন ছিঁড়ে বা ফেঁড়ে গিয়েছে। এই খাতের নাম স্রংস উপত্যকা (rift valley)। ভারত মহাসাগরে ও প্রশান্ত মহাসাগরেও এমনি স্রংস উপত্যকা আছে। আছে স্থলভাগেও—যেমন, আফ্রিকায়। লোহিত সাগর তৈরি হয়েছে আরব ও মিশরের মধ্যে

এমনি একটি ব্যাপার ঘটার ফলে। তবে স্থলভাগের স্রংস উপত্যকা বাতাসে ও ক্ষয়ের প্রক্রিয়ায় নষ্ট হয়ে যায়, মহাসাগরের তলদেশের স্রংস উপত্যকা অটুট থাকে। বিজ্ঞানীরা তাই পৃথিবীর গড়ন-সম্পর্কিত ইতিহাস জানার জন্য মহাসাগরের তলদেশের স্রংস উপত্যকার ওপরেই বেশি নির্ভর করেন।

মধ্য-আটলান্টিক গিরিশিরায় এমনি একটি স্রংস উপত্যকা পাওয়া যাচ্ছে। এই গিরিশিরার ওপরে ও কাছাকাছি থাকা শিলায় অনুসন্ধান চালিয়ে বিজ্ঞানীরা ভূত্বক সম্পর্কে ও মহাদেশের সঞ্চরণ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন।

আমাদের কাছে প্রশ্ন ছিল, মহাদেশগুলোর চলন কি-ভাবে ঘটে? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়েই মহাসাগরের গিরিশিরা ও তার মাঝ-বরাবর স্রংস উপত্যকার বিষয়ে আমরা জানতে পেরেছি। প্রশ্নটির জবাব পেতে হলে এইসঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করার আছে।

মহাসাগরের গিরিশিরার এলাকাতেই ভূমিকম্প ঘটে ও আগ্নেয়গিরির তৎপরতা চলে।

মহাসাগরের গিরিশিরার ওপরে পলল খুবই পাতলা। কিন্তু মহাদেশের দিকে পলল আরো পুরু ও আরো পুরনো।

মহাসাগরের ভূ-ত্বক অপেক্ষাকৃত নবীন শিলায় তৈরী। এই শিলার বয়স কোথাও ২০ কোটি বছরের বেশি নয়।

আগ্নেয়গিরির তৎপরতা চলার অবস্থা তৈরি হয় গিরিশিরার নিচে। তার ফলে মাঝেমাঝেই গিরিশিরার মাঝ-বরাবর খাত দিয়ে ফুটন্ত গলিত শিলা বেরিয়ে আসে। লাভার প্রবাহ নামে পর্বতের গা বেয়ে। আর যখনই উদ্‌গিরণ হয়, বাইরে বেরিয়ে আসা লাভার চাপে ঠেলা খেয়ে খাতের দুটি দিক ক্রমেই আরো দূরের দিকে সরে সরে যেতে থাকে। তারপরে সেই নতুন লাভা গিরিশিরার মাঝ-বরাবর খাতের মধ্যে ও পাশে শক্ত হয়ে ওঠে। তার ফল হয় এই যে

খাতের দুই দিকেই লাভার প্রবাহ দূরের দিকে ক্রমেই বেশি বেশি পুরনো হতে থাকে। অর্থাৎ, ব্যাপারটা যেন এই ঘটে যে গিরিশিরার দু-দিকে থাক্-থাক্ লাভা চলে গিয়েছে এবং ক্রমেই আরো পুরনো হতে হতে চলেছে।

এমনিভাবে মহাসাগরের গিরিশিরায় আগ্নেয়গিরির তৎপরতা
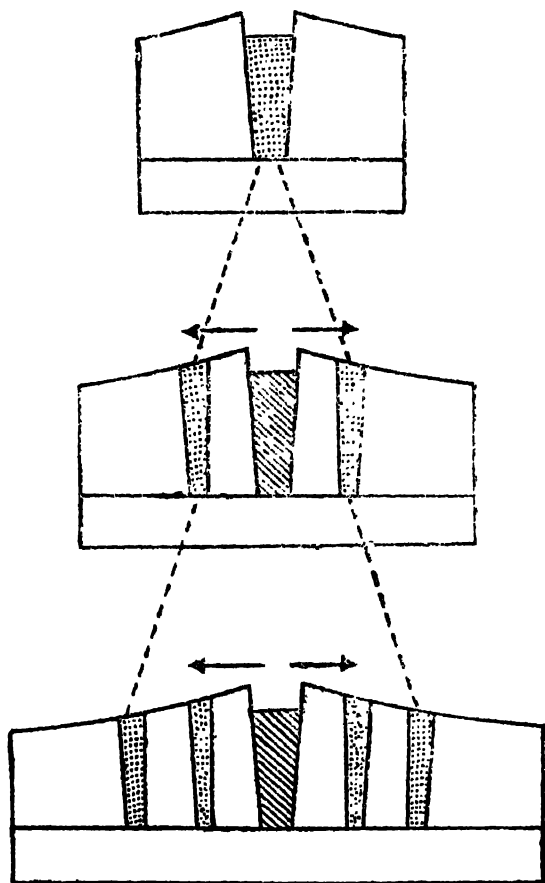
মহাসাগরের গিরিশিরার দুই দিকে থাক্ থাক্ লাভা ক্রমেই আরো দূরের দিকে চলে যাচ্ছে এবং পুরনো হতে হতে চলেছে।

চলে এবং তার ফলে মহাসাগরের ভূত্বকে গিরিশিরা বরাবর নতুন উপকরণ যুক্ত হতে থাকে।

মহাসাগরের গিরিশিরার এলাকায় খুব বেশিরকম ভূমিকম্প হয়। তার মানে ভূত্বকের নড়াচড়াও এখানে বেশিরকম। সেটা আরো বোঝা যাচ্ছে স্রংস উপত্যকা থেকে। স্রংস উপত্যকা তখনই তৈরি হয় যখন প্রচণ্ড শক্তির ক্রিয়ায় শিলায় টান পড়ে ও মস্ত একটা ফাঁক বেরিয়ে আসে। তার মানে, ধরে নেওয়া চলে, গিরিশিরার মাঝখানের খাতের দুটি ধার পরস্পর থেকে ক্রমেই দূরের দিকে চলে যাচ্ছে।

গিরিশিরার ওপরে পলল খুবই কম। এ থেকেও বোঝা যাচ্ছে, গিরিশিরা বেশিদিনের নয়। বেশিদিনের হলে অবশ্যই পলল জমত। সমুদ্রের পলল জমতে সময় লাগে। কিন্তু মহাদেশের দিকে মহাসাগরের তলদেশে পলল পুরু। এ থেকে ধরে নিতে হয়, মহাসাগরের ভূত্বক গিরিশিরার কাছে যতোটা পুরনো, মহাদেশের কাছে তার চেয়ে বেশি পুরনো।

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে ১৯৬০ সালে প্রথম বলা হয়, মহাসাগর বড়ো হয় গিরিশিরার কাছে বড়ো হতে হতে। মহাসাগরের তলদেশ ক্রমেই যেন আরো ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রক্রিয়াটিকেই বলা হয় সমুদ্রতলের সম্প্রসারণ (sea-floor spreading)।

মহাসাগরের তলদেশ যে আরো ছড়িয়ে পড়ে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে পুরা-চুম্বকত্ব থেকে। অর্থাৎ, গিরিশিরার কাছে লাভাপ্রবাহের শিলার চৌম্বক বিশ্লেষণ থেকে।

মধ্য-আটলান্টিক গিরিশিরার দু-ধারে শিলাগুলো যে ক্রমেই আরো বেশি বেশি পুরনো হয়ে চলেছে তা কি ভাবে জানা গেল? লাভা-প্রবাহের মধ্যে যে-সব খুদে খুদে চুম্বক থেকে গিয়েছে সেগুলোর বিশ্লেষণ থেকে। চুম্বকগুলোকে বলা চলে 'ফসিল' চুম্বক। জীবের ফসিল থেকে পুরাজীববিজ্ঞানীরা যেমন পুরাকালের কথা জানতে পেরেছেন, তেমনি এই ফসিল চুম্বক থেকে ভূ-বিজ্ঞানীরা জানতে
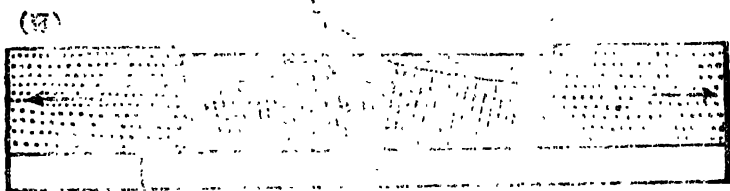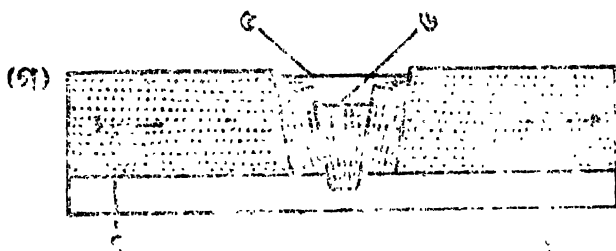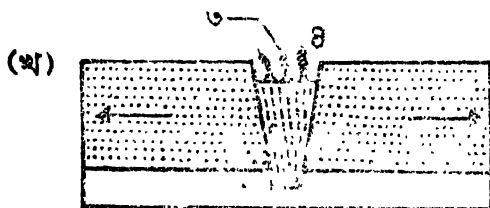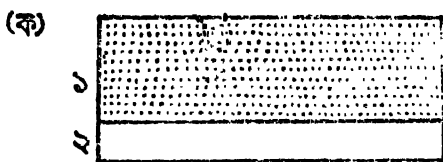
সমুদ্রতলের সম্প্রসারণ ও মহাদেশের সঞ্চরণ

(ক) চিত্রে : ১। মহাদেশ, ২। ম্যাণ্টল

(খ) চিত্রে : ৩। আগ্নেয়গিরি, ৪। ধ্বংস উপত্যকা।

(গ) চিত্রে : ৫। সমুদ্র, ৬। সমুদ্রের নিচে আগ্নেয়গিরির এলাকা,
৭। সঞ্চরণের দিক

(ঘ) চিত্রে : ৮। মহাসাগরের গিরিশিরা, ৯। মহাসাগর
১০। মহাদেশের ভূখণ্ড, ১১। মহাসাগরের নিচে ব্যাসল্টের ভূত্বক

পেরেছেন পুরাকালের ভূ-ত্বকের কথা, চৌম্বক মেরুর কথা ইত্যাদি। আমরা সকলেই দেখেছি পৃথিবীর চৌম্বক মেরু থাকার দরুন কম্পাসের কাঁটা কেমন উত্তর-দক্ষিণ বরাবর হয়ে থাকে। শিলা যখন তৈরি হচ্ছিল তার মধ্যে ছিল চৌম্বক লোহার ছোট ছোট কণিকা। এই কণিকাগুলো তখন পৃথিবীর দুই চৌম্বক মেরুর বরাবর হয়ে গিয়েছিল। তারপরে শিলা কঠিন হয়ে গেলে সেই অবস্থাতেই থেকে যায়। কোটি কোটি বছর পরেও সেই চৌম্বক লোহার কণিকাগুলোকে সেই অবস্থাতেই পাওয়া যাচ্ছে। এবং কোটি কোটি বছর পরেও কণিকাগুলোর চৌম্বক গুণ বজায় আছে। শিলার এই বিশেষ প্রকৃতিকে বলা হয় পুরা-চুম্বকত্ব। কথাটার অর্থ 'প্রাচীন চুম্বকত্ব'।

এবারে কোনো এক সময়ের একটি শিলা বিবেচনা করা যাক। এই শিলার মধ্যে আছে ফসিল চুম্বক, এবং এই ফসিল চুম্বক নিশ্চয়ই সে-সময়ের —অর্থাৎ, শিলাটি যখন তৈরি হচ্ছিল তখনকার —পৃথিবীর দুই চৌম্বক মেরুর বরাবর অবস্থায় ছিল। তারপরে শিলা কঠিন হয়ে গিয়েছে এবং ফসিল চুম্বকগুলো সেই অবস্থাতেই আছে। কোটি কোটি বছর পরে বিজ্ঞানী এই শিলা দেখে এখন বলতে পারেন সেই কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীর দুই চৌম্বক মেরু কোথায় কোথায় ছিল।

কিন্তু এমন যদি হয় যে পুরনো শিলাগুলোতে চৌম্বক কণিকা-গুলো যে বিশেষ দিক বরাবর হয়ে আছে, নতুন শিলাগুলোতে সেই দিক বদলে গিয়েছে। তাহলে ধরে নিতে হয় পৃথিবীর চৌম্বক মেরুরও জায়গা-বদল হয়েছে। এখানে মনে রাখা দরকার, পুরা-চুম্বকত্ব থেকে পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর যে-যে দিক পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে এখনকার পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর দিকের মিল নাও থাকতে পারে। পুরা-চুম্বকত্বের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গিয়েছে, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেন, গত ৩৫০ কোটি বছরে পৃথিবীর চৌম্বক মেরু অন্তত নয়বার সম্পূর্ণ উলটো

হয়ে গিয়েছে—অর্থাৎ উত্তর মেরু হয়েছে দক্ষিণ মেরু, দক্ষিণ মেরু হয়েছে উত্তর মেরু।

তার মানে, পৃথিবীর কোটি কোটি বছরের সময়কালে পৃথিবীর চৌম্বক মেরু ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থেকেছে। এই জায়গাগুলো একটি ভূ-গোলকের ওপরে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তখন দেখা যাবে অনেকখানি এলাকা জুড়ে চৌম্বক মেরুর ঘোরাফেরা। শুরু উত্তর আমেরিকার কাছে, তারপরে প্রশান্ত মহাসাগর ঘুরে, জাপান ও চীন পেরিয়ে এখনকার জায়গায় পৌঁছেছে। তারপরে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, চৌম্বক মেরুর ঘোরাফেরার এই রেখাচিত্র সব মহাদেশের বেলায় একরকম নয়। তখন তাঁরা বললেন, এটাই হচ্ছে প্রমাণ যে মহাদেশ-গুলোর সঞ্চরণ ঘটেছে। যদি সঞ্চরণ না ঘটত তাহলে চৌম্বক মেরুর ঘোরাফেরার রেখাচিত্র সব মহাকাশের বেলায় একই রকম হত।

এমনিভাবে মধ্য-আটলান্টিক গিরিশিরার দু-পাশের লাভা-

মহাসাগরের গিরিশিরার দুই দিকে ফসিল চুম্বকের বিন্যাস ১। সরে যাওয়ার দিক, ২। মহাসাগরের গিরিশিরা ৩। মহাসাগরের নিচের ভূত্বক, ৪। বিপরীত চুম্বকত্ব বিশিষ্ট ব্যাসল্ট, ৫। স্বাভাবিক চুম্বকত্ব বিশিষ্ট ব্যাসল্ট।
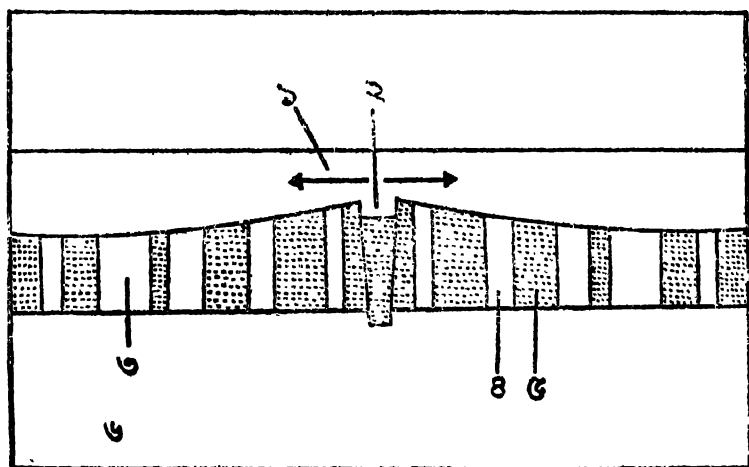
প্রবাহের ফসিল-চুম্বকগুলো থেকে মহাদেশের সঞ্চরণের পক্ষে বড়ো প্রমাণ পাওয়া গেল। শুধু এই একটি বিষয়ে নয়, সমুদ্র-তলের সম্প্রসারণ সম্পর্কেও এই ফসিল চুম্বকগুলো পরিষ্কার ধারণা দিতে পারে। দেখা গিয়েছে, একটি লাভা-প্রবাহে চুম্বকত্ব যেখানে স্বাভাবিক দিকে, তার পরের লাভা-প্রবাহের চুম্বকত্ব হয়ে গিয়েছে বিপরীত দিকে। তার মানে, প্রথম লাভা-প্রবাহ যখন ঘটেছিল তখন চৌম্বক মেরু ছিল এখন যেখানে আছে প্রায় সেখানেই। তারপরে কয়েক হাজার বছর পরে যখন দ্বিতীয় লাভা-প্রবাহ ঘটে তখন চৌম্বক মেরু উল্‌টে গিয়েছে—অর্থাৎ, উত্তর-মেরুর জায়গায় এসে গিয়েছে দক্ষিণ-মেরু, দক্ষিণ-মেরুর জায়গায় উত্তর-মেরু। এমনি-ভাবে পর-পর লাভাপ্রবাহ হয়ে গিয়েছে আর পর পর চৌম্বক মেরু বদলে গিয়েছে। এ যেন মহাসাগরের তলদেশের ছড়িয়ে পড়ার একটি ছবি—পরের পর কতকগুলো চৌম্বক পটি বা ফালি, একটিতে চুম্বকত্ব স্বাভাবিক দিকে, পরেরটিতে চুম্বকত্ব বিপরীত দিকে। এমনি একটির পর একটি—স্বাভাবিক, বিপরীত. স্বাভাবিক, বিপরীত—ডোরা-কাটা কাপড়ের মতো। কিংবা তুলনা করা চলে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে—গাছ যতোই বড়ো হয় ততোই তার গুঁড়িতে একটির পর একটি চক্র গড়ে ওঠে। মহাসাগর যতোই বড়ো হচ্ছে ততোই একটির পর একটি লাভাপ্রবাহের ফালি তৈরি হয়ে চলেছে।

মহাসাগরের গিরিশিরায় আরো একটি ব্যাপার বিজ্ঞানীরা লক্ষ করেছেন। তা হচ্ছে অজস্র বড়ো বড়ো ফাটল। দেখে মনে হতে পারে, মহাসাগরের কম-জোরী ভূ-ত্বক ছিঁড়ে-ফেঁড়ে তৈরি হওয়া চ্যুতি এগুলো। কিন্তু বিজ্ঞানীরা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, তা নয়, এগুলো অন্য ধরনের চ্যুতি, গিরিশিরা থেকে মহাসাগরের তলদেশের ছড়িয়ে পড়ার যে ক্রিয়া ঘটে চলেছে তার ফলে এই চ্যুতির দু-দিকের শিলার চলন অন্যরকমের। এবং এই চ্যুতির ফলে পাশের দিকে বড়ো রকমের স্খলন ঘটে। মহাসাগরের

তলদেশের ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত এই চ্যুতিকে বলা হয় রূপান্তরণ চ্যুতি (transform fault)।

মহাসাগরের তলদেশ সম্পর্কে যতো খবর জানা গেল তার মধ্যে আমাদের আলোচনার পক্ষে সবচেয়ে জরুরী বিষয়গুলো এই : মহাসাগরের তলদেশে গিরিশিরা, গিরিশিরার মাঝ-বরাবর খাত, খাত থেকে লাভাপ্রবাহ, লাভাপ্রবাহের শিলায় পুরা-চুম্বকত্ব, রূপান্তরণ চ্যুতি। এই বিষয়গুলো একসঙ্গে বিবেচনা করলে ধরে নিতে হয় যে সমুদ্রতল সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে।

সমুদ্রতলের সম্প্রসারণ—এই আবিষ্কার হবার পরে প্রশ্ন উঠল, মহাদেশের সঞ্চরণে সমুদ্রতলেব এই সম্প্রসারণ কি-ভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে ? বয়স নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, মহাসাগরের তলদেশের বয়স অপেক্ষাকৃত কম। আটলান্টিক মহাসাগরের বয়স দশকোটি বছরের বেশি নয়। তাহলে তার আগেকার কালে কী ঘটছিল ? মহাদেশের সঞ্চরণের ফলেই কি সমুদ্রতলের সম্প্রসারণ ? নাকি, সমুদ্রতলের সম্প্রসারণের ফলেই মহাদেশের সঞ্চরণ ? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ খুঁটিয়ে বিচার করলেন, বিশেষ করে খতিয়ে দেখলেন মহাসাগরের তলদেশের ফসিল চুম্বকগুলোর বিন্যাস। তখন দেখলেন, সমাধান একটিই হতে পারে। তা হচ্ছে, পৃথিবীর গোটা উপরিতলকে আলাদা আলাদা কতকগুলো খণ্ডে ভাগ করে দেখা। মহাসাগরের তলদেশ ও মহাদেশ মিলিয়ে এক-একটি খণ্ড, পাশাপাশি ও ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে তারা আছে। মহাসাগরে ও মহাদেশে বিভক্ত ভূপৃষ্ঠের যে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিভাগটি আমরা ধরে নিই সেটি এখানে খাটছে না। আর যদি ধরে নেওয়া হয় যে এই খণ্ডগুলো বা প্লেটগুলোর মধ্যে অনবরত ঠোকাঠুকি হয়ে চলে তাহলে তারই সাহায্যে মহাদেশের সঞ্চরণ, সমুদ্রতলের সম্প্রসারণ, পর্বত-গঠন ইত্যাদি সমস্ত ভূতত্ত্বীয় ব্যাপার ব্যাখ্যা করা চলে। এই তত্ত্বের নাম প্লেট টেক্‌টনিকস (Plate Tectonics)।

প্লেট টেক্‌টনিক্‌স

মহাদেশের সঞ্চরণ নিয়ে গবেষণার শুরু। তারপরে মহাদেশের সঞ্চরণের পক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ খুঁজতে গিয়ে আবিষ্কৃত হয় সমুদ্রতলের সম্প্রসারণ। এই দুটিকে যুক্ত করতে গিয়ে উপস্থিত করা হয় প্লেট টেক্‌টনিক্‌স তত্ত্ব। মহাদেশের সঞ্চরণ থেকে প্লেট টেক্‌টনিক্‌স—এই উত্তরণকে ভূ-বিজ্ঞানে এক বিপ্লব বলা হয়। এই প্রথম একটি তত্ত্ব পাওয়া যাচ্ছে যার সাহায্যে মহাদেশের সঞ্চরণ, চৌম্বক মেরুর ঘোরাফেরা, সমুদ্রতলের সম্প্রসারণ, ভূমিকম্পের বলয়, পর্বত-উত্থানের প্রক্রিয়া ও আরো এমনি সব দুরূহ বিষয়কে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা যায়।

এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে যে পৃথিবীর বাইরের দিকে একটি খোলক রয়েছে। আমরা জানি, পৃথিবীর উপরিতলটি হচ্ছে শিলামণ্ডল, তার নিচে মধ্যমণ্ডল বা ম্যাণ্টল। যে খোলকের কথা বলা হচ্ছে তার মধ্যে আছে শিলামণ্ডল ও ম্যাণ্টলের ওপরের দিকের খানিকটা অংশ, আশি থেকে একশো কিলোমিটার পুরু। এই খোলকটি রয়েছে ম্যাণ্টলের অপর একটি অংশের ওপরে যার নাম আস্‌থেনোমণ্ডল (Asthenosphere)। প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার পুরু এই আস্‌থেনোমণ্ডলে রয়েছে শিলা তৈরি হওয়ার উপকরণ—

(ডানদিকের পৃষ্ঠায়)

প্লেট টেক্‌টনিক্‌স তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে যে পৃথিবীর বাইরের দিকে একটি খোলক রয়েছে। শিলামণ্ডল ও ম্যাণ্টলের ওপরের দিকে খানিকটা অংশ নিয়ে আশি থেকে একশো কিলোমিটার পুরু এই খোলক। এই খোলক ছয়টি প্রধান খণ্ডে বা প্লেটে বিভক্ত। প্লেটগুলো পৃথিবীর উপরিতলে ভেসে বেড়িয়েছে। চিত্রে পৃথিবীর ছয়টি প্রধান প্লেট দেখানো হয়েছে। তীরচিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে কোন্ প্লেটের চলা কোন্‌দিকে। প্লেটগুলো এইরকম : (১) প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট, (২) আমেরিকান প্লেট, (৩) আফ্রিকা প্লেট, (৪) ইউরেশীয় প্লেট, (৫) ভারতীয় প্লেট ও (৬) কুমেরু প্লেট।
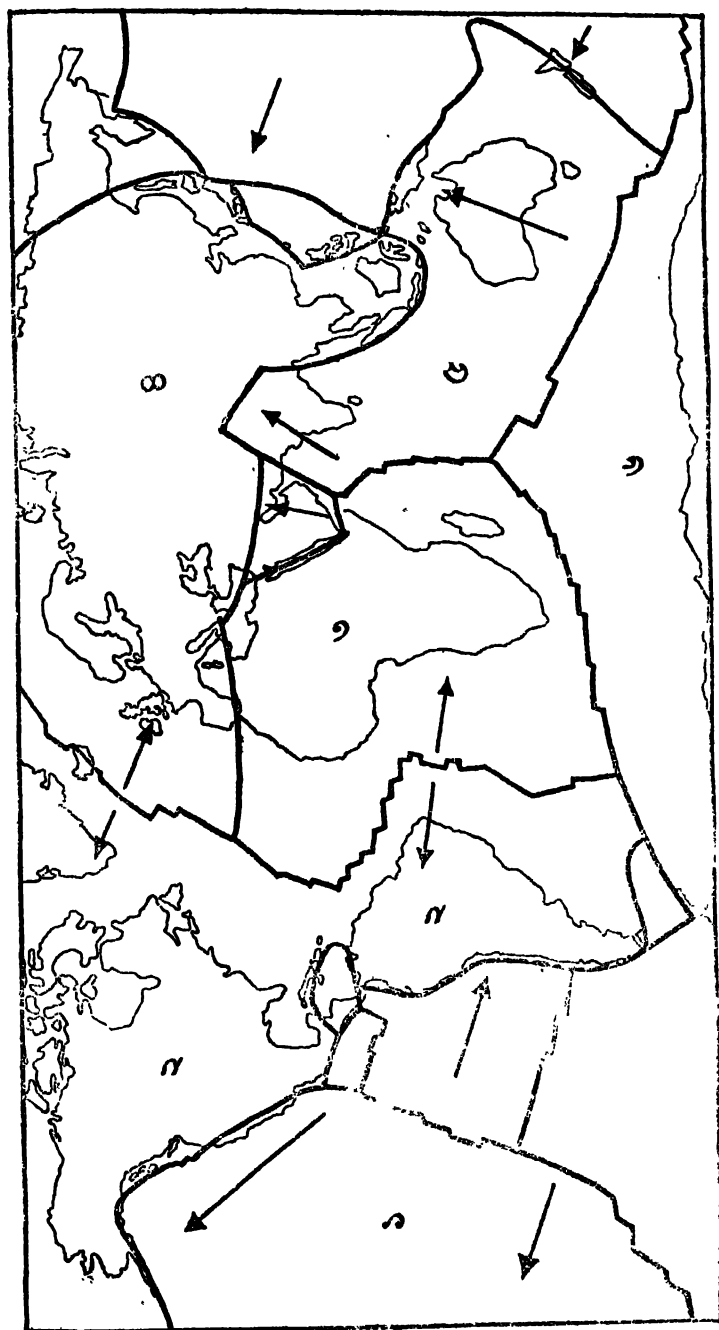
উত্তপ্ত, নরম ও অপেক্ষাকৃত দুর্বল। মধ্যমণ্ডলের এই অংশটি যথেষ্ট নমনীয়।

তত্ত্বে বলা হয়েছে, পৃথিবীর বাইরের এই খোলকটিকে ছয়টি প্রধান অনমনীয় খণ্ডে বা প্লেটে এবং আরো কয়েকটি ছোট প্লেটে ভাগ করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি প্লেট প্রায় একশো কিলোমিটার পুরু এবং তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে ম্যাণ্টলের ওপরের দিকের অংশ এবং মহাদেশের ও মহাসাগরের ভূত্বক। এই প্লেটগুলো আস্থেনোমণ্ডলের ওপরে ভেসে বেড়ায়—যেমন জলের ওপরে ভেসে বেড়ায় বরফের খণ্ড।

গোটা ভূতত্ত্বীয় সময়কাল ধরে এই ছয়টি প্রধান বড়ো প্লেট ও সেই সঙ্গে আরো কতকগুলো ছোট প্লেট পৃথিবীর উপরিতলে ভেসে বেড়িয়েছে। প্লেটগুলোর মধ্যে আছে যেমন মহাদেশের অংশ, তেমনি মহাসাগরের অংশ। কাজেই প্লেটের সঙ্গে সঙ্গে মহাদেশ ও মহাসাগরের অংশও চলাফেরা করেছে।

পরস্পরের বিচারে প্লেটগুলোর চলাফেরা তিন-রকমের হওয়া সম্ভব—একটি অপরটি থেকে দূরে সরে যেতে পারে, একটি অপরটির কাছে আসতে পারে, একটি অপরটির পাশ কাটিয়ে যেতে পারে।

সমুদ্রের নিচে যদি একটি প্লেট অপর প্লেট থেকে দূরে সরে যায় তাহলে মহাসাগরীয় গিরিশিরা তৈরি হয়। ম্যাণ্টল থেকে লাভা উঠে আসে, মাঝের খাত দিয়ে বাইরে প্রবাহিত হয় এবং নতুন উপকরণ যুক্ত হয় প্লেটের সঙ্গে।

দুটি প্লেট যখন পরস্পরের কাছাকাছি আসে তখন একটি প্লেট অপর একটি প্লেটের তলা দিয়ে চলে যায়। তলায় যেতে যেতে আস্থেনোমণ্ডলে হাজির হয় এবং সেখানকার উত্তাপে গলে গিয়ে ম্যাণ্টলের সঙ্গে মিশে যায়।

প্লেটের সঙ্গে প্লেটের ঠোকাঠুকি ঘটতে পারে তিনভাবে, কেননা প্লেটের মধ্যে যেমন থাকতে পারে মহাসাগরীয় ভূত্বক তেমনি মহাদেশীয়

ভূত্বক। প্রথমত, ঠোকাঠুকি হতে পারে মহাসাগরীয় ভূত্বকের সঙ্গে মহাসাগরীয় ভূত্বকের। এক্ষেত্রে ঠোকাঠুকির এলাকার ওপরে আগ্নেয়গিরির লাভা থেকে একটি দ্বীপমালা গড়ে ওঠে—যেমন গড়ে উঠেছে ফিলিপাইন। দ্বিতীয়ত, মহাসাগরীয় ভূত্বকের সঙ্গে মহাদেশীয় ভূত্বকের ঠোকাঠুকি হতে পারে। এক্ষেত্রে মহাদেশীয় প্লেট কুঁচকে গিয়ে পর্বতমালা সৃষ্টি হয়—যেমন হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটের সঙ্গে আমেরিকান প্লেটের ঠোকাঠুকি লাগার ফলে আন্দিজ পর্বতমালা। তৃতীয়ত, মহাদেশীয় ভূত্বকের সঙ্গে মহাদেশীয় ভূত্বকের ঠোকাঠুকি হতে পারে। এক্ষেত্রেও পর্বতমালা সৃষ্টি হয়—যেমন হয়েছে এশীয় প্লেটের সঙ্গে ভারতীয় প্লেটের ঠোকাঠুকির ফলে হিমালয় পর্বতমালা।

একটি প্লেট যখন অপর প্লেটের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায় সেখানে প্লেটের কিনারগুলো যেমন থাকার তেমনি থাকে—কিছু গড়েও ওঠে না, কিছু ধ্বংসও হয় না। এমনি দুই প্লেটের যেটা সীমান্ত সেখানে তৈরি হয় রূপান্তরণ চ্যুতি। অধিকাংশ রূপান্তরণ চ্যুতি পাওয়া যায় মহাসাগরীয় গিরিশিরার সঙ্গে। স্থলভাগেও পাওয়া যেতে পারে। স্থলভাগের একটি বিখ্যাত রূপান্তরণ চ্যুতি রয়েছে উত্তর আমেরিকার পশ্চিমে—স্যান আনড্রিয়াস চ্যুতি। প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট বছরে প্রায় ৫ সেন্টিমিটার হারে আমেরিকান প্লেটের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে—তারই ফলে এই চ্যুতি। ১৯০৬ সালে এই চ্যুতির কাছে নড়াচড়ার ফলে যে ভূমিকম্প হয় তাতে সান ফ্রান্‌সিস্‌কো শহরটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

প্লেট টেক্‌টনিক্‌স-এর এই ধারণা নিয়ে বিচার করলে পৃথিবী সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়, বহু জটিল ব্যাপারের পরিষ্কার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন, আমরা সহজেই বলতে পারি মহাসাগরের তলদেশের বয়স কেন মহাদেশের বয়সের চেয়ে অনেক কম। মহাসাগরের ভূত্বক মহাসাগরীয় গিরিশিরার কাছে অনবরত তৈরি হয়ে চলেছে, মহাসাগরের তলদেশ ছড়িয়ে পড়ছে, তারপরে

মহাসাগরের পরিখার নিচে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তার মানে, মহাসাগরের ভূত্বক খুব বেশিদিন টিকে থাকে না। অন্যদিকে মহাদেশের ভূত্বক এত বেশি ঘন নয় যে ম্যাণ্টলের মধ্যে ডুবে যেতে পারে, ফলে বহুকাল টিকে থাকে।

এই প্লেট টেক্‌টনিক্‌স দিয়েই আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি, ভূমিকম্পের এলাকা ও আগ্নেয়গিরি কেন বেশির ভাগ পাওয়া যায় পৃথিবীর উপরিতলে সরু একটা ফালির মধ্যে। এই সরু ফালিটা হচ্ছে প্লেটের সঙ্গে প্লেটের সংযোগ ঘটার জায়গায় দুই প্লেটের সরু কিনারা। এই কিনারাতেই ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরণ ঘটার অবস্থা তৈরি হয়ে থাকে। প্লেটের সঙ্গে প্লেটের যদি ধাক্কা লাগে তাহলে প্লেটের কিনার বেঁকে গিয়ে পর্বতমালা গড়ে ওঠে।

প্লেট টেক্‌টনিক্‌স থেকে আমরা আরো জানতে পারি, মহাদেশগুলো যে সঞ্চরণ করছে তার মানে এই নয় যে জলের ওপরে ভেলা ভেসে বেড়াবার মতো মহাদেশগুলো নিজেরাই ভেসে বেড়াচ্ছে। আসলে চলে বেড়াচ্ছে প্লেটগুলো, তাদের পিঠের ওপরে বোঝার মতো বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মহাদেশগুলোকে।

প্লেট টেক্‌টনিক্‌স থেকে এমনকি এই হদিসও পাওয়া সম্ভব যে তেল বা আকরিক খনিজের সন্ধান কোথায় করা যেতে পারে।

তবে প্লেট টেক্‌টনিক্‌স তত্ত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এই তত্ত্ব দিয়ে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে মহাদেশের সঞ্চরণ ও সমুদ্র-তলের সম্প্রসারণ ও পর্বতের উত্থান কোনো আলাদা ব্যাপার নয়—একই প্রক্রিয়ার অংশ মাত্র।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, এই বিশাল বিশাল প্লেটকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে যে বিরাট শক্তি দরকার সেটা আসছে কোত্থেকে ?

জবাবে বলা হচ্ছে, ম্যাণ্টল-এর পরিচলন স্রোত (convection current)। কনভেয়ার বেল্‌টের মতো ম্যাণ্টলের পরিচলন স্রোত বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ম্যাণ্টলের পরিচলন স্রোত কী? এবারে সেই আলোচনায় আসা যাক।

নমনীয় ম্যাণ্টল

একখণ্ড বরফের ওপরে হাতুড়ির ঘা মারলে বরফ গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যায়। অন্যদিকে, বিশাল বিশাল হিমবাহ উঁচু পর্বতের গা বেয়ে ঠিক নদীর মতোই নেমে আসে। একখণ্ড পিচের ওপরে হাতুড়ির ঘা মারলে পিচে ফাটল ধরে। কিন্তু সেই পিচের খণ্ডটিকেই টেবিলের ওপরে ফেলে রেখে দিলে দিন-কয়েকের মধ্যে প্রায় তরল পদার্থের মতোই ছড়িয়ে পড়ে।

বরফ ও পিচ, দুয়ের বেলাতেই দেখা যাচ্ছে—শক্তির প্রয়োগ অল্প সময় ধরে হলে একরকম আচরণ, বেশি সময় ধরে হলে অন্যরকম আচরণ। একই ভাবে আমরা আশা করতে পারি, ভূমিকম্পের ঢেউয়ের কাছে ম্যাণ্টল-এর যে গুণাগুণ ধরা পড়েছে (ভূমিকম্পের ঢেউ কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তার ক্রিয়া সম্পন্ন করে), আর পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে ক্রিয়াশীল শক্তির কাছে যে গুণাগুণ প্রকাশ করেছে—দুয়ের মধ্যে মিল নেই।

আমরা জানি, পৃথিবীর ভিতরে ম্যাণ্টল রয়েছে গলিত কোর বা অষ্ঠিকে ঘিরে। ভূত্বকের তলা থেকে শুরু হয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে প্রায় আধাআধি পর্যন্ত সবটা জুড়ে এই ম্যাণ্টল। আর ম্যাণ্টলের নিচেই অতি-উত্তপ্ত অষ্ঠি। ফলে অষ্ঠির উত্তাপ বাইরে ছড়াবার পথ পেতে পারে একমাত্র ম্যাণ্টলের মধ্যে দিয়েই। যদি ধরে নেওয়া হয় অষ্ঠির উত্তাপ কমেও না, বাড়েও না, যা আছে তাই থাকে, তাহলে অবশ্য অষ্ঠির উত্তাপ বাইরে ছড়ায় না। অর্থাৎ, অষ্ঠির উত্তাপ ম্যাণ্টলে সঞ্চারিত হবে এমন কোনো কারণ থাকে না। তখনো

কিন্তু ম্যাণ্টল উত্তপ্ত হয়ে ওঠার কিছু কারণ ম্যান্টলের মধ্যেই থেকে যায়। তা হচ্ছে ইউরেনিয়াম পটাসিয়াম ও থোরিয়াম পরমাণুর তেজস্ক্রিয় ক্ষয় থেকে উৎপন্ন উত্তাপ। এই উত্তাপ তুচ্ছ করার মতো নয়, ম্যাণ্টলের ওপরে তার বেশ ভালোরকমই ক্রিয়া ঘটে থাকে।

পরিচলন স্রোত

তাহলে আমাদের ধরে নিতে হয় যে ম্যাণ্টলের নিচে বা মধ্যে উত্তাপের উৎস আছে। এইসঙ্গে মেনে নিতে হয় যে চলন যদি অনেক সময় নিয়ে হয় ও যথেষ্ট আস্তে আস্তে হয় তাহলে ম্যাণ্টলের মধ্যে প্রবাহ তৈরি হতে পারে। এবার তাহলে ধারণা করা শক্ত নয় যে ম্যাণ্টলের মধ্যে পরিচলন স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। বছরে চার সেন্টিমিটার থেকে দশ সেন্টিমিটার তার গতি।

কেমন চেহারা এই পরিচলন স্রোতের? একটি পাত্রের মধ্যে তরল পদার্থ (ধরা যাক, জল) রেখে যদি সেটি ফোটানো যায় তাহলে পরিচলন স্রোত দেখা যেতে পারে। নিচের আগুনের আঁচে পাত্রের তলা গরম হয়। সেই গরম তলার সরাসরি সংস্পর্শে যে জল থাকে তাও গরম হয়ে ওঠে। গরম হলেই আয়তনে বাড়ে ও ঘনত্বে কমে যায়। ফলে সেই গরম জল ওপরে ওঠে। তখন ওপরের ঠাণ্ডা জল সেই জায়গাটি নেবার জন্য নিচে নামে। এই হচ্ছে পরিচলন স্রোত—নিচ থেকে ওপরে এবং ওপর থেকে নিচে। আর উপরিতলের দিকে তাকালে পরিচলন স্রোতের ছুটি লক্ষণ টের পাওয়া যায়—কোথাও উঁচু হয়ে ওপরে উঠছে, কোথাও গভীর হয়ে নিচে নামছে। ম্যাণ্টলের বেলাতেও তার পরিচলন স্রোতের এই ছুটি লক্ষণই ম্যাণ্টলের ওপরের দিকে আমরা টের পেতে পারি। ম্যাণ্টল রয়েছে ভূত্বকের ঠিক নিচেই। ফলে ভূত্বকের ওপরে এই ছুটি লক্ষণেরই ক্রিয়া ঘটে থাকে।

কাজেই ভূত্বকের ওপরে পরিচলন স্রোতের ক্রিয়া সবজায়গায় একরকম নয়। জায়গাটি যদি এমন হয় যে তার নিচে ম্যাণ্টলের পরিচলন স্রোত ওপরের দিকে উঠছে, তাহলে একরকমের ক্রিয়া। আর যদি এমন হয় যে তার নিচে ম্যাণ্টলের পরিচলন স্রোত নিচের দিকে নামছে তাহলে অন্যরকমের ক্রিয়া।

ধরা যাক, মহাদেশের নিচে পরিচলন স্রোত ওপরের দিকে উঠছে। উপরিতলে উঠে এই স্রোত ডাইনে ও বাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং নিচের দিকে নেমে যায়। ফলে তৈরি হয় মহাদেশটিতে ফাটল ধরার একটা অবস্থা। এই অবস্থাতেই স্রংস উপত্যকা তৈরি হয়ে থাকে। পূর্ব আফ্রিকা ও লোহিত সাগরের স্রংস উপত্যকা এই অবস্থারই চমৎকার দৃষ্টান্ত। লোহিতসাগরে মাপজোক নিয়ে জানা গিয়েছে, ফাটল ধরার ক্রিয়া এখানে এখনো চলছে, তার ফলে আরব উপদ্বীপ এখনো মোচড় খাচ্ছে এবং ওমানের চূড়োটিকে ঠেলে দিচ্ছে উল্টোদিকের ইরান-উপকূলের ভিতরে।

কয়েক কোটি বছর আগে এই পরিচলন স্রোতের ক্রিয়াতেই আফ্রিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল ভারতের ত্রিভুজাকার দক্ষিণাংশ ও মাদাগাস্কার।

আটলাণ্টিক মহাসাগরের নিচে পরিচলন স্রোত ওপরের দিকে উঠছে। তারই ফলে ইউরোপ ও আফ্রিকা থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে দুই আমেরিকা। ভূ-বিজ্ঞানীরা মাপজোক নিয়ে দেখেছেন, এই সরে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল ১২ কোটি বছর আগে। এই পরিচলন স্রোতের দরুনই তৈরি হয়েছে মধ্য-আটলাণ্টিক গিরিশিরা ও তার মাঝ-বরাবর খাত। খাতটি দেখে বোঝা যায়, মহাসাগরের তলদেশে অনবরত ছেঁড়া-ফাঁড়া চলেছে।

মধ্য-আটলাণ্টিক গিরিশিরা উত্তরের দিকে শেষ হয়েছে আইসল্যাণ্ডে। এই দ্বীপটিতে প্রায়ই প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরির তৎপরতা চলে। শিলার মধ্যে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর প্রকাণ্ড ফাটল দেখা দেয়

এবং তলা থেকে লাভা উঠে সেই ফাটল ভরাট করে। এমনিভাবে পরিচলন স্রোতের ক্রিয়ায় আইসল্যাণ্ড উত্তর-দক্ষিণ বরাবর ছিঁড়ে যাচ্ছে ও পুবে-পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ছে।
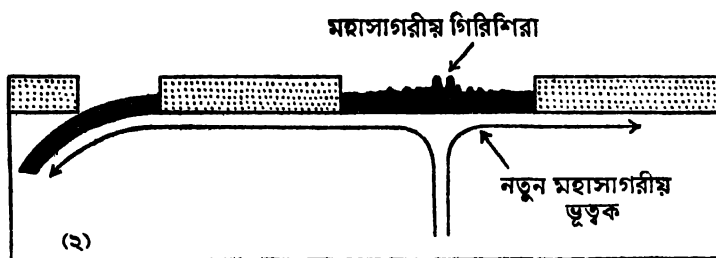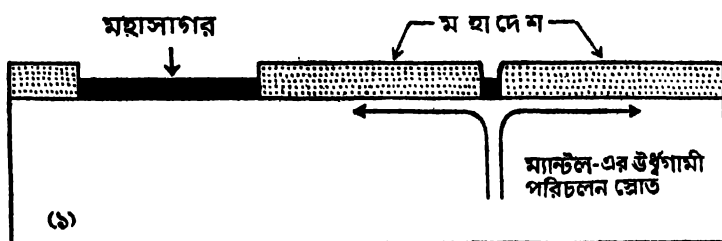
পৃথিবীর উপরিতলে যে-সব লক্ষণ প্রকাশ পায় সেগুলো এবং মহাদেশের সঞ্চরণ ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই ম্যাণ্টলের পরিচলন স্রোত দিয়ে পরিষ্কার ব্যাখ্যা করা যায়। ম্যাণ্টলের পরিচলন স্রোত ঊর্ধ্বগামী হলে তৈরি হয় স্রংস উপত্যকা ও মহাসাগরীয় গিরিশিরা। ম্যাণ্টলের পরিচলন স্রোত নিম্নগামী হলে মহাদেশে চাপ সৃষ্টি হয়, ভাঁজ পড়ে এবং উপরিতলের শিলা উত্থিত হয়। ম্যাণ্টলের পরিচলন স্রোত তৈরি হয় প্রধানত তেজস্ক্রিয়তার উত্তাপ থেকে এবং তার চলার মাত্রা বছরে কয়েক সেণ্টিমিটার মাত্র।

(ক) চিত্রে দেখানো হয়েছে ম্যাণ্টল-এর ঊর্ধ্বগামী পরিচলন স্রোত মহাদেশে স্রংস উপত্যকা সৃষ্টি করেছে।

(খ) চিত্রে দেখানো হয়েছে দুই মহাদেশ পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়েছে। তৈরী হয়েছে নতুন মহাসাগরীয় ভূ-ত্বক ও মধ্য-মহাসাগরীয় গিরিশিরা। বাঁ-দিকে দেখানো হয়েছে প্রাচীন মহাসাগরের ভূত্বক ম্যাণ্টলের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে এবং সেখানে সৃষ্টি হয়েছে পরিখা।

ম্যাণ্টলের পরিচলন স্রোতের জন্য পৃথিবীর উপরিতলে আরো অনেক কিছু ঘটতে পারে। যেমন, পর্বতমালা। এমনিতে পর্বতমালাকে দেখে মনে হয় ভূত্বকে যেন ভাঁজ পড়েছে বা ভূত্বক জায়গায় জায়গায় কুঁচকে গিয়েছে। এই যে ভূত্বক, এটি মাত্র চল্লিশ কিলোমিটারের মতো পুরু। আর সবচেয়ে উঁচু পর্বত শিখরের উচ্চতা নয় কিলোমিটারেরও কম। অন্যদিকে পৃথিবীরূপী গোলকটির ব্যাস প্রায় তের হাজার কিলোমিটার। এই গোলকের মধ্যে কেন্দ্রীয় এলাকাটুকু ও ভূত্বকের আবরণটুকু বাদ দিলে বাকি সবটাই ম্যাণ্টল। কাজেই এই ম্যাণ্টলের মধ্যে সামান্য এদিক-ওদিক হলেও ভূত্বকে তার বড়োরকমের ধাক্কা পৌঁছয়। এমন যদি হয় যে মহাদেশের নিচে ম্যাণ্টলের পরিচলন স্রোত নিচের দিকে নামছে, তাহলে তার ফলে ভূত্বকে ভাঁজ পড়তে পারে ও বৃহত্তম পর্বতমালা সৃষ্টি হতে পারে। তার ফলে মহাসাগরে সৃষ্টি হতে পারে গভীর পরিখা।

ম্যাণ্টলের ওপরে-ওঠা পরিচলন স্রোত থাকার জন্য মধ্য-মহাসাগরীয় গিরিশিরায় মহাসাগরের তলদেশ অনবরত তৈরি হয়ে চলেছে, মহাসাগরের তলদেশ ছড়িয়ে পড়ছে। অর্থাৎ, মহাসাগরের তলদেশ সবসময়েই চলমান।

ম্যাণ্টলের পরিচলন স্রোতকে কনভেয়ার বেল্‌টের সঙ্গে তুলনা করা চলে। এই বেল্‌টের ওপরের প্লেটগুলো (অর্থাৎ মহাদেশ ও মহাসাগর সমেত শিলামণ্ডল ও ম্যাণ্টলের ওপরের দিকের খানিকটা অংশ নিয়ে এক-একটি খণ্ড) চলেফিরে বেড়াচ্ছে।

পর্বত গঠন

পৃথিবীর উপরিতলে বিশাল বিশাল পর্বতমালা রয়েছে—এশিয়ায় হিমালয়, ইউরোপে আল্‌পস্‌, উত্তর আমেরিকায় রকি, দক্ষিণ আমেরিকায় আন্দিজ। এরা বিশাল শুধু আয়তনে নয়, উচ্চতাতেও।

যেমন, হিমালয়ের এভারেস্ট শিখরের উচ্চতা ৮,৮৪০ মিটার, অর্থাৎ নয় কিলোমিটারের কাছাকাছি। এটি বিশ্বে সবচেয়ে উঁচু শিখর। অন্যান্য শিখর আরো নিচু, তাহলেও তাদের মধ্যে পাঁচ-কিলোমিটারের বেশি উঁচু শিখর কম নয়। এই সমস্ত পর্বত কি-ভাবে তৈরি হল, সেটা এতকাল রহস্য বলে মনে হত। মানুষ শুধু কল্পনা করত, পর্বত হচ্ছে দেবতাদের বাসস্থান। পর্বত তাই মানুষের কাছে চিরকালই যেমন রহস্যময়, তেমনি মহিমময়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এইসব বিশাল পর্বতমালার বেশির ভাগটাই তৈরি হয়েছে পাললিক শিলায়। আমরা আগে জেনেছি, পাললিক শিলা তৈরি হয় সমুদ্রের তলদেশে। তার মানে, ধরে নিতে হয়, এখন যেখানে বিশাল পর্বতমালা দেখা যাচ্ছে সেখানে এককালে ছিল সমুদ্র। শুধু ধরে নেওয়া নয়, তার পক্ষে অকাট্য প্রমাণও রয়েছে। এই সমস্ত পর্বতমালা থেকে পাওয়া গিয়েছে সামুদ্রিক জীবের ফসিল। আর হিমালয়ে তো চুনাপাথর সহজেই চোখে পড়ে। সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ থেকে তৈরি হওয়া এই চুনাপাথর সমুদ্রের তলদেশ থেকেই এসেছে।

মনে হতে পারে, সমুদ্রতলে স্তরে স্তরে জমে ওঠা পাললিক শিলা যে-কোনো কারণে হোক উঁচু হয়ে উঠেছে আর তারই ফলে পর্বতমালার সৃষ্টি। পর্যবেক্ষণ করে জানা গিয়েছে যে শিলাস্তর উঁচু হয়ে উঠেছে পাশ থেকে চাপ বা ঠেলা পড়ার ফলে। ব্যাপারটা যেন এই যে ভূত্বকে পর-পর কতকগুলো ভাঁজ পড়ে গিয়েছে। অনেক পর্বতমালাতেই ভূত্বকের এই পর-পর সমান্তরাল ভাঁজগুলো চোখে পড়ার মতো।

আদিতে যা ছিল স্তরীভূত শিলা তা থেকেই পরে পাওয়া যাচ্ছে সুউচ্চ পর্বতমালা। ব্যাপারটি কি-ভাবে ঘটতে পারে তা ধারণা করতে গিয়ে আগেকার কালের বিজ্ঞানীরা এইরকম ভেবেছিলেন।

সমুদ্রের তলদেশে পলি জমা হচ্ছিল। পলি থেকে পাললিক

শিলা। পাললিক শিলার স্তরের ওপরে পাললিক শিলার স্তর। ক্রমে ক্রমে সেই স্তরের পর স্তর জমে ওঠা পাললিক শিলা হাজার হাজার মিটার পুরু হয়ে ওঠে। তাহলে কি সমুদ্রের তলদেশও সঙ্গে সঙ্গে উঁচু হয়ে উঠছিল? না, এটা এমন এক জায়গায় ঘটছিল যেখানে সমুদ্রের তলদেশ খানিকটা কমজোরী বা পলকা। পলি যতো জমছিল সমুদ্রের তলদেশও ততো দেবে বা নেমে যাচ্ছিল। অর্থাৎ, ব্যাপারটা যেন এই যে পলির চাপে সমুদ্রের তলদেশে প্রকাণ্ড একটা গর্ত তৈরি হচ্ছিল। এমনি গর্তকে বলা হয় জিওসিনক্লাইন (geosyncline)। জিও মানে ভূ আর সিনক্লাইন মানে অবতল। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, সমুদ্রের তলদেশে বিশাল এলাকা জুড়ে অবনমন।

নদীর জলের সঙ্গে মাটি, বালি, কাঁকর ইত্যাদি এসে পড়ছে সমুদ্রে। একটা ধারণা দেবার জন্য বলি, শুধু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নদীগুলো বছরে কমপক্ষে আশি কোটি টন গুঁড়ো পদার্থ ও কাঁকর সমুদ্রে এনে ফেলছে। আমাদের দেশের গঙ্গানদী এনে ফেলে প্রতিদিন প্রায় দশলক্ষ টন। ব্রহ্মপুত্র তার চেয়েও বেশি। পৃথিবীর সমস্ত নদীই এমনিভাবে পলি নিয়ে আসে। তাছাড়া, সমুদ্রে বাস করে অসংখ্য উদ্ভিদ ও জীব। তারা মারা যাবার পরে তাদের দেহাবশেষ সমুদ্রের তলদেশে পড়ে এবং পলির সঙ্গে মিশে যায়।

এমনিভাবে লক্ষ-লক্ষ বছর কাটে, এমনকি কোটি বছরও। আরো পলি এসে জমেছে, আর জীব মারা পড়েছে। বিরাট পুরু হয়ে ওঠে সেই পলি। নিচের দিকে প্রচণ্ড চাপ পড়তে থাকে আর সেই চাপে পলি হয়ে ওঠে সমুদ্রের পাললিক শিলা।

আরো সময় কাটে। আরো পলি জমা হয়। আরো পাললিক শিলা গড়ে ওঠে। আরো ওজন বাড়ে। ফলে সমুদ্রের তলদেশ আরো দেবে যায়। তৈরি হতে থাকে সমুদ্রের তলদেশে বিরাট এক খোঁদল বা জিওসিনক্লাইন।

এই জিওসিনক্লাইনেই পর্বতশ্রেণী ঠেলে উঠেছে।

এখানেই প্রশ্ন ওঠে। জিওসিনক্লাইনের স্তরীভূত শিলা যে হাজার হাজার মিটার উঁচু হয়ে গেল, তাকে সেই প্রচণ্ড ঠেলাটি দিল কে? কম কথা তো নয়—যে স্তরীভূত শিলা ছিল সমুদ্রের তলদেশে গভীর এক গর্তের মধ্যে, তাকে ঠেলা দিয়ে সমুদ্রের পিঠের ওপরেও হাজার হাজার মিটার উঁচু করে তোলা।

আগেকার কালের বিজ্ঞানীরা নানা তত্ত্ব দিয়ে এই প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোনো তত্ত্ব দিয়েই প্রশ্নটার ঠিকমতো জবাব দেওয়া যায়নি।

একটি হচ্ছে সংকোচন তত্ত্ব (contraction theory)। এখানে কথাটা এই যে পৃথিবীর ভিতরটা ক্রমেই ঠাণ্ডা হচ্ছে আর ঠাণ্ডা হতে থাকার দরুন সংকুচিত হচ্ছে বা ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর ভিতরটা যতো সংকুচিত হচ্ছে, বাইরের খোলস বা ভূত্বক ততো কুঁচকে যাচ্ছে। যেমন কুঁচকে যায় আপেল শুকিয়ে গেলে আপেলের খোসা। ভূত্বক কুঁচকে গেলে ভূত্বকে ভাঁজ পড়ে। ভূত্বকের ভাঁজকেই আমরা বলি পর্বত।

এই তত্ত্ব অনেক আগেই বাতিল হয়ে গিয়েছে।

অপর একটি তত্ত্ব হচ্ছে সমস্থিতিবাদ (Isostasy)। একদল বিজ্ঞানী ভূত্বকের সমস্ত অস্থিরতাকে এই তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন। ভূত্বক কোথাও কুঁচকে ছোট হয়ে যাচ্ছে, কোথাও ছড়িয়ে বড়ো হয়ে যাচ্ছে, কোথাও ভাঁজ হচ্ছে, কোথাও ভাঙছে—সবকিছুই সমস্থিতি বজায় রাখার জন্য। ব্যাপারটা কী?

পৃথিবীর ভিতরের দিক যে-সব পদার্থে তৈরি হয় তার চেয়ে পৃথিবীর বাইরের দিক বা ভূত্বক যে-সব পদার্থে তৈরি সেগুলো আরো হালকা। তার মানে ব্যাপারটা যেন এই দাঁড়াচ্ছে যে ভূত্বকের হালকা মহাদেশগুলো ভিতরের ভারী গলিত শিলার ওপরে ভেসে বেড়াচ্ছে। অন্যদিকে, আমরা জানি, এই পৃথিবী নিজের অক্ষের

চারদিকে প্রচণ্ডভাবে পাক খাচ্ছে। এখন ব্যাপারটা যদি এই হয় যে পাক-খাওয়া এই পৃথিবীর উপরিতলে মহাদেশগুলো সমানভাবে ছড়ানো নেই, তখন টাল ঠিক রাখার জন্যই মহাদেশগুলো জায়গা বদল করে। আর মহাদেশগুলো যেখানে রয়েছে ভাসন্ত অবস্থায় সেখানে এই তাগিদে মহাদেশগুলো অবশ্যই ভেসে বেড়াতে পারে।

পৃথিবীর উপরিতলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোথাও পাহাড়, কোথাও খাদ, কোথাও ভারী শিলা, কোথাও হালকা শিলা—অর্থাৎ ওজনগুলো ঠিক সমানভাবে ছড়ানো নয়। ফলে, উপরিতলকে সাজিয়ে-গুছিয়ে সবজায়গায় সমান ওজনের করে নেওয়ার দিকে একটা ক্রিয়া সব সময়েই ঘটে চলে। তারই ফলে ভূত্বকের এত ওঠানামা। এত অস্থিরতা। এই হচ্ছে সমস্থিতিবাদ।

এই তত্ত্ব অনুসারে পর্বত তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াটি এই রকম।

দুটি মহাদেশ ভাসতে ভাসতে আরো কাছাকাছি হচ্ছে। আর এই দুই মহাদেশের মাঝখানে রয়েছে সমুদ্র, সমুদ্রের তলদেশে জিও-সিনক্লাইন। এই অবস্থায় ক্রমেই কাছাকাছি হতে থাকা দুই মহা-দেশের চাপে জিওসিনক্লাইনের স্তরীভূত পাললিক শিলা প্রচণ্ড ঠেলা খেয়ে উঁচু হয়ে ওঠে। এমনিভাবে সৃষ্টি হয় এক ধরনের পর্বত, যাকে বলা হয় ফোল্ড মাউন্টেন বা ভঙ্গিল পর্বত। হিমালয় এমনি এক ফোল্ড মাউনটেন। ইউরোপের আল্প্স, উত্তর আমেরিকার রকি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ একই ধরনের পর্বত।

পর্বত অবশ্যই অন্য ধরনের হতে পারে। আর পর্বত যে সব সময়ে জিওসিনক্লাইন থেকেই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এমনও হতে পারে, নিচের থেকে ঠেলা পেয়ে খানিকটা জায়গা উঁচু হয়ে উঠল। এত উঁচু যে পর্বতের শামিল। তাহলে সেটিও অবশ্যই পর্বত, অন্য ধরনের পর্বত। যেমন, আরাবল্লী পর্বতমালা। রাজ-পুতানার শিলারাজি নিচের থেকে ঠেলা পেয়ে পর্বতের মতো উঁচু হয়ে

উঠেছিল। এই ধরনের পর্বতকে বলা হয় ব্লক মাউন্টেন বা পিণ্ড পর্বত। পৃথিবীর বহু জায়গায় ব্লক মাউন্টেন রয়েছে।

আরেক ধরনের পর্বতকে বলা হয় রেসিডুয়েল মাউন্টেন বা অবশিষ্ট পর্বত। এখানে ব্যাপারটা এই রকম: একটি ভূ-ভাগে চারদিকের শিলা জলেবাতাসে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে। টিকে আছে মাঝখানটুকু, কেননা সেখানে শিলা হয়তো আরো কঠিন বা ক্ষয়ের ক্রিয়া আরো কম। ক্ষয়-না-হওয়া এই মাঝখানটুকু একটা পর্বতের চেহারা নিতে পারে। এমনি ধরনের পর্বতকে বলা হয় রেসিডুয়েল মাউন্টেন। ভারতের পূর্বঘাট এমনি এক রেসিডুয়েল মাউন্টেন।

ব্লক মাউন্টেন বা রেসিডুয়েল মাউনটেন কেমনভাবে হচ্ছে সেটা কল্পনা করা শক্ত নয়। কিন্তু ফোল্ড মাউন্টেন বা ভঙ্গিল পর্বতমালা কী-ভাবে হচ্ছে? সেটা কি কল্পনা করা যায়? হিমালয়ের কথাই ধরা যাক। হিমালয় কি-ভাবে হয়ে উঠল?

হিমালয়ের কথা

হিমালয় কি-ভাবে হল সেটা একেবারে গোড়া থেকে দেখা যাক। কিন্তু এই দেখার জন্য শুধু হিমালয় নয়, আরো অনেক কিছু দেখতে হয়। শেষপর্যন্ত দেখতে হয় পৃথিবীর উপরিতলের আজকের দিনের চেহারাটি কেমন করে পাওয়া যাচ্ছে। কুড়ি কোটি বছর আগে থেকে শুরু করছি যখন পৃথিবীতে ডাইনোসরদের আধিপত্য চলছিল এবং পৃথিবীর সমস্ত মহাদেশ একসঙ্গে আঁটা ছিল।

কুড়ি কোটি বছর আগে—তার মানে সময়টা ছিল মধ্যজীবীয় অধিযুগের জুরাসিক যুগ। পৃথিবীর স্থলভাগ বলতে ছিল অখণ্ড এক অতি-মহাদেশ—তার নাম প্যান্‌জিয়া। এই অতি-মহাদেশটির একটি ছবি আগে আমরা দিয়েছি। ছবিটি কাল্পনিক নয়।

বিজ্ঞানীরা অনেকগুলো সূত্রের সাহায্যে প্যান্‌জিয়ার এই আকারটি খাড়া করেছেন। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আকারটিতে ভুল নেই।

ছবির দিকে (পৃঃ ১২২) তাকালে দেখা যাবে, প্যানজিয়ার আকার অনেকটা বাংলা ৫-এর মতো। উত্তরদিকে রয়েছে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়াকে নিয়ে লরেসিয়া। দক্ষিণদিকে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও কুমেরু নিয়ে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড।

আর এই ৫-এর মধ্যিখানটা যেখানে ভিতরে ঢুকে এসেছে, সেখানে আছে একটি মহাসাগর—নাম টেথিস। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মাঝখানটা জুড়ে এই মহাসাগর। মনে হতে পারে, টেথিস মহাসাগর যেন পৃথিবীর ভূখণ্ডকে দুই ভাগে ভাগ করে দিচ্ছে। লক্ষ করার বিষয়, এশিয়াকে পাওয়া যাচ্ছে টেথিস মহাসাগরের উত্তরে, আর ভারতকে দক্ষিণে। এক থেকে অপরটি বহু দূরে।

আঠারো কোটি বছর আগে প্যান্‌জিয়ায় ভাঙন ধরে। তারপরে টুকরো টুকরো অংশগুলো আলাদা হয়ে যেতে থাকে। আফ্রিকার একদিক থেকে আলাদা হয়ে যায় দক্ষিণ আমেরিকা, অন্যদিক থেকে কুমেরু। ইউরোপ থেকে আলাদা হয়ে যায় উত্তর আমেরিকা। দুই আমেরিকা আলাদা হয়ে যেতে পিছনে তৈরি হয় আটলান্টিক মহাসাগর। আর ভারতের ভূখণ্ড যাত্রা শুরু করে এশিয়ার দিকে—টেথিস মহাসাগর পেরিয়ে। যেতে যেতে সামনের দিকে টেথিস মহাসাগরকে ধ্বংস করে আর পিছনের দিকে তৈরি হয় ভারত মহাসাগর।

প্রায় ছয়কোটি বছর আগে ভারতের ভূখণ্ড এসে এশিয়ার দক্ষিণ উপকূলে ধাক্কা মারে। তার ফলে প্রচণ্ড একটা ঠেলা তৈরি হয়ে যায়। আর তারই ফলে হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি।
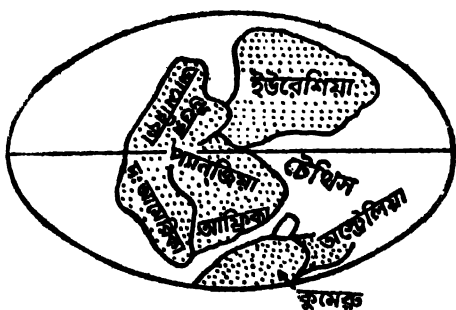
কুড়ি কোটি বছর আগে—সময়টা তখন ছিল মধ্য-জীবীয় অধিযুগের জুরাসিক যুগ। পৃথিবীর স্থলভাগ বলতে ছিল অখণ্ড এক অতি-মহাদেশ—প্যানজিয়া।

আঠারো কোটি বছর আগে—তার মানে জুরাসিক যুগের মাঝামাঝি। প্যানজিয়া অতি-মহাদেশে ভাঙন ধরেছে। টুকরো টুকরো অংশগুলো আলাদা হয়ে যাচ্ছে।
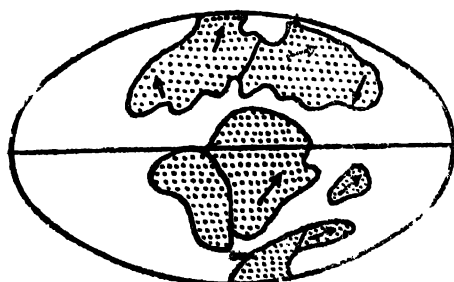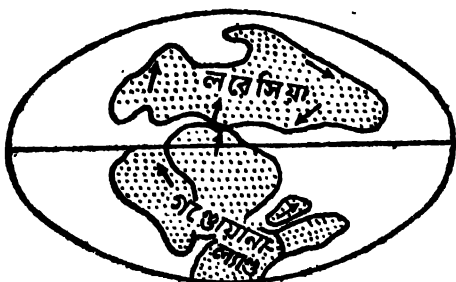
সাড়ে-তের কোটি বছর আগে—ক্রীটেশাস যুগের গোড়ার দিকে। টুকরো-গুলো আরও দূরে দূরে সরে গিয়েছে।

সাড়ে-ছয় কোটি বছর আগে—নবজীবীয় অধি-যুগের প্যালিওজিন যুগের ইয়োসিন উপযুগের শুরুর দিকে।
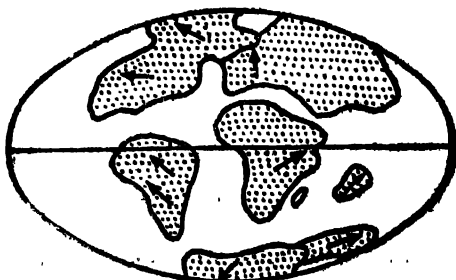
বর্তমানে
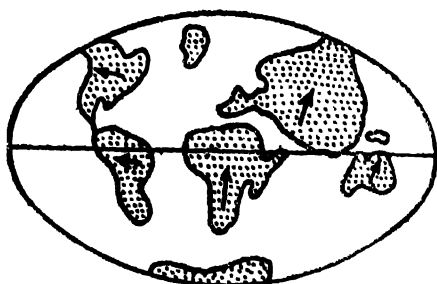
আজ থেকে পাঁচকোটি বছর পরে কী হতে পারে।

পৃথিবীর স্থলভাগে যতো বড়ো বড়ো পর্বতমালা দেখা যাচ্ছে সবই এমনিভাবে মহাদেশের সঞ্চরণের ফলে তৈরি।

তারপরে যখন জানা গেল যে মহাসাগরের তলদেশেও রয়েছে হাজার-হাজার কিলোমিটার লম্বা গিরিশিরা, সমুদ্রের তলদেশ সম্প্রসারিত হচ্ছে, দ্বীপপুঞ্জমালা ও আগ্নেয়গিরি তৈরি হচ্ছে—তখন সব মিলিয়ে ব্যাখ্যা করার জন্য ভূ-বিজ্ঞানীরা যে বৈপ্লবিক তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন তার নাম প্লেট টেক্‌নিকস। তত্ত্বটি গড়ে উঠেছে গত কুড়ি বছরের মধ্যে—বিশেষ করে ষাটের ও সত্তরের দশকে। এই তত্ত্ব ভূ-বিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটিয়েছে। তত্ত্বটি নিয়ে আগে একবার আমরা আলোচনা করেছি, এবারে একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক।

পৃথিবীর উপরিতলকে ভাবা যেতে পারে বাদামের শক্ত খোলকের মতো। এই খোলকের নানা জায়গায় ফাটল ধরেছে। ভাঙা টুকরোগুলোকে বলা হয় প্লেট, প্রায় ১০০ কিলোমিটার পুরু। প্লেটগুলো কিন্তু স্থির হয়ে নেই, সবসময়ে নড়াচড়া করছে আর

ধাক্কাধাক্কি করছে। এই প্লেটগুলোর কিনারে বহু পরিবর্তন ঘটে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যিখানের এলাকা মোটামুটি শান্ত ও সুস্থির।

আগে আমরা কয়েকটি ছবিতে পৃথিবীর ভূমিকম্পের এলাকা, (পৃঃ ৯০), আগ্নেয়গিরির অবস্থান (পৃঃ ৯৮) এবং বিভিন্ন প্লেটের গতির দিক (পৃঃ ১৪৭) দেখিয়েছি। পৃথিবীর মানচিত্রের ওপরে এই ব্যাপার-গুলোকে যদি একসঙ্গে তুলনা করে দেখি তাহলে স্পষ্ট একটা ছক যেন বেরিয়ে আসে। দুটি প্লেট যেখানে মিলিত হয় সেখানেই সাধারণত ঘটে থাকে ভূমিকম্প—যেমন ঘটছে ক্যালিফোর্নিয়ায় বা জাপানে। অধিকাংশ আগ্নেয়গিরিকে পাওয়া যায় প্লেটের কিনারে। মহাসাগরের তলদেশে যে গিরিশিরা রয়েছে তার অবস্থানও প্লেটের কিনার বরাবর। হিমালয়ের মতো বড়ো বড়ো পর্বতমালাকেও পাওয়া যায় প্লেটের কিনারের কাছাকাছি। ছকটি অতি সরল—পৃথিবীর উপরিতলের বেশির ভাগ ক্রিয়াকাণ্ডই চলে প্লেটের কিনারে, কিনার থেকে দূরের অংশে ক্রিয়াকাণ্ড সামান্যই।

প্লেটগুলোর নড়াচড়া তিনধরনের হতে পারে, যার দরুন এই সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড ঘটে থাকে। প্লেট থেকে প্লেট দূরে সরতে পারে। তখন মাঝখানের ফাঁক ভরাট করার জন্য তলা থেকে উঠে আসে নতুন গলিত শিলা। প্লেটের সঙ্গে প্লেট মিলিত হতে পারে। এক্ষেত্রে একটি প্লেট (যার জোর কম, যেমন মহাসাগরীয় প্লেট) চলে যায় অপর প্লেটের (যার জোর বেশি, যেমন মহাদেশীয় প্লেট) নিচে। জাপানের উপকূলে এমনি ব্যাপার ঘটেছে। ফলে মহাসাগরীয় প্লেটটি ধ্বংস হচ্ছে এবং গড়ে উঠেছে একটি গভীর পরিখা এবং একসারি আগ্নেয়গিরির দ্বীপ। এই দুটি ছাড়া আর যে-ধরনের নড়াচড়ার কথা ভাবা যেতে পারে তা হচ্ছে একটি প্লেটের পাশ কাটিয়ে অপর প্লেটের বেরিয়ে যাওয়া। এক্ষেত্রে চ্যুতি (ট্রান্স্ফর্ম) সৃষ্টি হয়, যেমন হয়েছে ক্যালিফোর্নিয়ায়।

প্লেটগুলো এই যে নড়াচড়া করছে তা চোখে পড়ার মতো নয়।

তার গতি সারা বছরে দু-সেন্টিমিটার থেকে দশ-সেন্টিমিটার পর্যন্ত। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এই গতি সমানে চলেছে। আমরা শুধু ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির আকারে তার ফলটুকু টের পাই।

মহাদেশ তৈরি হয়েছে খুবই হালকা শিলায়। আরো ভারী শিলায় তৈরি প্লেটের ওপরে মহাদেশ যেন ভাসছে। প্লেট যখন নড়াচড়া করে তখন এই মহাদেশকেও যাত্রীর মতো সঙ্গে নিয়ে চলে।

প্লেটের গতির ফলে মহাসাগর সৃষ্টি হতে পারে বা ধ্বংস হতে পারে। দুটি প্লেট যখন আলাদা হয়ে যায় তখন নতুন শিলা সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সমুদ্রের তলদেশ সম্প্রসারিত হয়ে চলে। দুটি প্লেট যখন মিলিত হয় তখন সমুদ্র লোপ পেতে পারে।

মহাদেশ যে চলে তার কারণ মহাদেশ রয়েছে প্লেটের ওপরে, আর এই প্লেট চলছে। চলার মাপ বছরে দু-সেন্টিমিটার থেকে দশ-সেন্টিমিটারের বেশি নয়। কিন্তু এই মাপেই লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে চলতে-চলতে হাজার-হাজার কিলোমিটার পার হয়ে যায়। আর তখন এমনও ঘটে যে মহাদেশের সঙ্গে মহাদেশের লেগে যায় ঠোকাঠুকি আর তখনই সৃষ্টি হয় পর্বত।

কিন্তু এই প্লেটগুলো চলছে কিসের জোরে? কোন্ শক্তি চালাচ্ছে? বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবীর মধ্যমণ্ডলে বা ম্যাণ্টলে উত্তাপের স্রোত রয়েছে। এই স্রোত ওপরে ওঠে ও নিচে নামে— যেমন ঘটে থাকে ফুটন্ত জলের মধ্যে। একে বলা হয় পরিচলন স্রোত। এই পরিচলন স্রোত অনেকটা কনভেয়র বেলটের মতো প্লেটগুলোকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আর চলতে চলতে যখনই প্লেটের সঙ্গে প্লেটের ঠোকাঠুকি লাগে তখনই পর্বত সৃষ্টি হয়। প্রায় ছয়কোটি বছর আগে ভারত এগিয়ে এসে এশিয়াকে ধাক্কা মেরেছিল আর তারই ফলে তৈরি হয়েছে হিমালয়। ইতালি এগিয়ে এসে ইউরোপকে ঢুঁ মেরেছে আর তারই ফলে উঁচু হয়ে উঠেছে আল্‌প্‌স।

দুই আমেরিকা সরে গিয়েছে পশ্চিমের দিকে আর প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—পিছনে তৈরি হয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর আর সামনে আন্দিজ পর্বতমালা ও রকি পর্বতমালা। আফ্রিকার বিশাল ভূখণ্ড অতি ধীরে ইউরোপের দিকে এগিয়ে আসছে এবং গ্রীস ও তুরস্কের প্লেটদুটোকে চেপে ধরেছে। ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে ভূমধ্যসাগর লোপ পাবে, সে-জায়গায় মাথা তুলবে আরো একটি পর্বতমালা।

প্লেটগুলো চলতেই থাকবে। মহাদেশে মহাদেশে ঠোকাঠুকি হতেই থাকবে। নতুন নতুন পর্বতমালা তৈরি হয়েই চলবে। অবশ্যই দু-দশ বছরে নয়, লক্ষ-লক্ষ বা এমনকি কোটি-কোটি বছর সময় নিয়ে।

পৃথিবীর রূপকার

পৃথিবীর উপরিতলে কতই না রূপ ফুটে থাকে। যে স্থপতি এই রূপ সৃষ্টি করে তার নাম ভাঙন ও ক্ষয়। এই ভাঙন ও ক্ষয় সবসময়েই হয়ে চলেছে—অতীতেও চলেছিল, এখনো চলেছে। আর এই ভাঙন ও ক্ষয়ের জন্যই পৃথিবীর উপরিতলের চেহারা বদলে যাচ্ছে ও নতুন নতুন রূপ নিচ্ছে।

ভাঙনের দৃষ্টান্ত দিতে হলে প্রথমেই ভূমিকম্পের কথা ওঠে। আমাদের দেশে বিধ্বংসী ভূমিকম্প খুবই কম। কিছুকাল আগে হয়েছিল হিমাচলে, তারও অনেক আগে বিহারে। কিন্তু যে-সব দেশ ভূমিকম্পের বলয়ের মধ্যে পড়ে—যেমন, জাপান, চীন, পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি—সেখানে তো প্রায়ই ভূমিকম্প হয়, বহু লোক মারা পড়ে ও বড়ো বড়ো শহর ধ্বংস হয়ে যায়। তবে প্লেট-টেকনিক্স তত্ত্ব থেকে আমরা জেনেছি, ভূমিকম্প হয়ে থাকে প্লেটের কিনারায়। তেমনি, মধ্যমহাসাগরীয় গিরিশিরা, দ্বীপপুঞ্জমালা, আগ্নেয়গিরি ও পর্বতমালার

উদ্ভবও প্লেট থেকে প্লেটের দূরে সরে যাওয়া বা প্লেটের সঙ্গে প্লেটের ধাক্কা খাওয়ার ফলে।

ভূমিকম্প ছাড়াও ভাঙন আরো নানাভাবে ঘটে থাকে। খোলা জায়গায় পড়ে থাকলে এমনকি বড়ো বড়ো পাথরেও ভাঙন ধরে। একে বলা হয় আবহিক বিকার বা বিচূর্ণীভবন। নদীর উপত্যকা তৈরি হয় জলের স্রোতে, এ তো চোখের সামনেই ঘটছে। সিন্ধু, ভাগীরথী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী, বিপাশা, শতক্রু ও এমনি সব নদী যে-ভাবে হিমালয়ের শিলা ফাটিয়ে পথ করে নিয়েছে, তেমন ফাটল হাজারটা ডিনামাইট ফাটিয়েও ধরানো যেত না। অন্যদিকে এই নদীর স্রোতই সঙ্গে নিয়ে চলে কাঁকর, মাটি, বালি ইত্যাদি এবং শেষপর্যন্ত সমুদ্রে নিয়ে ফেলে। নদীর জলে বাহিত এই যে পলি তা পর্বতের গা থেকে জমির গা থেকে ধুয়ে ধুয়ে নিয়ে আসা। অর্থাৎ, জল বহমান থাকলেই ক্ষয় ঘটিয়ে চলে।

এমনিভাবে ভাঙন ও ক্ষয় ঘটতে পারে হিমবাহের চলার ফলে, ধস নামার ফলে, ও আরো অনেক উপায়ে। এরা যেন স্থপতি, সব-সময়ে পৃথিবীর উপরিতলের রূপ ফুটিয়ে তুলছে। কারও কাজ খুবই আস্তে আস্তে, চোখে পড়ে না এমনভাবে। আবার কেউ কেউ ঘা দিচ্ছে বিদ্যুতের মতো মারাত্মক গতিতে। কিন্তু যে যে-ভাবেই কাজ করুক, শেষপর্যন্ত অবধারিত ফল দাঁড়ায়—বদলে যাওয়া।

পৃথিবী সবসময়ে বদলে যাচ্ছে, অতীতে বদলেছে, এখন বদলাচ্ছে, ভবিষ্যতে বদলাবে। জল ও বাতাস যদি থাকে তো বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ের ক্রিয়া চলতেই থাকবে এবং বদল হতেই থাকবে। চাঁদে বাতাসও নেই, জলও নেই—চাঁদের উপরিতলে কোনো বদলও নেই। চাঁদের উপরিতল তিনশো-কোটি বছর আগে যেমন ছিল এখনো তাই আছে।

কিন্তু পৃথিবীর চেহারা গত তিনশো কোটি বছরে অনবরত বদলেছে। ভূ-বিজ্ঞানীরা নানাভাবে সন্ধান চালিয়ে এই বদলের অনেক সাক্ষ্য পেয়েছেন। আর লক্ষ করেছেন, এত যে বদল তার অনেকখানিই ঘটিয়েছে জল। তাই জলকে তাঁরা মনে করেন পৃথিবীর চেহারা গড়ে তোলার সেরা কারিকর। এই জল যখন নদী দিয়ে বয়ে চলে তখন জমিতে ক্ষয় ঘটিয়ে নদীর খাতকে করে তোলে আরো চওড়া ও আরো গভীর। এই জল যখন মাটির ভিতরে চুইয়ে চুইয়ে ঢোকে তখন খনিজকে পর্যন্ত গলিয়ে ফেলে। এই জল যখন সমুদ্র থেকে তীরের ওপরে আছড়ে পড়ে তখন কঠিন শিলা পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। জলের বেগে পাহাড়ের শিলায় ফাটল ধরে এবং নদী পথ কেটে নেয়।

তবে, একটি কথা আছে। জলকে যদি সেরা কারিকরের কাজ করে যেতে হয়, অর্থাৎ, ভাঙন ও ক্ষয় চালিয়ে যেতে হয়--তাহলে বিপুল পরিমাণ জল বহমান থাকা চাই। আর সত্যি সত্যিই তাই আছে। ব্যাপারটি ঘটে এইভাবে।

সূর্যের তাপে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে আকাশে ওঠে, সেখানে জমাট বেঁধে জলীয় বাষ্পের মেঘ হয়, সেই মেঘ বাতাসে ভাসতে ভাসতে মহাদেশের ওপরে আসে, সেখানে বৃষ্টি বা তুষার হয়ে ঝরে পড়ে।

বেশির ভাগ জল আবার সেই মহাসাগরেই পড়ে। কিন্তু মহাদেশের ওপরে যতোটুকু পড়ে তাও বড়ো কম নয়। এই জলের খানিকটা উবে গিয়ে আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। বাকিটা স্রোত হয়ে নেমে আসে কিংবা মাটির নিচে জমা জলের স্তরে ঢুকে পড়ে। সেখান থেকে শেষপর্যন্ত আবার সমুদ্রে ফিরে আসে। এই হচ্ছে জলের চক্র। এই চক্র হয়েই চলেছে, হয়েই চলেছে—তার কোনো শেষ নেই। শুরু আছে কিনা তাও বলা শক্ত। চারশো-কোটি বছর

আগেও এই চক্রটি চলছিল। পৃথিবীর উপরিতলে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে বহমান জলের দরুন কোনো-না-কোনো ছাপ পড়েনি। পৃথিবীর উপরিতলকে গড়াপেটার কাজে একটানা সক্রিয় রয়েছে এই বহমান জল। ভূ-স্থাপত্য রচনায় এত বড়ো ভূমিকা আর কারও নেই।

বেশির ভাগ জলই গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। গড়ানে জল জমিতে ক্ষয় ধরায়। তার ফলে উর্বর কৃষি-জমির যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে। তবে গড়ানে জলের বেশির ভাগটাই চলে নদীর স্রোত ধরে। এই নদীর স্রোত যে কী ভয়ানক ক্ষয় ঘটিয়ে চলে, হিমালয়ের যে-কোনো নদী দেখলে তা বোঝা যায়। যে-কোনো নদীর উপত্যকায় যে আশ্চর্য দৃশ্য রচিত হয় তাও এই বয়ে-চলা জলের দরুন ক্ষয় ঘটার ফলে। পাথর কেটে কেটে যে-সব নদীকে পথ তৈরি করে নিতে হয় তাদের যে-কোনো একটিকে দেখলে ধারণা হয়, দুনিয়ার সবচেয়ে নমনীয় পদার্থ যে জল তার ক্ষয় ধরানোর ক্ষমতা কত ভয়ংকর, অথচ কী সুন্দর। আমেরিকার আরিজোনায় কোলোরাডো নদীর যে গিরিখাত রয়েছে, যার নাম গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন, সেটি দেখে ভূ-বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে যান। খাতটি গভীরতায় প্রায় দু কিলোমিটার, চওড়ায় প্রায় পনেরো কিলোমিটার, লম্বায় ৩৪৭ কিলোমিটার—সব মিলিয়ে অপরূপ এক স্থাপত্যকর্ম। এটি গড়ে তুলেছে জলের স্রোত তার অবিরাম ক্ষয়কার্য চালিয়ে।

জলের স্রোত মাটি ধুয়ে নিয়ে যায়। স্রোত যেমন যেমন বয়ে চলে তার সঙ্গে সেই মাটি বা পললও পরিবাহিত হয়। তারপরে থিতিয়ে পড়ে, সাধারণত নদীর জলের সঙ্গে সমুদ্রে এসে পড়ার পরে। এই হচ্ছে অবক্ষেপণ। তার মানে, বয়ে চলা জল একদিকে যেমন ক্ষয় ঘটায়, অর্থাৎ ভাঙে, অন্যদিকে তেমনি অবক্ষেপণ সাধন করে, অর্থাৎ গড়ে। এ-কারণেই ভূ-স্থাপত্য রচনায় জলের ভূমিকা যতো বড়ো এমন আর কারও নয়।

বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়া জলের কিছু অংশ মাটির ভিতরে ঢুকে যায়, একথা আগে বলেছি। অভিকর্ষের টানে এই জল নিচের দিকে বয়ে চলে। এমন সব শিলার মধ্যে দিয়ে বয়ে যেতে পারে যা জলে গলে যায়। এই কারণে দেখা যায়, যে-সব এলাকায় মাটির নিচে চুনাপাথর রয়েছে সেখানে অজস্র গহ্বর তৈরি হতে পারে। শুধু তাই নয়, গলিত শিলায় ভারী জল গহ্বরের ছাদ থেকে চুইয়ে চুইয়ে পড়বার সময়ে জল উবে গিয়ে শিলার অংশ বর্শাফলকের মতো ঝুলতে থাকে। এগুলোকে বলা হয় স্টালাক্‌টাইট। তেমনি গুহার মেঝে থেকে ওপরের দিকের ফলককে বলা হয় স্টালাগ্‌মাইট।

মাটির নিচে ঢুকে যাওয়া জলের কিছু অংশ জমা হয় জলবাহী শিলাস্তরের মধ্যে। এই হচ্ছে মিষ্টি জলের ভাণ্ডার। মিষ্টি জলের সরবরাহ বেশির ভাগটা এই ভাণ্ডার থেকেই আমাদের কাছে আসে।

অন্যদিকে সমুদ্রের ঢেউ অনবরত আছড়ে আছড়ে পড়ছে ডাঙার জমির ওপরে। সমুদ্রের সঙ্গে ডাঙার জমির একটা শেষহীন লড়াই চলেছে যেন। ডাঙার জমির শিলাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ। সেগুলোকে আবার অন্য কোথাও জমা করছে। সেখানে গড়ে উঠছে বালিয়াড়ি ও বেলাভূমি, এমনকি নতুন নতুন দেশও।

পৃথিবীর উপরিতলের যে চেহারা আমরা দেখছি, যে স্থাপত্য, তার বেশির ভাগটাই জলের রচনা।

আবহবিকার

শিলা যদি খোলা জায়গায় থাকে তাহলে সেই শিলায় ভাঙন ধরে। কাজটি করে থাকে আবহাওয়া—তার বাতাস, তার জল, তার তুষার, তার বরফ ইত্যাদি। আবহাওয়া ভালো হোক বা খারাপ

হোক—আবহাওয়ার কাজ সারাক্ষণ ধরে চলতে থাকে। বাতাসে থাকে বালির কণা, বাতাস ঝাপটা মারলে সেই বালির কণা শিলার গায়ে আঁচড় কেটে যায়। বৃষ্টির জল ও তুষার-গলা জল শিলাকে গলিয়ে ফেলে। তুষার ও বরফ শিলায় ফাটল ধরায়। বায়ুমণ্ডল ও শিলামণ্ডলের মাঝখানের সীমানায় যে পরিবর্তন ঘটে চলে তা ঘটে আস্তে আস্তে, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই ঘটে এবং পৃথিবীর উপরিতলের চেহারা বদলে যায়।

আবহিক বিকারের চিহ্ন পৃথিবীর সব জায়গায় দেখা যেতে পারে। যেখানেই শিলা আছে সেখানেই আবহিক বিকার হয়ে চলে। কবর-খানায় ঢুকলে দেখা যায়, পাথরের স্মৃতিফলকগুলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঝরে পড়েছে। মাত্র একশো বছরের মধ্যেই ফলকগুলোর গায়ের লেখা পর্যন্ত মুছে যায়। আবহিক বিকার চলে বলেই পাহাড়ের শিলাময় চুড়ো এমন গোল হয়ে ওঠে, উপত্যকার পাথরে এমন গড়ন তৈরি হয়।

আবহাওয়ার দরুন শিলার মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে সেটা যেমন হতে পারে ভৌত, তেমনি রাসায়নিক। শিলা ভেঙে ভেঙে পড়ছে, ক্রমেই আরো ছোট ছোট টুকরো হয়ে যাচ্ছে—এই হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন*। আবার এমনও হতে পারে যে আবহাওয়ার দরুন শিলার

*তাপমাত্রা যেখানে হিমাঙ্কের নিচে নেমে যায় সেখানে জল রাত্রিবেলা জমে বরফ হয়, দিনের বেলা গলে জল হয়। অধিকাংশ শিলায় আছে অজস্র ফাটল ও ছিদ্র যেগুলো জলে ভর্তি থাকে। সেই জল রাত্রিবেলা যখন জমে বরফ হয় তখন আয়তনে বাড়ে এবং তার ফলে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। এমনি চলতে চলতে কঠিনতম শিলাও ফেটে চৌচির হয়ে যায়। অন্যদিকে, উষ্ণ এলাকায় যেখানে তাপমাত্রা খুবই বেশি সেখানে শিলার বাইরের দিকের স্তর খুব বেশিরকম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ও খুব বেশিরকম বিস্ফারিত হয়। শিলার ভিতরের দিক কম উত্তপ্ত থাকে ও কম বিস্ফারিত হয়। ফলে একটি টানাপোড়েনের অবস্থা সৃষ্টি হয় ও এমনি চলতে চলতে শিলার বাইরের দিক থেকে পরত খসে পড়ে। এই কারণেই শিলার খোঁচা খোঁচা কিনারগুলো ও বেরিয়ে থাকা মুণ্ডগুলো ক্রমে গোলালো হয়ে ওঠে। এই কারণেই পাহাড়ের চুড়ো হয়ে ওঠে গম্বুজাকার।

মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে যাচ্ছে এবং তার ফলে শিলা ক্ষয়ে যাচ্ছে বা বদলে যাচ্ছে। দুইভাবেই শিলায় আবহিক বিকার ঘটে থাকে। আর এই আবহিক বিকারের জন্য পৃথিবীর উপরিতলে বেরিয়ে থাকা সমস্ত শিলা ভেঙে ভেঙে পড়ে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ওঠে। তারপরে ছড়িয়ে পড়ে—বাতাসের সঙ্গে ধুলোবালির আকারে, বৃষ্টির জলের সঙ্গে কাদার আকারে, হিমবাহের সঙ্গে ধ্বংসস্তূপের আকারে। এই যে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া, গ্রাস করে নিয়ে যাওয়া —তার ফলে যে-ব্যাপারটি ঘটে তাকে বলে ক্ষয়। একদিকে আবহিক বিকার, অন্যদিকে ক্ষয়—দুটি একসঙ্গেই চলে। তার ফলে পৃথিবীর ভূ-ভাগ ক্রমেই ক্ষয় হয়ে চলে, ক্রমেই আরো ন্যাড়া হয়ে যায়। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় নির্মোচন (denudation)।

ভাঙন ও ক্ষয় সমস্ত শিলায় যে একই মাত্রায় চলে তা নয়। ভিন্নতা ঘটে শিলার ভিন্নতার জন্য, আবহাওয়ার ভিন্নতার জন্য, অবস্থানের উচ্চতায় ভিন্নতার জন্য। এমনও হতে পারে শিলার নিচের দিক নরম, ওপরের দিক কঠিন। তখন নিচের দিকে ভাঙন ও ক্ষয় হয়ে থাকে অনেক বেশি, ওপরের দিকে অনেক কম। এমনি চলতে চলতে একটা স্তম্ভ তৈরি হয়ে যায়। স্পিতি হিমালয়ে এমনি স্তম্ভ দেখা যেতে পারে।

উদ্ভিদের শেকড় ও গুঁড়ি শিলায় ফাটল ধরায়। এর ফলে শিলার ভাঙন ও ক্ষয়েই সহায়তা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, উদ্ভিদ না থাকলে জমির ক্ষয় হয়ে থাকে অনেক বেশি। আমাদের দেশে হিমালয়ের ঢালু গা থেকে এতবেশি গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে যে ক্ষয়ের মাত্রা বিপজ্জনক রকমের বেড়ে গিয়েছে। ক্ষয়ের মাত্রা বাড়িয়ে তোলা হয় ঢালু জমিতে ভুলভাবে চাষ করলে, খনিজ পদার্থের জন্য বেহিসেবী খননকার্য চালালে। এ দুটোই আমাদের দেশে চলছে।

আবহিক বিকার ঘটে বলে জমির ক্ষয় হয়ে চলে। এর ফলে অবশ্যই সমস্যা দেখা দিতে পারে। কিন্তু আবহিক বিকারের ভালো দিকও আছে। বিচূর্ণ শিলা থেকেই আমরা শেষপর্যন্ত পাই মাটি, যে-মাটিতে ফসল ফলাই। আবহিক বিকারের খরচ হওয়ার দিক এই পাওনা দিয়েই পুষিয়ে যায়।

হিমবাহ

পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু পর্বতগুলো পুরু বরফের চাদরে মোড়া থাকে। পর্বতের উঁচু এলাকা চির-তুষারের রাজ্য। সেখানে সারা বছরে যতো তুষার পড়ে, যতো তুষার জমাট বাঁধে, তার পরিমাণ যতো তুষার গলে জল হয় তার চেয়ে বেশি।

তুষার যখন জড়ো হতে থাকে সেটা জমতে জমতে ক্রমেই হয়ে ওঠে আরো উঁচু ও আরো ঠাসা। যতো উঁচু হয় ওপরের তুষারের চাপ ততো বাড়ে। সেই চাপে নিচের তুষার দানা বাঁধতে থাকে। চাপ আরো বাড়লে দানাগুলো এঁটে গিয়ে হয়ে ওঠে কঠিন বরফ। এই কঠিন বরফ যখন যথেষ্ট বড়ো হয়ে ওঠে তখন অভিকর্ষের টানে নিচে নামতে শুরু করে। এই হচ্ছে হিমবাহ।

অধিকাংশ হিমবাহ নামতে শুরু করে জলের স্রোতে তৈরি হওয়া কোনো উপত্যকার পথ ধরে। তবে জলের স্রোতের মতো বেগে নিশ্চয়ই নয়। নেমে আসার মাত্রা সারা দিনে বা সারা সপ্তাহে কয়েক সেন্টিমিটার মাত্র। কিংবা, ঢালু যদি খুব খাড়া হয়, তাহলে আরো কিছুটা বেশি—৩ মিটার থেকে ৬ মিটার পর্যন্ত। কচিৎ কখনো এমন হিমবাহ দেখা যেতে পারে যার বেগ বলা যেতে পারে, দুর্ধর্ষ। তাও সারাদিনে ৩০ মিটার থেকে ১১০ মিটার পর্যন্ত।

যে শিলার ওপর দিয়ে হিমবাহ চলে সেই শিলায় অনেক অদল-বদল ঘটে যায়। উপত্যকার মেঝে বা দেয়াল থেকে শিলা খসিয়ে

নেয় হিমবাহ এবং সেই শিলা হিমবাহের মধ্যে জমাট বেঁধে থাকে। তারপরেও শিলার ধ্বংসস্তূপ এসে পড়তে পারে হিমবাহের ওপরে, তাও হিমবাহের মধ্যেই থেকে যায়। তবে যতো শিলাই থাকুক, সেগুলো হয়ে ওঠে ধারালো দাঁতের মতো। হিমবাহ যখন চলতে থাকে তখন এই দাঁত শিলার ওপরে আঁচড় কাটতে কাটতে চলে।

হিমবাহের চলা সম্পর্কে আরো একটি কথা বলার আছে। জলের স্রোত যখন চলে তখন যে উপত্যকা সৃষ্টি হয় তার আকার ইংরেজি V অক্ষরের মতো। কিন্তু সেই উপত্যকা দিয়ে যখন হিমবাহ চলতে থাকে তখন তার আকার হয়ে ওঠে ইংরেজি U অক্ষরের মতো।

হিমবাহ কিন্তু তার ভিতরকার শিলাগুলোকে অনন্তকাল ধরে রাখতে পারে না। হিমবাহের বরফ যেই-না গলতে শুরু করে অমনি শিলাগুলো খসে পড়ে। খসে-পড়া এই সমস্ত শিলা থেকেও হিমবাহের অনেক খবর পাওয়া যায়।

উঁচু পর্বতের হিমবাহ থেকে বড়ো বড়ো নদী বেরিয়ে আসে। যেমন এসেছে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও হিমালয়ের আরো অনেক নদী। শুরুর দিকে গঙ্গার নাম ভাগীরথী, সেটি বেরিয়ে এসেছে গোমুখের বরফ-গহ্বর থেকে। এই বরফ-গহ্বর রয়েছে গঙ্গোত্রী নামে বিশাল এক হিমবাহের মুখের কাছে। হিমবাহটি লম্বায় ৩০ কিলোমিটার, চওড়ায় দুই থেকে চার কিলোমিটার। তার শুরু চৌখাম্বা শিখরের (৭,১৩৮ মিটার) পুবদিক থেকে এবং তার সঙ্গে এসে মিশেছে আরো কয়েকটি শাখা হিমবাহ—যথা, চতুরঙ্গী, রক্তবরণ, শ্বেতবরণ, নীলাম্বর, পিলাপানি, ইত্যাদি। অলকানন্দা বেরিয়েছে চৌখাম্বার পুবদিকের দুটি হিমবাহ থেকে—ভগীরথ খড়ক ও শতপন্থ। পিণ্ডার গঙ্গা বেরিয়েছে নন্দাদেবী শিখরের (৭,৮১৬ মিটার) পিণ্ডারী হিমবাহ থেকে। মন্দাকিনী বেরিয়েছে কেদারনাথ শিখরের (৬,৯৪০ মিটার) পশ্চিম-

দিকের চোরাবারি হিমবাহ থেকে। ব্রহ্মপুত্র বেরিয়েছে মানস সরোবরের ১০০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পুবে চেমায়ুঙ্গডুঙ্গ হিমবাহ থেকে। হিমবাহ থেকে বেরিয়েছে বলেই হিমালয়ের এই সমস্ত নদীতে সারা বছর জল থাকে। একদিকে হিমবাহের বরফ গলে গলে জল হচ্ছে, অন্যদিকে তুষার জমে জমে হিমবাহ গড়ে উঠছে। বরফ-গলা জল নদী হয়ে নেমে আসে, তুষার-জমা বরফ হিমবাহকে অক্ষয় করে রাখে। এই কারণে হিমবাহ যে-নদীর উৎস সেই নদী কখনো শুকিয়ে যায় না।

হিমবাহ শুধু যে উঁচু পর্বতের ওপরে পাওয়া যায় তা নয়, মহাদেশ জুড়েও থাকতে পারে। যেমন আছে কুমেরু মহাদেশের প্রায় সবখানি অংশ ঢেকে। কুমেরু মহাদেশটি আয়তনে ভারতের চারগুণের চেয়েও বেশি। অতএব এই মহাদেশের ওপরে বিছিয়ে থাকা বরফের চাদরটিকে যদি হিমবাহ বলতে হয় তাহলে এই হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম হিমবাহ। চাদর বললেও ঠিক বলা হয় না, কারণ কোথাও কোথাও এই চাদর প্রায় ৪,০০ মিটার পুরু। গ্রীনল্যাণ্ডের ওপরেও বরফের চাদর বিছানো আছে, কিন্তু তার আয়তন কুমেরুর প্রায় আটভাগের একভাগ এবং গ্রীনল্যাণ্ডের বরফের চাদর কোথাও তিন-কিলোমিটারের বেশি পুরু নয়।

অন্য মহাদেশগুলোতে হিমবাহ পাওয়া যায় উঁচু পর্বতের ওপরে। সব মিলিয়ে পৃথিবীর উপরিতলের দশভাগের একভাগ অংশ হিমবাহে ঢাকা পড়েছে। কিন্তু এই অবস্থা পৃথিবীতে সবসময়ে ছিল তা নয়। মাত্র পঁচিশ হাজার বছর আগেও পৃথিবীতে একটি হিমযুগ ছিল। সে-সময়ে পৃথিবীর উপরিতলের এক-তৃতীয়াংশ ঢাকা পড়েছিল বরফের নিচে। গ্রীনল্যাণ্ড ও কুমেরুর বরফের চাদর ছিল আরো অনেক পুরু ও আরো অনেক বিস্তৃত। ইউরেশিয়া ও উত্তর আমেরিকা বরফে ঢাকা পড়েছিল। ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণা, এখন আমরা রয়েছি একটা হিমযুগ কেটে যাবার সময়ে। হিমবাহ সরে

যাচ্ছে ও আরো সরবে। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার জলবায়ু আরো উষ্ণ হয়ে উঠবে। তারপরে, আরো অনেক পরে, আবার আসবে হিমযুগ। অতীতেও এমনি ফিরে ফিরে হিমযুগ এসেছে, হিমবাহের চলার দাগে তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

ধস নামা

পাহাড়ের গা বেয়ে মাঝে মাঝে বিপুল আকারে ধস নেমে আসে। হিমালয়ের এলাকায় তো প্রায়ই শোনা যায়, ধস নেমে গ্রামকে গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নানা কারণে ধস নামে, তার মধ্যে কয়েকটি প্রধান কারণ হচ্ছে এই : খাড়া ঢালু, প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত বা বরফ-গলার ফলে পিচ্ছিল হয়ে যাওয়া, ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক কারণেই হোক বা মানুষের দ্বারাই হোক অবলম্বন সরে যাওয়া, এবং অভিকর্ষ। ধস নামে ঢালু বেয়ে।

ধস নামার ফলে কী বিপর্যয় ঘটতে পারে তার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে কাশ্মীর হিমালয়ে। ১৮৪০ সালের ঘটনা। একটি ভূমিকম্পে নঙ্গপর্বতের (৮,৭৩৭ মিটার) পশ্চিম পার্শ্বদেশে খানিকটা অংশ আলগা হয়ে গিয়েছিল আর তার ফলে বিপুল ধস নামে। আর সেখান দিয়েই ৫,০০০ থেকে ৫,৭০০ মিটার গভীর খাত কেটে বয়ে যাচ্ছিল সিন্ধুনদী। ধস নামার ফলে ৬৫ কিলোমিটার জুড়ে সিন্ধুনদীর পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং গড়ে ওঠে ৩৫০ মিটার গভীর বিশাল এক হ্রদ। এই হ্রদ বাধা ভেঙে এমন প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে পড়ে যে দু-দিনেরও কম সময়ের মধ্যে জলশূন্য হয়ে যায়। প্রলয়ঙ্কর এক বন্যা উপত্যকাকে ছিন্নভিন্ন করে সামনের শত-শত কিলোমিটার জুড়ে সমস্ত কিছু ধ্বংস করে দেয়। এ থেকে বোঝা যায়, বড়োরকমের ধস নামলে গুরুতর রকমের বন্যা হতে পারে।

পর্বতের গা বেয়ে যেমন ধস নামে তেমনি নামে বিপুল পরিমাণ

বরফ ও তুষার একসঙ্গে দলাপাকিয়ে। একে বলা হয় হিমানীসম্প্রপাত (avalanche)। পর্বতারোহীদের কাছে এই হিমানীসম্প্রপাতই সবচেয়ে বড়ো একটা বিপদ।

এসব ছাড়াও আরো কিছু ব্যাপার ঘটতে পারে। যেমন, মাটি সরে যাওয়া বা মাটি নেমে যাওয়া। ঢালু যেখানে খুব খাড়া নয় সেখানে মাটি খুব আস্তে আস্তে নামতে থাকে এবং নামবার সময়ে শিলাস্তর বিকৃত করে ও গাছপালা হেলিয়ে দেয়। আর্দ্র এলাকায় বৃষ্টির জল মাটির অনেক গভীরে চলে যেতে পারে। যেমন যায় পশ্চিমঘাটের কোনো কোনো অংশে—২৫ থেকে ৩০ মিটার পর্যন্ত। সেখানে গিয়ে জল যেমন একদিকে শিলার ক্ষয় ঘটিয়ে চলে তেমনি অন্যদিকে মাটির নড়াচড়া ঘটানোর পক্ষে সহায়ক হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে, মাটিকে আমরা যে কঠিন বা অনড় মনে করি সেটা আদৌ ঠিক নয়। শিলায় শিলায় চলেছে আবহিক বিকার, পর্বত গড়ে উঠছে, হাজার রকমে পরিবর্তন ঘটে চলেছে, আরো যে কত-কী তার কোনো গোনাগুনতি নেই। আর এই সমস্ত পরিবর্তনেরই সাক্ষ্য থেকে গিয়েছে ভূত্বকের শিলায়। ভূ-বিজ্ঞানীরা এই শিলা থেকেই পৃথিবীর কোটি কোটি বছরের ইতিহাস অনুসন্ধান করেন।

শিলালিপি

নদীর স্রোতের সঙ্গে ধুলো বালি কাঁকর ইত্যাদি সমুদ্রে এসে পড়ে। তারপরে একটু একটু করে থিতিয়ে পড়ে সমুদ্রের নিচে। পললের স্তর জমে ওঠে, প্রচণ্ড চাপে পললের সেই স্তর হয়ে ওঠে পাললিক শিলা। এমনিভাবে পাললিক শিলার একটি স্তর তৈরি হয়ে যায়। সেই স্তরের ওপরে নতুন করে পলল জমতে থাকে। এক সময়ে সেই নতুন জমে ওঠা পললের স্তরও হয়ে ওঠে নতুন আরেক স্তর পাললিক শিলা।

এমনিভাবে স্তরের পর স্তর পাললিক শিলা তৈরি হয়ে চলে। তাহলে তো দেখা যাচ্ছে, পাললিক শিলার স্তরগুলো সময়ের দিক থেকেও পরের-পর হয়ে চলেছে। এখন যদি বলা হয়, পৃথিবীর জীবনকালের পর-পর সময় পাললিক শিলার পর-পর স্তরে ধরা পড়ে যাচ্ছে, তাহলে ভুল বলা হয় না। তার মানে, পৃথিবীর অস্তিত্বের এক-একটা বিশেষ সময় নিয়ে পাললিক শিলার এক-একটি বিশেষ স্তর হয়ে উঠছে। তার মানে, পাললিক শিলার এক-একটি স্তরকে কল্পনা করা যেতে পারে পৃথিবীর ইতিহাসের এক-একটি পৃষ্ঠা হিসেবে। এমনি অসংখ্য পৃষ্ঠায় পৃথিবীর পুরো ইতিহাস লেখা রয়েছে যেন। তবে এই পৃষ্ঠাগুলো যদি বাঁধানো বইয়ের মতো পর-পর সাজানো থাকত তবে পড়ার কাজটা অনেক সহজ হয়ে যেত। ভূপৃষ্ঠের ভাঙাগড়ায় পৃষ্ঠাগুলো ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর এই ইতিহাস-পুস্তকটি প্রায় সাড়ে-চারশো কোটি বছরের পুরনো। আর পুরনো বইয়ে যা ঘটে, এই বইয়েরও অনেক পৃষ্ঠা ঝাপসা ও জীর্ণ হয়ে গিয়েছে, অনেক পৃষ্ঠা একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে। এই ফাঁকগুলো থাকার জন্য পৃথিবীর পুরো ইতিহাস তৈরি করার কাজ ভূ-বিজ্ঞানীদের পক্ষে আরো শক্ত হয়ে উঠেছে।

ভূ-বিজ্ঞানীরা তাই প্রায় গোয়েন্দার মতো অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে পাললিক শিলা বা স্তরীভূত শিলার মধ্যে থেকে খবর উদ্ধার করছেন। তাছাড়া, এই শিলার মধ্যেই থাকে ফসিল। যদি থাকে, তাহলে তা থেকে অনেক খবরই পাওয়া যায়। ফসিলকে বলা যেতে পারে ইতিহাস-পুস্তকের সাজানো পৃষ্ঠায় এক-একটি অক্ষর।

ফসিল কী? ফসিল হচ্ছে এমন একটা নিদর্শন যার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো জীব বা গাছপালার নিদর্শন পাওয়া যায়। ফসিল তৈরি হবার সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে অগভীর সমুদ্র। কল্পনা করা যাক, কোনো সামুদ্রিক জীবের মৃতদেহ বা নদীর স্রোতে ভেসে আসা কোনো ডাঙার জীবের মৃতদেহ সমুদ্র-তলে

থিতিয়ে পড়া পলিস্তরে আটকে গেছে। তারপর? সেই মৃতদেহের ওপরেই স্তরের পর স্তর পলি জমতে থাকবে। প্রচণ্ড চাপে একসময়ে সেই পলিস্তর হয়ে উঠবে পাললিক শিলা। তারপর ভূপৃষ্ঠের ভাঙাগড়ার স্বাভাবিক নিয়মে একসময়ে সেই পাললিক শিলার স্তর ঠেলা খেয়ে উঠে আসবে সমুদ্রের তলা থেকে। এইভাবে শিলাস্তরের মধ্যে এক একটি বিশেষ সময়ের জীবজগতের সাক্ষ্য থেকে যাচ্ছে। এরই নাম ফসিল।

ফসিল নানাধরনের হতে পারে। এক ধরনের ফসিল আছে যেখানে প্রাগৈতিহাসিক জীবের সত্যিকারের দেহাবশেষটুকুকেই পাওয়া যায়। দেহাবশেষ বলতে গোটা শরীরটাও হতে পারে, বা শরীরের কোনো অংশের হাড় বা খানিকটা নরম অংশ, বা এমনি ধরনের যা হোক কিছু। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, সাইবেরিয়ার তুষার-আস্তরের মধ্যে পুরাকালের কোনো কোনো অতিকায় জন্তুর দেহাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। আরেক ধরনের ফসিল আছে যেখানে প্রাগৈতিহাসিক জীবের সত্যিকারের দেহাবশেষ থাকে না—শুধু পাওয়া যায় অবিকৃত একটি ছাপ। এ ধরনের কোনো কোনো ফসিলে সত্যিকারের গড়নটুকুও হুবহু থেকে যায়। অন্য এক ধরনের ফসিল আছে যেখান থেকে প্রাগৈতিহাসিক কোনো জীবের জীবন-নির্বাহের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। যেমন, কোনো ডাইনোসর বা অতিকায় জীবের পায়ের ছাপ বা পোকামাকড়ের বাসা বা এমনি ধরনের কিছু।

ফসিল আধুনিক মানুষের আবিষ্কার নয়। সেই প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ ফসিলের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ফসিল বিশ্লেষণ করা হচ্ছে গত শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে।

শিলাস্তরে যদি ফসিলের ছাপ পড়ে তাহলে সেই ছাপ দেখে ভূ-বিজ্ঞানীরা স্থির করতে পারেন শিলাস্তরটি কোন্ যুগের। ফসিলকে তাই বলা হয় ইতিহাস-পুস্তকের অক্ষর। অতীতের যতো কাল পর্যন্ত

ফসিল পাওয়া যাচ্ছে ততোকাল পর্যন্ত শিলাস্তরকে সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু আমরা জানি, পৃথিবীর ইতিহাসে গোড়ার দিকে বহুকাল পর্যন্ত জীবের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এ-অবস্থায় পৃথিবীতে জীব দেখা দেবার আগেকার কালের শিলাস্তরের হদিস পাবার উপায় কী?

উপায়—তেজস্ক্রিয়তা। শিলাস্তরে যদি ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম থাকে তাহলে তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে শিলাস্তরটির বয়স স্থির করা যায়।

কিন্তু সব শিলাস্তরেই ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম নেই। কাজেই তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে সব শিলাস্তরের বয়স জানা যায় না। এই কারণে পৃথিবীতে জীব দেখা দেবার আগেকার কাল সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়নি।

তা সত্ত্বেও শিলাস্তরগুলোকে সাজিয়ে বিপুল এক ইতিহাস-পুস্তক খাড়া করা হয়েছে। প্রতি বছরে পাললিক শিলার যে স্তর জমে তাকে যদি এই ইতিহাস-পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তাহলেও, গোড়ার দিকের কাল বাদ দিলে, তিনশো কোটি পৃষ্ঠা পাওয়া যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, এই ইতিহাস-পুস্তকটি তৈরি করার কাজ একজন-দুজনের নয়, বহু ভূ-বিজ্ঞানীর। ফসিলের কাল শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই, বলা যেতে পারে, পৃথিবীর ইতিহাস-পুস্তকটি পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে। এই অংশে গোড়াতেই আমরা পাচ্ছি পুরাজীবীয় অধিযুগ। এই অধিযুগটির শুরু আজ থেকে সাড়ে-ষাট কোটি বছর আগে।

পুরাজীবীয় অধিযুগ

আজ থেকে ষাট কোটি বছর আগেও ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগে প্রাণের কোনো চিহ্ন ছিল না। শুধু সমুদ্রের তীরে দাঁড়ালে দেখা যেত মস্ত এক-একটা ঢেউয়ের সঙ্গে দু-একটা জলজ উদ্ভিদ তীরের ওপরে আছড়ে পড়েছে। বা, আল্‌পিনের মাথার মতো দু-একটা পোকা

সমুদ্রের ধারে ভিজে বালির ওপরে নড়াচড়া করছে। এই পোকা-গুলোই প্রাণের একমাত্র নিদর্শন নয় ; সমুদ্রের জলে প্রাণের বিপুল সমাবেশ ঘটেছে।

জলের ধারে যে পোকাগুলো নড়াচড়া করছিল তাদের নাম 'ট্রাইলোবাইট'। এরা ছিল সে-যুগের সবচেয়ে উন্নত জীব। শক্ত চামড়ায় ঢাকা পড়েছিল এদের শরীর ; মাথা ধড় ও লেজ আলাদা আলাদা ভাবে চেনা যাচ্ছিল—যদিও আকারে তিন সেন্টিমিটারের চেয়ে বড়ো নয়। এদের মাথায় বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো ছিল দু-পাশের দুটি চোখ।

আরো কয়েক কোটি বছর পরে অর্ডোভিসিয়ান বা সিলুরিয়ান যুগে দেখা যায়, ট্রাইলোবাইটরা আকারে প্রায় ত্রিশ সেন্টিমিটারের কাছাকাছি হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে শরীরের বাহার ও জটিলতা। কিন্তু আরো কয়েক কোটি বছর পরে পার্মিয়ান যুগে এসে দেখা যায়, ট্রাইলোবাইটরা প্রায় লোপ পেয়ে গেছে।

ট্রাইলোবাইটরা ভূপৃষ্ঠে প্রায় ত্রিশ কোটি বছর রাজত্ব করেছিল।

অবশ্য এদের রাজত্বের সীমানা ছিল সমুদ্র। কোনো কালে এরা অন্যত্র যাবার চেষ্টা করেনি। খুব সম্ভবত এদের দাপটে টিকতে না পেরে এদেরই সগোত্র আরেক দল জীব আশ্রয় নিয়েছিল নদীতে বা হ্রদে—মিষ্টি জলের এলাকায়। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইউরীপ্‌-টেরিড্‌স্‌'। অনুমান করা চলে, নদীতে বা হ্রদে জীবনযাত্রা একদিকে যেমন নির্বিঘ্ন, অপরদিকে তেমনি অনিশ্চিত। নদী বা হ্রদের জল সহজেই শুকিয়ে যায়, ভূপৃষ্ঠের আলোড়নে রাতারাতি সরে যেতে পারে—সে-অবস্থায় এই জলাশ্রয়ী জীবদের মৃত্যু ছাড়া গতি নেই। কিন্তু এক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই এমন দু-একটা দল থেকে যায় যারা শুকনো ডাঙার ওপরেও কোনো রকমে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারে। এমনি দু-একটা ছিটকে-পড়া দলেরই রূপান্তর হতে হতে শেষ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে বিছে-কেন্নো-মাকড়সা ইত্যাদি জাতীয় জীব। পরে

আবার এদেরই একটা দল আকাশে উড়তে শুরু করে—তখন এদের নাম হয় পতঙ্গ।

পুরাজীবীয় অধিযুগে আরেক দল জীব ছিল যারা গোড়ার দিকে তেমন দাপট দেখাতে পারেনি কিন্তু পরবর্তী কালে বহু বছর ধরে রাজত্ব করেছে। পুরাজীবীয় অধিযুগের গোড়ার দিকে যারা রাজত্ব করেছে তারা বাইরের খোলসটিকে শক্ত করে তুলতে পেরেছিল। কিন্তু এখন যাদের কথা বলছি তারা তাদের শরীরের মাঝখানটি দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত শক্ত একটি দণ্ড তৈরি করে নিতে পেরেছিল। পুরাজীবীয় অধিযুগটি মাত্র পনেরো কোটি বছরের পুরনো না হতেই দেখা গেল, এই দলটি নিজেদের শরীরের মধ্যে পুরোপুরি একটি মেরুদণ্ড তৈরি করে ফেলেছে। শুরু হল মেরুদণ্ডী জীবের কাল। শক্ত খোলসওলা জীব পোকারা হটে গেল, আধিপত্য শুরু হল মেরুদণ্ডওলা জীব মাছদের। ভূপৃষ্ঠে তখন সিলুরিয়ান যুগ চলছে—সেটা হচ্ছে আজ থেকে চুয়াল্লিশ কোটি বছর আগের কথা।

তারপর মেরুদণ্ডী মাছের দল জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছিল, রূপান্তরিত হতে হতে সরীসৃপ-জাতীয় উভচর জীবের জন্ম দিয়েছিল। যতোদূর জানা গেছে, এই মেরুদণ্ডী মাছের দল জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছিল আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি বছর আগে—ডেভ-নিয়ান যুগের শেষের দিকে বা কার্বনিফেরাস যুগের শুরুতে। গোড়ার দিকে এই উভচর জীবরা লম্বায় কয়েক সেন্টিমিটারের বেশি হয়নি, কিন্তু কয়েক কোটি বছর যেতে না যেতেই কার্বনিফেরাস যুগের শেষের দিকে ছয় মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে উঠেছিল।

উভচর জীবের অপর একটি দল কিন্তু অনেক আগেই উভচর আর ছিল না, হয়ে উঠেছিল সম্পূর্ণভাবে ডাঙার জীব। এই দল থেকেই সরীসৃপরা এসেছে।

পুরাজীবীয় অধিযুগের শেষের দিকে যে-সব সরীসৃপের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে, তারা কিন্তু চালচলনের দিক থেকে অনেকটা আজকের

দিনের সরীসৃপদের মতোই। তাদের পা-গুলো বেরিয়েছে শরীরের পাশ থেকে ; চলাফেরা করা তাদের পক্ষে সহজ নয়। মধ্যজীবীয় অধি-যুগে সরীসৃপদের শরীরের গড়ন একেবারে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। পায়ের অবস্থান হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক, শরীর হয়ে উঠেছে খাড়া ও ঋজু, এবং শরীরের গড়নটাই এমন হয়ে উঠেছে যে বিদ্যুতের মতো দৌড়ঝাঁপ দেওয়া চলে।

ওদিকে উদ্ভিদজগৎটিও কিন্তু সমুদ্রের এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। জীবজগতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বা তার কিছুটা আগেই জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছিল। অবশ্য উদ্ভিদের ডাঙায় উঠে আসার ব্যাপারটি ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ, যদিও পদ্ধতি ছিল একই। ঢেউয়ের সঙ্গে জলজ উদ্ভিদ আছড়ে পড়ত তীরের ওপরে, সেই সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ত উদ্ভিদের বীজ। বিশেষ করে যে-অঞ্চল মাঝে মাঝে জোয়ারের জলে ডুবে যেত আবার মাঝে মাঝে ভেসে উঠত--- সে-অঞ্চলের উদ্ভিদ ক্রমে ক্রমে দু-অবস্থাতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। মিষ্টি জলের এলাকার উদ্ভিদেরও প্রায় একই অবস্থা। ভূপৃষ্ঠের আলোড়নে মিষ্টি জলের কোনো একটি এলাকা থেকে হয়তো জল সরে গেছে ; তখন গোটা এলাকার জলজ উদ্ভিদ হয় লোপ পায় কিংবা ডাঙার অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কোনো রকমে টিকে থাকে। সুতরাং, অনুমান করা চলে, জল থেকে ডাঙায় উঠে আসার প্রথম অবস্থায় উদ্ভিদজগৎ সীমাবদ্ধ ছিল জলাভূমিতে আর সমুদ্রতীরের এলাকায়। এবং সেই উদ্ভিদও ছিল নিতান্তই ঝোপঝাড়। তাতে না ধরত ফুল, না হত ফল। তারপরেও বহু কোটি বছর পর্যন্ত উদ্ভিদ বলতে এমনি ঝোপঝাড়কেই বোঝাত। জীবজগতের মতো উদ্ভিদজগৎও বেড়ে উঠেছে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে, নানা পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে।

মধ্যজীবীয় অধিযুগের দিকে তাকালে মনে হবে, গোটা পৃথিবীকে একটা ম্যাগ্‌নিফাইং কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। সেখানে সব কিছুই বৃহৎ, সব কিছুই অতিকায়। গাছপালা জীবজন্তু অনেক-অনেক গুণ বড়ো হয়ে গেছে। মস্ত এক-একটা আকাশ-ছোঁয়া গাছ ডালে আর পাতায় এমন নিশ্ছিদ্র যে সূর্যের আলো মাটিতে পৌঁছতে পারে না; কিন্তু হঠাৎ দেখা যাবে, সেই আকাশ-ছোঁয়া গাছেরও মাথা ছাড়িয়ে ধক্‌ধক্ করছে কোনো একটি অপার্থিব জন্তুর হিংস্র চোখ। নিস্তরঙ্গ জলাভূমি একটুকরো কাঁচের মতো সূর্যের আলোয় জ্বলছে; হঠাৎ তুমুল তোলপাড় জাগিয়ে ভেসে উঠবে পাহাড়ের মতো অতিকায় কোনো জলজন্তুর কালো চক্‌চকে পিঠ। যেদিকেই তাকানো যাক, জীবনের এক সুবিপুল প্রাচুর্য বেহিসেবী মাত্রায় স্তূপ-স্তূপ হয়ে আছে বলে মনে হবে।

আজকের দিনে অতিকায় বা অমিতবিক্রমের যা কিছু নিদর্শন আমরা দেখি—মধ্যজীবীয় যুগের তুলনায় তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। হিমালয়ের সঙ্গে একটি টিলার যতোখানি তফাত, প্রায় তেমনি তফাত এই দুই পাশাপাশি অধিযুগের জীবের মধ্যে। এখনকার একটি হিপোপটেমাসের ওজন বড়ো জোর দু-টন, এবং লম্বায় তিন মিটারের বেশি নয়; কিন্তু মধ্যজীবীয় অধিযুগের জলজন্তু ব্রণ্টোসরাসের ওজন অন্তত পঞ্চাশ টন এবং সেটি লম্বায় অন্তত বাইশ মিটার। এখনকার পশুরাজ সিংহ মধ্যজীবীয় অধিযুগের টাইরানোসরাসের কাছে একটা ছারপোকার মতো দুর্বল।

মধ্যজীবীয় অধিযুগে পা দিয়ে প্রথমেই চোখে পড়বে, খটখটে শুকনো ডাঙার জমিতেও প্রাণের মহোৎসব শুরু হয়েছে। আর সেখানে আধিপত্য করছে দৈত্যের মতো বিপুলকায় একটি জীব—ডাইনোসর। বলা বাহুল্য, এই জীবটি একদিনে আচমকা এমন অতিকায় হয়ে ওঠেনি। মধ্যজীবীয় অধিযুগের প্রথম পর্বেও দেখা যায়, এই জীবটি

লম্বায় সাড়ে-চার মিটারের বেশি নয়, চেহারার দিক থেকে প্রায় এখনকার ক্যাঙ্গারুর মতো। পেছনের পা-দুটি বেশ বড়ো এবং রীতিমতো বলশালী ; লেজটিও তাই, ছুটবার সময়ে এই লেজের সাহায্যে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে।

কিন্তু কয়েক কোটি বছরের মধ্যে এই মাঝারি গোছের জীবটি আকারে ও হিংস্রতায় পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছে। টাইরানোসরাসের কথা আগেই বলেছি। এটিও এক জাতের ডাইনোসর। এই সরীসৃপটি লম্বায় পনেরো মিটারেরও বেশি, ওজনে দশ টনের কাছাকাছি। সেই মধ্যজীবীয় যুগেও টাইরানোসরাস ছিল জীবজগতের আতঙ্ক ; হিংস্রতার দিক থেকে এই মাংসাশী জীবটির কোনো তুলনা ছিল না।

মধ্যজীবীয় অধিযুগের মাঝামাঝি কালে এসে দেখা যায়, ডাইনোসরদের নানা প্রকারভেদ ঘটেছে, ছড়িয়ে পড়েছে নানা শাখা-প্রশাখায়। তাদের মধ্যে মিল শুধু এটুকু যে তারা পেছনের দু-পা ও লেজের ওপরে ভর দিয়ে ছোটে, সামনের খুদে খুদে থাবাদুটোকে ব্যবহার করে একমাত্র খাবার সময়ে বা লড়াই করবার সময়ে ; এবং তারা সকলেই মাংসাশী।

যেমন, অর্নিথোমাইমাস। এই সরীসৃপটির চেহারাও ক্যাঙ্গারুর মতো, কিন্তু আকারে তেমন বড়ো নয় ; তখনকার অন্যান্য জীবের তুলনায় ছোটই বলা চলে। চেহারার দিক থেকে এদের বরং খানিকটা মিল এখনকার উটপাখির সঙ্গে। পাখিদের মতোই লম্বা ঠোঁট, দাঁত নেই, পোকামাকড় খেয়ে থাকে। তখনকার তুলনায় নিতান্তই শান্তিপ্রিয় জীব।

যেমন, আল্লোসরাস। সারা গায়ে বড়ো বড়ো আঁশ, মুখের হাঁ-টা প্রকাণ্ড, দু-পাটি ধারালো দাঁত। হিংস্রতায় এই সরীসৃপটিও বড়ো কম যায় না।

যেমন, গোর্গোসরাস। যেমন, সেরাটোসরাস।

এমনি আরো অনেক নাম করা চলে। অধিকাংশই যেমন অতিকায়, তেমনি বলশালী, তেমনি হিংস্র। এদের সামনে পড়লে সে সময়েও অন্যান্য জীব প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারত না।

অন্যান্য জীব বলতে সরীসৃপদেরই অন্যান্য কয়েকটি দল। এদের চেহারা অনেকটা এখনকার গিরগিটির মতো, ক্যাঙ্গারুর মতো দু-ঠেঙে নয়। দু-একটির নাম উল্লেখ করা চলতে পারে।

ব্রণ্টোসরাসের কথা আগেই বলেছি। গিরগিটির সঙ্গে মিল শুধু শরীরের গড়নের দিকে। নইলে ৫০ টন ওজনের এবং তেইশ মিটার লম্বা এই চতুষ্পদী সরীসৃপটির তুলনা চলে পাহাড়ের সঙ্গে। মধ্যজীবীয় অধিযুগের অরণ্যে ও জলাভূমিতে এ-ধরনের পাহাড়-প্রমাণ জীবের সাক্ষাৎ যেখানে সেখানে পাওয়া যেত। তেমনি সাক্ষাৎ পাওয়া যেত ডিপ্লোডোকাস-এর বা স্টেগোসরাস-এর। আকার ও শারীরিক গড়নে এ-দুটি চতুষ্পদী সরীসৃপও ব্রণ্টোসরাসের সমগোত্রীয়। তবে স্টেগোসরাস-এর একটি বিশেষত্ব এই যে, এই জীবটির শিরদাঁড়া-বরাবর ইস্পাতের মতো কঠিন একটি বর্মের সাজ আছে।

আবার এই চতুস্পদী সরীসৃদদের মধ্যে কয়েকটি ছিল যাদের অস্ত্রসজ্জা অন্য ধরনের। যেমন, ট্রাইসেরাটপ্‌স বা প্রোটোসেরাটপ্‌স। এদের মাথার সামনে ছিল মস্ত ধারালো শিং। অনেকটা এখনকার বন্য বরাহের শিঙের মতো।

এ তো গেল ডাঙায় যে-সব সরীসৃপের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে, তাদের কথা। কিন্তু সরীসৃপরা শুধু শুকনো ডাঙার জমিতেই রাজত্ব করে যায়নি, জলের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। স্থলভাগের মতো জলভাগেও ছিল এদের অবাধ রাজত্ব। সমুদ্রের জল তোলপাড় করে এরা ঘুরে বেড়াত; হানাহানি কাটাকাটির অন্ত ছিল না। ইক্‌থিওসরাস বা প্লেসিওরাস-এর নাম এখানে উল্লেখ করা চলে। ইক্‌থিওসরাসের চেহারাটা হচ্ছে অতিকায় একটা মাছের মতো; আর প্লেসিওসরাস এমনিতে কিম্ভূতাকার কিন্তু লম্বা গলাটির জন্য

রাজহাঁসের চেহারার খানিকটা আদল আসে। এই সরীসৃপদের খাদ্য ছিল মাছ। জীববিজ্ঞানীদের মতে, এই জলচর সরীসৃপরা শুকনো ডাঙার জীবনকে বরদাস্ত করতে পারেনি, তাই জলে ফিরে এসেছিল—যেমন, এখনকার সীল, শুশুক, তিমি ইত্যাদি জীবরা জলের জীবনে ফিরে গেছে।

আবার শুধু জলস্থল নয়, আকাশ-রাজ্যেও ছিল এদের সমান আধিপত্য। তখনো পাখির জন্ম হয়নি, আকাশের সম্রাট সরীসৃপরাই। এবং এই সম্রাটদলেরও সম্রাট—টেরোডাক্টিল। এদের শরীরের কোথাও পালক বা রোঁয়ার চিহ্নমাত্র ছিল না। কল্পনা করা চলে, এই জীবটি মোটেই সুদর্শন নয়। রোঁয়াওঠা কুৎসিত গা, পালকহীন চামড়ার ডানা, তার ওপরে ধারালো দাঁতওলা মুখ। মধ্যজীবীয় অধিযুগের শেষে ক্রিটেশাস যুগে এই টেরোডাক্টিলরা এমন অতিকায় হয়ে উঠেছিল যে আরব্যোপন্যাসের সেই আকাশ-অন্ধকার করা পাখিটাও তার কাছে হার মানবে। ডানা-ছড়ানো অবস্থায় একডানার প্রান্ত থেকে অপর ডানার প্রান্ত পর্যন্ত টেরোডাক্টিলের শরীরের মাপ ছিল আট মিটার। আর সেই ডানার এমন প্রচণ্ড শক্তি যে এক-একটা ঝাপটে এখনকার দশ-বারোটা ফাইটার প্লেন অনায়াসে কুপোকাত হতে পারে।

তবে যতো ভয়াবহই হোক একথা স্বীকার করতে হবে যে এই উড়ন্ত সরীসৃপরাই ছিল পাখিদের পূর্বপুরুষ। এমনকি সেই মধ্যজীবীয় অধিযুগেই দেখা যায়, উড়ন্ত সরীসৃপদের রূপান্তর হতে শুরু করেছে এবং পাখির লক্ষণ ফুটে উঠেছে। এমনি একটি আকাশচারী জীবের নাম আর্কিওপ্‌টেরিক্‌স—সরীসৃপ ও পাখির অদ্ভুত এক সংমিশ্রণ। লক্ষণের বিচারে এরা আধা-সরীসৃপ, আধা-পাখি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মধ্যজীবীয় অধিযুগে জলে-স্থলে-আকাশে সরীসৃপরা অবাধ রাজত্ব করে গেছে। শারীরিক গড়ন ও শক্তিমত্তার

দিক থেকে সরীসৃপদের সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন জীব পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনো অধিযুগে নেই।

মধ্যজীবীয় অধিযুগের শেষদিকে এসে দেখা যাচ্ছে, টাইরানোসরাস, স্টেগোসরাস, ইক্‌থিওসরাস, প্লেসিওসরাস, এবং যেখানে যতো "সরাস" আছে, কারও চিহ্নমাত্র নেই। যাদের দাপটে দশকোটি বছর ধরে পৃথিবীর মাটি কেঁপে কেঁপে উঠেছে, তাদের অস্তিত্ব এমন-ভাবে মুছে যেতে পারে—এ ব্যাপারটা কল্পনা করাও শক্ত।

প্রাণিজগতে এতবড়ো একটা দুর্ঘটনা কি করে হল, সে-সম্পর্কে কিছু অনুমান করা হয়েছে মাত্র, নির্দিষ্ট কোনো কারণ বলা হয়নি।

নবজীবীয় অধিযুগ

নবজীবীয় অধিযুগকে বলা হয় স্তন্যপায়ীদের অধিযুগ। প্রায় আট কোটি বছর আগে শুরু হয়ে এখনো চলছে।

মধ্যজীবীয় অধিযুগের শেষ পর্বেই বোঝা গিয়েছিল যে স্তন্যপায়ীরা সরীসৃপদের চেয়ে অনেক উচ্চতর পর্যায়ের জীব। শরীরের গড়ন ও ক্ষমতার দিক থেকে সরীসৃপদের তুলনায় স্তন্যপায়ীরা কিছুই নয়। কিন্তু স্তন্যপায়ীদের এমন দুটি গুণ ছিল যা পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যেও তাদের টিকিয়ে রেখেছে এবং পরের অধিযুগে তাদের আধিপত্য কায়েম করেছে।

একটি গুণ হচ্ছে—মাতৃস্নেহ।

সরীসৃপরা ডিম পেড়েই খালাস। সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোতে পারল কিনা এবং বেরিয়ে আসার পরে টিকে থাকতে পারল কিনা—সে-সম্পর্কে সরীসৃপরা ছিল নির্বিকার।

স্তন্যপায়ীরা যে সরীসৃপদের চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ের জীব তা এই বাচ্চাদের সম্পর্কে দায়-দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে। আজ থেকে প্রায় পনেরো কোটি বছর আগে একদল খুদে খুদে জীবের মধ্যে নতুন একটা লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। তারা ডিম না পেড়ে গর্ভ-

ধারণ করত এবং জীবন্ত বাচ্চা প্রসব করত। তারপরেও সেই বাচ্চা তার অসহায় শৈশবকালটি কাটাত মায়ের রক্ষণাবেক্ষণে, মায়ের বুকের দুধ খেয়ে। প্রাণের ইতিবৃত্তে এটি সম্পূর্ণ নতুন লক্ষণ। একশো কোটি বছরেরও বেশি কাল ধরে ভূপৃষ্ঠে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু মাতৃস্নেহের ইতিহাস মাত্র পনেরো কোটি বছরের। এই পনেরো কোটি বছরের আগে সুদীর্ঘকাল জীবজগৎ মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিল। এবং মাতৃস্নেহের সঞ্জীবনী-শক্তি যে কী বিপুল তা কয়েক কোটি বছরের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, দেখা গেল, অতিকায় শরীর ও অমিতবিক্রম থাকা সত্ত্বেও মাতৃস্নেহে বঞ্চিত সরীসৃপরা জীবনযুদ্ধে পরাজিত; কিন্তু মাতৃস্নেহে সঞ্জীবিত ক্ষুদ্রকায় ক্ষীণজীবী স্তন্যপায়ীরা আজ সারা ভূপৃষ্ঠে আধিপত্য করছে।

আর একটি ব্যাপারে স্তন্যপায়ীরা সরীসৃপদের ওপরে টেক্কা দিয়েছিল। সরীসৃপদের রক্ত ছিল ঠাণ্ডা, স্তন্যপায়ীদের রক্ত গরম। নইলে অন্য কোনো দিকে সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীদের মধ্যে বিশেষ কোনো তফাত ছিল না। একই ধরনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, একই ধরনের মাংসপেশী, একই ধরনের স্নায়ু। বরং সরীসৃপদের শরীরের গড়ন ছিল খুবই মজবুত, পরাক্রম ছিল খুবই বেশি। তবুও শেষপর্যন্ত দেখা গেল, উষ্ণরক্তধারীরা যতো সহজে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে, শীতলরক্তধারীরা তা পারেনি।

নবজীবীয় অধিযুগের প্রথম পর্বে পা দিয়ে দেখা যায়, স্তন্যপায়ী জীবরা নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে সারা ভূপৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়েছে। আজকের দিনে স্তন্যপায়ী জীবদের যে চেহারা আমরা দেখি, তখনো মোটামুটি সেই একই ধরনের চেহারা। তবে এখনকার তুলনায় তখন আকারে অনেক ছোট। যেমন, এখনকার ঘোড়া, হাতি, শুয়োর, গণ্ডার ইত্যাদি প্রাণীদের জায়গায় তখন ছিল

একটি মাত্র স্তন্যপায়ী জীব—ফেনাকোডাস। আকারে সেটি শেয়ালের চেয়ো বড়ো ছিল না, শরীরটা ছিল লম্বাটে, নাকটা চোখা, পা-গুলো ছোট ছোট।

প্রায় আট কোটি বছর সময় লেগেছে এই স্তন্যপায়ী জীবটির বড়ো হয়ে হয়ে বর্তমান আকারে পৌঁছতে এবং নানা শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়তে। অন্যান্য জীবের মধ্যে ছিল খুদে খুদে বানর যারা গাছের ডালে ডালে লাফালাফি করত। আর ছিল একদল হিংস্র মাংসাশী জীব যাদের বলা হত 'ক্রিয়োডোণ্ট'। এই ক্রিয়োডোণ্টরাই পরে দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেছে; একদলের চেহারা হয়েছে কুকুরের মতো (যেমন, কুকুর, নেকড়ে, ভাল্লুক, ইত্যাদি), আর এক দলের চেহারা হয়েছে বেড়ালের মতো (যেমন, বেড়াল, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি)।

অবশ্য নবজীবীয় অধিযুগের প্রথম পর্বের সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবই যে টিকে থেকেছে তা নয়। কোনো কোনো শাখা লুপ্ত হয়েছে, আবার বেরিয়ে এসেছে নতুন নতুন শাখা। আর যারা টিকে থেকেছে তারা হয়ে উঠেছে বড়ো—আরো বড়ো। আট কোটি বছর ধরে একটু একটু করে বড়ো হয়ে পৌঁছেছে আজকের আকারে।

হিমযুগের সময়কে বাদ দিলে ভূপৃষ্ঠের জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণমণ্ডলীয়। উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ুর সময়ে স্তন্যপায়ী জীবরা ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। মস্কো প্যারিস নিউইয়র্ক পিকিং অঞ্চলেও বাঘ-সিংহ-গণ্ডার-হিপোপটেমাস ইত্যাদি উষ্ণমণ্ডলীয় জীবের ফসিল পাওয়া গেছে।

তারপর হিমযুগে যখন মস্ত মস্ত হিমবাহ পর্বতের চুড়ো থেকে নেমে আসতে শুরু করে, প্রচণ্ড শীতে উদ্ভিদ ও জীবের অবস্থা হয়ে ওঠে প্রাণান্তকর—সে-সময়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই উদ্ভিদ ও জীবকে সরে যেতে হয়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে। কিন্তু সবাই সরে যেতে পারেনি। যে-কোনো কারণেই হোক দু-একটা ছুট্‌কো দল থেকে গিয়েছিল সেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেই। উদ্ভিদজগৎ সেই

প্রচণ্ড শীতকে একেবারেই সহ্য করতে পারেনি কিন্তু জীবজগৎ লড়াই করেছে। লড়াই করতে করতে যারা টিকে থাকতে পেরেছে তাদের শরীরের চামড়ার ওপরে তৈরি হয়েছে মেরু-অঞ্চলের শীত সহ্য করবার মতো ঘন পশম। এই ঘন পশমওয়ালা জীবরা আজো মেরু-অঞ্চলের বাসিন্দা।

ঘন পশমওলা জীবদের মধ্যেও অনেকে ভূপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নিয়েছে। জলবায়ু সহ্য করবার ক্ষমতা হয়তো এদের ছিল, কিন্তু প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার লড়াইয়ের অন্যান্য ক্ষেত্রে হেরে গিয়ে টিকে থাকতে পারেনি। এমনি একটি জীব হচ্ছে ম্যামথ্। দেখতে অবিকল হাতির মতো, তেমনি শুঁড়, তেমনি দাঁত ; আর সারা গায়ে ঘন বাদামী পশম। বরফ-ঢাকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে এই জীবটি যখন চলাফেরা করত, সে এক দেখবার মতো দৃশ্য ছিল। সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা-অঞ্চলে একাধিক বরফ-জমা ম্যামথের শরীর পাওয়া গেছে।

এবার আমাদের নিজেদের কথা কিছুটা জানা দরকার। অর্থাৎ মানুষের কথা। জীবজগতের ইতিহাসে মানুষের অস্তিত্ব একেবারেই সাম্প্রতিক কালের। মাত্র কয়েক লক্ষ বছর তার বয়স।

নবজীবীয় অধিযুগের শুরুতে দেখা যায়, একদল স্তন্যপায়ী জীব মাটি ছেড়ে গাছের ডালে আশ্রয় নিয়েছে। জীবনধারণের তাগিদে এই দলটিকে কয়েকটি নতুন গুণ অর্জন করতে হয়েছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো গুণ হচ্ছে প্রখর দৃষ্টিশক্তি।

যে-সব জীব মাটিতে চলাফেরা করে তাদের দৃষ্টিশক্তির চেয়ে ঘ্রাণশক্তি বেশি। এবং তাদের পক্ষে ঘ্রাণশক্তিটাই বেশি দরকারী। বনেজঙ্গলে চলাফেরা করতে হলে চোখের দেখাটা খুব বেশি কাজে লাগে না, কিন্তু গন্ধ শুঁকে কোনো কিছু সম্পর্কে আগে থেকে আঁচ করতে না পারলে যেমন পদে পদে জীবন বিপন্ন হতে পারে, তেমনি পদে পদে শিকার ফস্‌কে যেতে পারে। কিন্তু যে-সব জীব গাছের

ডালে চলাফেরা করে তাদের পক্ষে ঘ্রাণশক্তির চেয়ে দৃষ্টিশক্তি থাকাটা আরও বেশি জরুরী। এই জরুরী তাগিদ থেকেই ক্রমে এই বৃক্ষাশ্রয়ী জীবদের দৃষ্টিশক্তি প্রখর হতে থাকে। শেষপর্যন্ত মাথার খুলির আদলটা পর্যন্ত এমনভাবে পাল্‌টে যায় যেন দু-চোখ দিয়ে সিধে সামনের দিকে তাকানো চলে এবং দু-চোখের দৃষ্টি একই বস্তুর ওপরে নিবদ্ধ হতে পারে।

স্তন্যপায়ী জীবদের বিশেষ লক্ষণ এই যে, এদের সকলেরই মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক আছে। এবং যতো বেশি উন্নত পর্যায়ের জীব ততো বড়ো মস্তিষ্ক। এইভাবে বড়ো হতে হতে সবচেয়ে উন্নত পর্যায়ের জীব মানুষের মাথায় সবচেয়ে বড়ো। স্তন্যপায়ী জীবদের সময়ে এসেই প্রথম দেখা যায়, প্রাণের বিবর্তনে মস্তিষ্কেরও একটা ভূমিকা আছে। এতদিন পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল, যে-জীবের গায়ের জোর বেশি তারই রাজত্ব চলছে। অর্থাৎ, শরীরের গড়নের ওপরেই অনেক কিছু নির্ভর করত। নবজীবীয় অধিযুগে এসে দেখা যাচ্ছে, গায়ের জোরের চেয়েও বড়ো জোর হচ্ছে মস্তিষ্কের জোর।

আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি। জীবনধারণের তাগিদেই একদল বৃক্ষাশ্রয়ী জীবের দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়ে উঠেছিল এবং চোখের অবস্থানও গিয়েছিল বদলে। স্বাভাবিক নিয়মেই মস্তিষ্কের যে-অংশে দৃষ্টিবোধ, সে-অংশটি হয়ে ওঠে আরও উন্নত। ফলে, বৃক্ষাশ্রয়ী জীবরা নতুন এক ক্ষমতার অধিকারী হয়—সঠিকভাবে দূরত্ব স্থির করতে পারা। যে-সব জীব মাটিতে চলাফেরা করে তারা শিকারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার সময়ে যদি সঠিকভাবে দূরত্ব স্থির করতে না পারে তবে বড়ো জোর শিকারটি ফসকে যায়। কিন্তু কোনো বৃক্ষাশ্রয়ী জীব এক ডাল থেকে অপর ডালে লাফ দেবার সময়ে যদি সঠিকভাবে দূরত্ব স্থির করতে না পারে—তবে তার জীবনসংশয়। অথচ এই বৃক্ষাশ্রয়ী জীবদের জীবনধারণের তাগিদেই চোখের পলকে ডালে ডালে লাফিয়ে পড়তে হত। ফলে, দ্রুত মস্তিষ্ক চালনার ক্ষমতা এই

জীবদের আয়ত্তে এসে যায়। মস্তিষ্ক-চালনার সঙ্গে সঙ্গে আরো উন্নত হয়ে ওঠে মস্তিষ্ক।

গাছের ডালে ডালে চলাফেরা করতে হত বলে এরা আরো কয়েকটা ব্যাপারে পটু হয়ে উঠেছিল। যেমন, গাছের ডাল আঁকড়ে ধরতে পারা, শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারা, ইত্যাদি। এ-ধরনের প্রত্যেকটি কাজের জন্যই মস্তিষ্ক-চালনা দরকার। কাজেই অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক আরো উন্নত হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত দেখা যায় এরা সামনের প্রত্যঙ্গ দুটি হাতের মতো ব্যবহার করতে পারছে এবং সেই হাতের মুঠোয় লাঠি ধরতে শিখেছে।

ওদিকে লেজের ব্যবহার বিশেষ না থাকায় লেজটি ক্রমেই ছোট হয়ে আসছিল, শেষ পর্যন্ত তার আর কোনো চিহ্ন থাকেনি।

এবার এই জীবদের চেহারা কল্পনা করা চলে। লেজ নেই, পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে, সামনের প্রত্যঙ্গদুটি ব্যবহার করে হাতের মতো। এরা বানর হতে পারে কিন্তু বানর নয়। শিম্পাজী হতে পারে, ওরাং-ওটাং হতে পারে, গরিলা হতে পারে—কিন্তু কোনোটাই নয়। মানুষ হতে পারে—কিন্তু মানুষও নয়। পুরোপুরি কোনোটাই নয়।

এরাই হচ্ছে মানুষের পূর্বপুরুষ। ইংরেজিতে এদের নাম — 'অ্যানথ্রোপয়েড এপ্', অর্থাৎ 'মনুষ্যসদৃশ বিশেষ জাতীয় বানর'।

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কী? পৃথিবীর বাসিন্দা হিসেবে মানুষের ভবিষ্যৎ কী?

পৃথিবীর বাসিন্দা হিসেবে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার কোনো

কারণ এমনিতে নেই, যদি-না বিশ্বব্যাপী একটা পারমাণবিক যুদ্ধে মানুষ লিপ্ত হয়ে পড়ে, যদি-না মানুষ নিজের দোষে তার পরিবেশকে দূষিত করে তোলে। নইলে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তো হয়েই থাকে, হবেও, তার জন্য কখনো মানুষের অস্তিত্ব লোপ পাবে না। ভূমিকম্প হতে পারে, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে, ঝঞ্ঝা-ঘূর্ণিবাত্যা-প্লাবন হতে পারে, কিন্তু কোনোটাই এখন অতর্কিতে ঘটে যেতে পারে না। একমাত্র ভূমিকম্পের পূর্বাভাস এখনো পর্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে দেওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু অন্য সমস্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর মানুষ এখন অনেক আগেই পেয়ে যায় ও সাবধান হতে পারে। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মানুষ এখন বিশ্বের জলহাওয়ার খবর পেয়ে যাচ্ছে, বিশ্বব্যাপী নিখুঁত যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, ফলে খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে এমন আশঙ্কা করা হয়। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে রয়েছে যে সমুদ্র তার বিপুল সম্পদ এখনো প্রায় কিছুই ব্যবহার করা হয়নি। মানুষ অবশ্যই এই সম্পদ ব্যবহার করার উপায় আয়ত্ত করবে। তাছাড়া, মহাকাশ-চারণার যুগ যখন শুরু হয়েছে তখন এমনও হতে পারে, মানুষ অন্য গ্রহে গিয়ে বসবাস শুরু করবে বা অন্য গ্রহের সম্পদ আহরণ করে আনবে।

খনিজ সম্পদ ফুরিয়ে যেতে পারে, এমন আশঙ্কা আছে। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেক কিছুরই বিকল্প তৈরি করেছে। এদিক থেকেও মানুষকে কখনো অভাবে পড়তে হবে না। সম্ভবত এমন দিন আসছে যখন মানুষের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম পদার্থ দিয়েই নির্বাহ হতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি মাত্র কৃত্রিম পদার্থের উল্লেখ করা চলে—প্লাস্টিক। এই প্লাস্টিক যে প্রকৃতিজগতে উৎপন্ন কত-কিছুর বদলে ব্যবহৃত হতে পারে তা ভাবলে অবাক হতে হয়।

তেল ও কয়লা ফুরিয়ে যেতে পারে, যাবেও। কিন্তু যে-মানুষ

পারমাণবিক শক্তিকে আয়ত্ত করেছে তাকে কখনো শক্তির অভাবে বিপন্ন হতে হবে না।

অন্যদিকে পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থাই হয়তো বদলে যেতে পারে। হয়তো হিমযুগ আসবে। কিন্তু যে-মানুষ অনায়াসে মোটা পশমের পোশাক গায়ে চাপাতে পারে, যে-মানুষ কৃত্রিম তন্তু তৈরি করতে পেরেছে, তাকে শীতলতম হিমযুগও কাবু করতে পারবে না। হিমযুগে কিছু পশুপাখি মরবে, কিছু পশুপাখির গায়ে ঘন পশম গজাবে, কিন্তু মানুষ যেমন থাকার তেমনি থাকবে।

কিন্তু পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কী? এই গ্রহ কতকাল মানুষের বাসের উপযোগী থাকবে? সেটা নির্ভর করছে কতকাল এই গ্রহ সূর্যের আলো ও তাপ এমনি পেয়ে চলবে তার ওপরে। অর্থাৎ, কতকাল সূর্য এমনি জ্বলন্ত অবস্থায় থাকবে, নিভে যাবে না। নিভতে একদিন হবেই, আকাশে নিভে-যাওয়া তারার সংখ্যা কম নয়। কিন্তু আমাদের সূর্যের এই অবস্থা হতে আর কত দেরি?

বিজ্ঞানীরা বলেন, কয়েক হাজার কোটি বছর। সূর্যের তেজ তৈরি হয় পারমাণবিক ফিউসন বা একীভবন ঘটার ফলে, যেমন হয়ে থাকে হাইড্রোজেন বোমায়। যদি কল্পনা করা যায়, কোটি কোটি হাইড্রোজেন বোমা একসঙ্গে ফাটছে তাহলে যে ব্যাপারটি ঘটে এমনি একটি ব্যাপার ঘটছে সূর্যের ভিতরে। তারই ফলে এত তেজ এত তাপ। সূর্যের বস্তুপিণ্ডে আছে হাইড্রোজেন। এই হাইড্রোজেনের চারটি পরমাণুর ফিউসন বা একীভবন ঘটে তৈরি হয় একটি হিলিয়াম পরমাণু এবং কিছুটা বস্তু রূপান্তরিত হয় শক্তিতে। এমনিভাবেই সূর্যের ভিতরে শক্তি উৎপন্ন হয়ে চলেছে এবং সূর্যের যে বস্তুভাণ্ডার মজুদ আছে তা দিয়ে আগামী কয়েক হাজার কোটি বছর চালু থাকতে পারবে।

অতএব এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর এই মানুষ থাকছে, থাকবে।

অনুক্রমণী

গ্রন্থপঞ্জী

(যে-সব বই থেকে বিশেষ সাহায্য নেওয়া হয়েছে)

1. Introducing the Earth : William H. Mathews III
2. Physics of the Earth : T. F. Gaskell
3. Planet Earth : Peter Lancester Brown
4. The Earth's Changing Surface : Michael Bradshaw, A. J. Abbott, A. P. Golsthorpe
5. The changing Face of the Earth : A. Ryabchikow
6. Geology : Andrew Mcleish
7. Continents in Motion : Walter Sullivan
8. A Revolution in the Earth Sciences : A Hallam
9. A Planet of Riddles : E. Novikov
10. Physical Geography of India : C. S. Pichamuthu
11. Geography of Himalayas : S. C. Bose
12. Man in Search of His Ancestors : Andre Senet
13. ভারতের শিলাস্তর ও ভূ-তত্ত্বীয় ইতিহাস : তিমিররঞ্জন সর্বাধিকারী
14. গঠন সম্পর্কীয় ভূবিদ্যা : সুবীরকুমার ঘোষ